

মগ জনজাতির জীবন ধারা

ক্রইরী মগ চৌধুরী



উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

মগ জনজাতির জীবন ধারা

ক্রাইরী মগ চৌধুরী

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

মগ জনজাতির জীবন ধারা
ক্রইরী মগ চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১১

প্রকাশক

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র

ত্রিপুরা সরকার

লেইক চৌমুহনি, আগরতলা

অঙ্কর বিন্যাস : নারায়ণ দেবনাথ

মুদ্রণ : প্রিন্টবেষ্ট, কর্ণেল চৌমুহনি, আগরতলা

মূল্য : ১৩৩.০০ টাকা

গ্রন্থস্বত্তা উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রাসঙ্গিক কথা

প্রত্যেক তথ্যপিপাসু ব্যক্তিই নিজ গোষ্ঠীর উৎস সম্পর্কে জানতে প্রবল আগ্রহী হয়ে থাকে। আমিও ঠিক তাই মগ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে স্বগোষ্ঠীর উৎস সম্পর্কে জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সঠিক তথ্যের পথচারী। প্রকৃত পক্ষে মগরা কী জাতি কোথায় তাদের আদিনিবাস এবং তাদের পূর্বপুরুষ কারা? এইসব প্রশ্নের উত্তর সব সময় খুঁজে চলেছি। এই জনজাতির আদি ইতিহাস বিষয়ে নানা জনের মুখে নানা রকম কাহিনি শুনেছি। তবে সঠিক উত্তর এখনও খুঁজে পাইনি। যদিও অতীত তথ্যাদি উদ্ঘাটনে প্রতি নিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

ঠিক এমন একটা সময়, আমি মগ জাতি গোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির উপর পুস্তক রচনার গুরু দায়িত্ব পালনে উপজাতি গবেষণাগার হতে একটি আমন্ত্রণ পত্র পাই। বিভিন্ন তথ্যমূলক পুস্তকাদি পড়ে এই সম্প্রদায়ের প্রাচীন লোক কাহিনী, গীতিকাব্য, গীতিনাট্য, লোক সংগীত প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গা হতে সংগ্রহ করছিলাম। তখন আমি এই আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে আরো দ্বিগুণ কাজ করার জন্য উৎসাহিত হলাম। যারা এই গুরু দায়িত্ব পালনে আমাকে সমর্থন করেছেন, অর্থাৎ Research Advisory Committee সদস্যদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সেই সময় থেকে আরও অধিক পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমি মাঠে নেমে পড়ি। সংগৃহীত তথ্যের অধিক পরিমাণ মগ জনগোষ্ঠীর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গোষ্ঠীর পূর্ণ তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ না পাওয়াতে বিভিন্ন ব্যক্তির মুখে শোনা লোকশ্রুতির উপরও প্রাধান্য দিতে হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ, মায়ানমার, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বিভিন্ন জনজাতি ও ইতিহাসের উপর লেখা গ্রন্থ সংগ্রহ করে অপরিসীম শ্রম দিয়ে এই গোষ্ঠীর উপর তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়েছে।

আমার স্বামী শ্রীযুক্ত থেউখই চৌধুরী (উপ-অধিকর্তা, পর্যটন দপ্তর), তিনি শত কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকলেও সর্বদিক দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, চেতনা ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনিই উৎসাহ সহকারে আমার লেখার কাজকে ত্বরান্বিত করেন। তার জন্য আমি উনার কাছে চিরঋণী। মগ সমাজে বিখ্যাত বৈদ্য ও ঐতিহাসিক অফুঃ অংহ্রী বৈদ্য (৯৩ বৎসর) যিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও অসংখ্য মূল্যবান পৌরাণিক তথ্যাদি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি এখন বেঁচে নেই। তথাপি তাঁকে স্মরণ করে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার স্বাশুড়িমা শ্রীমতী উষাস্যা চৌধুরী (৮২ বছর)ও অনেক কিছু তথ্য দিয়ে আমার কাজে সহায়তা করেছেন। তাঁর প্রতি আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা রইল। মংমং বৈদ্য (মগ) (৭২ বছর) বেশ কিছু বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে ও আমি ঋণী। তাছাড়া উসাজই T.C.S. Officer ওয়েনিতা মহাথেরো (বৌদ্ধ ভিক্ষু), চিংসামং মগ, শ্রীমতী নাম্রা ও মগ, শ্রীমতী অংমফ্র মগ (৮৩ বছর), শ্রীমান থোয়াই সুয়েমং চৌধুরী, বৌদ্ধিস্ট লিটারেসী মিশন বারাসাত কলকাতা, মংফ্র চৌধুরী রামগড় (বাংলাদেশ), জীবন রোওয়াজা রাজামাটি (বাংলাদেশ), মংক্যাচিং মারমা খাগড়াছড়ি (বাংলাদেশ), মংমংসো মারমা (কমান্ডার) খাগড়া ছড়ি (বাংলাদেশ) প্রভৃতি ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিছু না কিছু তথ্য দিয়ে আমার লেখার কাজে সহায়তা করেছেন। তার জন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রী অমরেন্দ্র দেববর্মা Librarian সরকারি গ্রন্থাগার, গবেষণার আনুষঙ্গিক বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন ও উৎসাহ

দিয়েছেন। তাঁর এই আন্তরিকতা ও উদারতার জন্য চিরঋণী হয়ে রইলাম।

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্রের অধিকর্তা শ্রীযুক্ত এল.এইচ. ডার্লিং আমাকে এই কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের জন্য উপজাতি গবেষণা কেন্দ্রের উপাধিকর্তা শ্রী রতন আচার্য আমাকে রিসার্চের কাজের জন্য No objection certificate দিয়ে সাহায্য করেছেন। এই জন্য তাঁর কাছেও ঋণী। বর্তমান এই গবেষণা কেন্দ্রের উপাধিকর্তা শ্রী প্রফুল্ল রিয়াং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। এইজন্য তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। শ্রী অরুণ দেববর্মা (রিসার্চ অফিসার) যিনি শুরু থেকে শেষ অব্দি বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে আমার কাজের গতি বজায় রেখেছেন। তাই তাঁর প্রতিও আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা রইল।

আমার সীমিত জ্ঞানে যতটুকু সম্ভব মগদের জীবন ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে চেষ্টা করেও পূর্ণ তৃপ্তি পাইনি। তবুও বলতে পারি, ভবিষ্যতে গবেষকদের কাছে এই গ্রন্থটি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে কিছু হলেও সাহায্য করতে পারে। লেখক-গবেষকদের জ্ঞান-পিপাসা নিবারণে পুস্তকখানি সহায়ক হলে নিজের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

ক্রাইরী মগ চৌধুরী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	পরিবেশ ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	মগ : নামকরণের ইতিহাস	১১
তৃতীয় অধ্যায়	ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ	১৮
চতুর্থ অধ্যায়	ত্রিপুরায় মগ জনগোষ্ঠীদের আদি ও বর্তমান বাসস্থান	২৭
পঞ্চম অধ্যায়	সামাজিক কাঠামো ও প্রথা	৪১
ষষ্ঠ অধ্যায়	আর্থ - সামাজিক জীবন	৫৭
সপ্তম অধ্যায়	ধর্মীয় ও সামাজিক লোকজ উৎসব	৭০
অষ্টম অধ্যায়	দেবদেবীর পূজা- পার্বণ	৮৪
নবম অধ্যায়	বনজ ঔষধ ও ব্যবহার	৯৬
দশম অধ্যায়	শিক্ষা ও ভাষা	১০৪
একাদশ অধ্যায়	লোক - সংস্কৃতি	১২০
দ্বাদশ অধ্যায়	প্রথাগত সামাজিক আইনকানুন এবং শাসন ব্যবস্থা	১৭২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	উপসংহার	১৮১
	তথ্যসূত্র	২০০

পরিবেশ ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো

ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। পাখির ঠোঁটের মত ছোট ত্রিপুরা রাজ্যকে তিনদিকে ঘেরাও করে রেখেছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা। পার্বতী ত্রিপুরা রাজ্য আয়তনের দিক দিয়ে ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। ত্রিপুরার আয়তন ১০,৪৯১.৬৯ বর্গকিলোমিটার। ভৌগোলিক অবস্থানে যথাক্রমে উত্তর অক্ষাংশে ২২° ডিগ্রি ৫৬ মিনিট থেকে ৯২° ডিগ্রি ২১ মিনিট। ৮৫৬ কিলোমিটার জুড়ে ত্রিপুরা রাজ্যের তিন পার্শ্ব বাংলাদেশের শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, কিয়দংশ নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের অঞ্চল যা আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ণয় করা হয়েছে। আন্তর্দেশীয় সীমানার পূর্ব প্রান্তে ১০৯ কিলোমিটার জুড়ে মিজোরামের ভূমির সঙ্গে সংযোগ, রাজ্যভূমি। তাই এর প্রান্তিক দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৮৩.৫ কিলোমিটার, আবার প্রান্তিক প্রস্থ হচ্ছে ১১২.৭ কিলোমিটার।

আরাকান ইতিহাস ‘রাজওয়ং’ নামক গ্রন্থে ত্রিপুরাকে ‘খুরুতং’ লেখা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক কর্নেল ফেয়ার খুরুতং কে সুবর্ণগ্রাম বলে নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। মগ ভাষায় ‘খুরুট’ শব্দের অর্থ শামুক, তন বা তং শব্দের অর্থ পাহাড় বা পর্বত। সেকালে হয় তো বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূমি নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের আকৃতি ঠিক খুরু বা শামুকের মত ছিল। তাই আরাকানীরা তাদের ভাষায় ত্রিপুরা রাজ্যের নাম ‘খুরুতং’ বলা হয়েছে।

সাধারণত, ত্রিপুরাতে দেখা যায় উচ্চ-অনুচ্চ পাহাড়ের মালা। মাঝে মাঝে প্রসারিত উপত্যকা, কোথাও বা সঙ্কুচিত গিরিপথ আবার সমতল ভূমি। কোথাও বা জলাভূমির অবস্থান দেখা যায়। কোন কোন ভূমিতে আবার বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে মালভূমির ন্যায় টিলা, যা দূর সুদূর প্রসারিত হয়েছে। কোথাও বা উচ্চ শৃঙ্গ, নিভৃত বনাঞ্চল, বনবিধি মালা সাড়ি সাড়ি দন্ডায়মান বাঁশ বেত ও নল খাগড়ার বন। আবার কোথাও বা নানা ধরনের চেনা- অচেনা উচ্চবৃক্ষের বনাঞ্চল, উত্তর থেকে তথা শ্রীহট্টের সমতল হতে তরঙ্গায়িত হয়ে দক্ষিণে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দিকে মিলিত হয়েছে। এ রাজ্যের প্রধান পাহাড়গুলোর মধ্যে বড়মুড়া, দেবতামুড়া, আঠারমুড়া, লংতরাই, শাখানতাং, জম্পুই পাহাড় ইত্যাদি। এই সব পাহাড় থেকে নির্মল জলের ধারা প্লাবিত হয়ে ছোট বড় নদীর উৎসস্থল, যা কত যুগ যুগান্তর ধরে ত্রিপুরার ইতিহাসের ইঙ্গিতরেখা হিসাবে নির্ণায়ক হয়ে আছে। এই সব নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খোয়াই, গোমতী, জুরি, দেও, ধলাই, মনু, মুছরী, লঙ্গাই, হাওড়া প্রভৃতি। কোন নদী আন্তর্দেশীয় নদী আসামস্থিত বরাক নদীতে পতিত হয়, আবার কোন কোন নদী আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের অন্তর্গত বড় নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

সাধারণত ত্রিপুরাকে প্রশাসনের সুবিধার্থে ১৭টি মহকুমার, চারটি জেলায় ভাগ করে দেওয়া হয়। চারটি জেলার মধ্যে যেমন - পশ্চিম ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, ধলাই ও উত্তর ত্রিপুরা।

পশ্চিম ত্রিপুরাস্থিত মহকুমা হচ্ছে আগরতলা, বিশালগড়, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ও সোনামুড়া, দক্ষিণ ত্রিপুরাস্থিত মহকুমা হচ্ছে অমরপুর, উদয়পুর, বিলোনীয়া, শান্তিরবাজার ও সাক্রম, উত্তর ত্রিপুরা জেলার মহকুমা হচ্ছে কাঞ্চনপুর, কৈলাসহর ও ধর্মনগর, ধলাই জেলাস্থিত মহকুমা হচ্ছে আমবাসা, কমলপুর, লংতরাইভ্যালী, গন্ডাছড়া। গ্রাম অঞ্চলের ত্বরান্বিত উন্নতিকল্পে প্রত্যেক মহকুমার অন্তর্গত কয়েকটি উন্নয়ন ব্লক গড়ে উঠে। যেমন কলমপুরে একটি ব্লক, কৈলাসহরে দুইটি, আবার ধর্মনগর মহকুমায় দুইটি ব্লক, অমরপুর অন্তর গত তিনটি, উদয়পুর মহকুমাতে তিনটি, গন্ডাছড়ায় একটি বিলোনীয়া মহকুমাতে দুইটি, শান্তি বাজারে একটি, সাক্রম মহকুমাতে দুইটি, আগরতলাতে পর পর পাঁচটি ব্লক, খোয়াই মহকুমায় তিনটি ব্লক ও সোনামুড়ায় তিনটি ব্লক আছে। সর্বমোট ব্লক হচ্ছে ৪০টি। গ্রামের সংখ্যা ১০৬২টি।

ত্রিপুরার জন সংখ্যার ৮৪.৭৪ শতাংশ লোক গ্রামে বাস করে তাই গ্রামের উন্নতিকল্পে প্রত্যেক ব্লকের আওতায় ১৯৯৩ সাল থেকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে। মোট জেলা পরিষদ হচ্ছে ৩টি। পঞ্চায়েত সমিতি হচ্ছে ১৬টি। আর গ্রাম পঞ্চায়েত মোট ৯৫৭টি গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নে নির্বাচিত সদস্যদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

পুরসভা পরিচালনার জন্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সভ্য ও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বলা বাহুল্য আগরতলা পুরসভা ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে ১৮৭৯ সালে প্রথম গঠিত হয়েছিল।

রাজ্যের মোট জন সংখ্যার ৩০.৫১ শতাংশের বেশি উপজাতিও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর। সংখ্যা লঘু উপজাতিদের রক্ষাকল্পে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ভিত্তিক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭৯ সালে বিলটি উত্থাপন ও গৃহীত হয়ে ২৮ জন সদস্যকে নিয়ে জেলা পরিষদ (৭ম তপশিল) ১৯৮২ সালে মোতাম্যেক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ জন সদস্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গণভোটে নির্বাচিত হয়ে, আবার তাদের মধ্যে চেয়ারম্যান ও মুখ্য কার্যনির্বাহী-সহকার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচন হয়। উক্ত কার্যনির্বাহী সদস্যগণ স্ব-স্ব নির্দিষ্ট দপ্তরের কার্য সম্পাদনার ভারগ্রহণ করেন। ৭,১৩,২৫৬ বর্গকিলোমিটার আয়তন নিয়ে জেলা পরিষদের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই জেলা পরিষদের অভ্যন্তরীণ বসবাসকারী লোক সংখ্যা প্রায় ৮,৮৭,৬১৫ জন। তার মধ্যে উপজাতি হল ৬,৬৩,৫০৩ জন এবং তপশিলি জাতি হচ্ছে ৫৮১৪০ জন। ৪৩০ টি গ্রাম পঞ্চায়েত উক্ত জেলার আওতায় পড়েছে। এইসব গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেখাশোনা ও উন্নতিকল্পে ১১টি সম্পূর্ণ ব্লক ৪টি জোনাল ডেভলপমেন্ট স্থাপিত হয়।

জন সাধারণের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের তত্ত্বাবধানে একটি ক্ষমতাসীন ও দায়িত্বশীল সরকার আছে। স্ব-স্ব কেন্দ্র থেকে গণভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সদস্য রাজ্যের বিধানসভাতে প্রেরণ করা হয়। সদস্যদের মধ্যে আবার নির্দিষ্ট দপ্তর দেখাশোনার জন্য দপ্তরের মন্ত্রীপদ বণ্টন করে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। বিজিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভার গ্রহণ করেন। রাজ্যপালের পরামর্শক্রমে মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীদেরকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। ১৯৪৯ সালে ১৫ অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতের অঙ্গ রাজ্য হিসাবে যোগ দেয়। এর পূর্বে এই ত্রিপুরার প্রায় ১৭৮ জন রাজার শাসন করার প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিপুরার শেষতম রাজা ছিলেন বীরবিক্রম

কিশোর মাণিক্য। এরপর ১৯৬৩ সালে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল আইন অনুযায়ী ত্রিপুরাতে প্রথম বিধানসভা গঠিত হয়। শচীন্দ্র লাল সিংহ ছিলেন ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। তখন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল অনুসারে ত্রিপুরার চীফ কমিশনার ছিলেন এস. পি. মুখার্জী। ত্রিপুরার প্রথম উপজাতি মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃতীয় বামফ্রন্টের আমলে মুখ্যমন্ত্রী পদে ১৯৯৩ সালে ১০ই এপ্রিল দশরথ দেব শপথ গ্রহণ করেন। তখন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যপাল ছিলেন রমেশ ভাণ্ডারী। ১৯৭২ সাল থেকে ত্রিপুরাকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। তখন থেকেই ত্রিপুরাতে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত রাজ্যপালের দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে।

উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীরা এরা জ্যেষ্ঠ আদিম বাসিন্দা। এই আদি বাসিন্দারা জুম চাষের কারণে স্থান পরিবর্তন- শীল কৃষিকাজ করলেও পরবর্তী সময়ে সমতল চাষে অভ্যস্ত হয়ে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিলেন। ১৯৭১ সালে পূর্ব-পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তান ভাষাভিত্তিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবীতে এক গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়; তখন বহু হিন্দু, বাঙালি শরণার্থী হয়ে ত্রিপুরাতে প্রবেশ করে। ঐ শরণার্থীদের অনেকাংশ ত্রিপুরার ভূমিতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। ছোট পাহাড়ী রাজ্যে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পরে ১৯৭১ সাল থেকে ত্রিপুরার জনসংখ্যার মূলত বৃদ্ধি ঘটে। অগত্যা ত্রিপুরার সংখ্যা গরিষ্ঠ আদিবাসী উত্তরোত্তর সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। স্বাধীনোত্তর ভারতে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত ক্রমাগত উদ্বাস্তু আগমনের ফলে ত্রিপুরার জন সংখ্যা কী পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নীচে আদম সুমারীর তালিকা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।

সন	জনসংখ্যা	বৃদ্ধির শতকরা হার
১৯০১	১,৭৩,৩২৫	২৬ শতাংশ
১৯১১	২,২৯,৬১৩	৩২.৫ শতাংশ
১৯২১	৩,০৪,৪৩৭	৫২.৬ শতাংশ
১৯৩১	৩,৮২,৪৫০	২৫.৬ শতাংশ
১৯৪১	৫,১৩,০১০	৩৪.১ শতাংশ
১৯৫১	৬,৩৯,০২৯	২৪.৬ শতাংশ
১৯৬১	১১,৪২,০০৫	৭৮.৭ শতাংশ
১৯৭১	১৫,৫৬,৩৪২	৩৬.৩ শতাংশ
১৯৮১	২০,৫৩,০৫৮	৩১.৯ শতাংশ
১৯৯১	২৭,৫৭,২০৫	৩৪.৩ শতাংশ

১৯১১ থেকে ১৯৫১ আদম সুমারীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অশুভ ইঙ্গিত সূচিত করলেও সর্বোচ্চ জনসংখ্যার বিস্তারণ ঘটে ১৯৬১ সালে। তখন থেকে জন অরণ্যের অন্ধকার ত্রিপুরার বুকে নেমে আসে। এই হঠাৎ জন সংখ্যার বৃদ্ধির হার গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর কোথাও ঘটেনি। ত্রিপুরাতে যারা আদিকাল থেকে বসবাস করে এসেছে সেইসব আদিবাসীরা অচিরেই সংখ্যালঘুতে পরিণত হলো।

১৯৭১ সনের আদম সুমারী অনুসারে ত্রিপুরার মোট উপজাতির জন সংখ্যা ৪,৫০,৫৪৪ জন। এর মোট জন সংখ্যার হার ২৮.৯৫ শতাংশ। ১৯৫১-১৯৬১ সনে এই সংখ্যার হার ছিল ৩১.৫৩ শতাংশ। এ রাজ্যের বসবাসকারী উপজাতি জনগোষ্ঠীকে মোট ১৯ ভাগে ভাগ করা হয়েছে - (১) ত্রিপুরী, (২) রিয়াং, (৩) জমতিয়া, (৪) চাকমা, (৫) হালাম, (৬) নোয়াতিয়া, (৭) মগ, (৮) লুসাই, (৯) উচাই, (১০) কুকি, (১১) গারো, (১২) মুন্ডা, (১৩) ওরাং, (১৪) সাঁওতাল, (১৫) খাসিয়া, (১৬) ভীল, (১৭) ছাইমল, (১৮) ভুটিয়া, (১৯) লেপচা।

১৯৭১ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত সেলস অনুসারে বিভিন্ন উপজাতিদের মোট জনসংখ্যার তালিকা নিচে দেওয়া হল—

সংখ্যা	উপজাতি গোষ্ঠী	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
১	মগ	১৩২৭৩	১৮২৩১	৩১৬১২	৩০৩৮৫
২	ভীল	১৬৯	৮৩৮	১৭৫৪	২৩৩৬
৩	ভুটিয়া	০৩	২২	৪৭	২৯
৪	ছাইমল	—	১৮	২৬	২২৬
৫	চাকমা	২৮৬৬২	৩৪৭৯৭	৯৬০৯৬	৬৪২৯৩
৬	গারো	৫৫৫৯	৭২৯৭	৯৩৬০	১১১৮০
৭	হালাম	১৯০৭৬	২৮৯৬৯	৩৬৪৯৯	৪৭২৪৫
৮	জমতিয়া	৩৪১৯২	৪৪৫০১	৬০৮২৪	৭৪৯৪৯
৯	খাসিয়া	৪৯১	৩৫৮	৮৫৮	৬৩০
১০	কুকি	৭৭৭৫	৫৫০১	১০৬২৫	১১৬৭৪
১১	লেপচা	১৪	১০৬	১১১	১০৫
১২	লুসাই	৩৬৭২	৩৭৩৪	৪৯১০	৪৭৭৭
১৩	মুন্ডা	৫৩৪৭	৭৯৯৩	১১৫৪৭	১২৪১৬
১৪	নোয়াতিয়া	১০২৯৭	৭১৮২	৪১৫৮	৬৬৫৫
১৫	ওরাং	৩৪২৮	৫২১৭	৬৭৫১	৬২২৩
১৬	রিয়াং	৬৪৭২২	৮৪০০৩	১১১৬০৬	১৬৫১০৩
১৭	সাঁওতাল	২২২২	২৭২৬	২৭৩৬	২১৫১
১৮	ত্রিপুরী	২৫০৫৪৫	৩৩০৮৭২	৪৬১৫৩১	৫৪৩৮৪৮
১৯	উচাই	১০৬১	১৩০৬	১৬৩৭	২১০৩

উপরি উক্ত গোষ্ঠীরা নিজেদের মধ্যে একাধিক উপগোষ্ঠী একাধিক গোত্র বা কুল বিভাজনের পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাষার কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। আবার কারোর সঙ্গে একেবারে মিল নেই বললেই চলে।

মগ : নামকরণের ইতিহাস

“মগ” এই নামকরণের পেছনে নেপথ্য কাহিনি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। মগ জাতি নাম আখ্যা লাভের কারণ সম্পর্কে নানাজনে নানামত ও যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। বস্তুত অতীতে কার বা কাদের দ্বারা ‘মগ’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে এবং তার মূল অর্থ কী? এই বিষয় নিয়ে কেউ সঠিক উৎস তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। মগ শব্দটির অর্থ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে সর্বপ্রথমে আমরা বার্মিস রিসার্চ সোসাইটির সাময়িক সংবাদ পত্রের তেইশতম খণ্ডের ৫৩—৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রফেসর বি.ই. পীয়ান দ্বারা লিখিত ‘কিং বেরিং’ শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করতে পারি। এই প্রবন্ধ অনুযায়ী মগ শব্দটি নিঃসন্দেহভাবে বাংলা মূলের, কিন্তু শব্দটির যথার্থ তাৎপর্য এবং এর মৌলিক ব্যুৎপত্তি স্পষ্ট নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ -এর আদর্শ বাংলা অভিধান বলে যে, শব্দটির ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। অন্য এক সুপরিচিত অভিধান শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রচলিত বর্মী উপাধি মং থেকে এসেছে বলে দাবি করে, যা প্রায়ই বর্মী ভদ্রলোকের নামের আগে দেখা যায়। কিন্তু একে যথার্থ এবং সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

আর এক উৎস আছে যা মগ শব্দটির ব্যুৎপত্তিকে প্রাচীন মগধ সাম্রাজ্যের সঙ্গে জড়িত করে। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস রাজোওয়ং সূত্রে জানা যায় যে, ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের আধুনিক বিহার অঞ্চলের প্রাচীন মগধের চন্দ্র সূর্য নামক এক সামন্ত আদিম জড়োপাসক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ চট্টগ্রাম - আরকান অধিকার করে একটি রাজ্য স্থাপন করে তিনি সেখানকার রাজা হন। তাঁর রাজধানী ছিল আরাকানের ধান্যওয়াদী (ধান্যবতী)। তিনিই আরকানে মহামুনি বৌদ্ধমূর্তি ও মহামুনি প্যাগোডা নির্মাণ করেন। তাঁর সঙ্গী মগধাগত সৈন্যরা এই রাজ্যের আদিম জনগোষ্ঠীকে প্রথম আর্ঘভাষা, লিপি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে দীক্ষা দান করেন। আরকানে চন্দ্র সূর্য বংশের রাজারা খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক অবধি চট্টগ্রাম - আরাকানে একনাগাড়ে ক্রমপর্যায়ে শাসন করেছিলেন। এই সময়ে আরাকানে বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্য লাভ করে এবং চট্টগ্রামে হিন্দুধর্ম বিস্তার লাভ করে। অষ্টম শতকে স্বল্প কালের জন্য চট্টগ্রাম পাল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। অতপর পুনরায় চট্টগ্রাম - আরাকান রাজ্যভুক্ত হয়। এই সময় আরাকানে চন্দ্র সূর্য রাজবংশের পতন ঘটে এবং আরাকানের বৈশালীতে চন্দ্ররাজ বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের রাজা মূলত ইন্দ্রচন্দ্রের (৯৫১ - ৯৫৬ খ্রিঃ) রাজত্ব কালে তাঁর রাজ্যের উত্তরাংশ চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সুলতানকে দমন করতে স- সৈন্যে চট্টগ্রাম অভিযান করেন। সেখানে একটি পাথরের স্তম্ভ নির্মাণ করে তাতে “চং তৌ গং” বাণী উৎকীর্ণ করেন। যার অর্থ যুদ্ধের মাথা অর্থাৎ যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল। এই চট্ট তৌ গং শব্দ বিবর্তিত হয়ে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি বলে রাজোওয়ং সূত্রে এই তথ্য জানা যায়। চট্টগ্রামে আরাকানী শাসন কালে, দশম

শতকে চট্টগ্রামে পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আরাকানের প্রাচীন রাজারা ছিলেন মগধ বংশ উদ্ভূত ও মগধের ধর্মে ও ঐতিহ্যের অনুসারী। তাঁদের ভারতীয় নামে ও মগধ নগরের নামে তাদের রাজধানীর নামকরণে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট। যেমন আরাকানের রাজধানীর নাম ধান্যবতী। বৈশালী, রম্যাবতী, মেঘবতী, দ্বারবতী ইত্যাদি রাজ্যের নামও আরাকান ইতিহাসে পাওয়া যায়।

মারমা তথা আরাকানের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে মগ বলে আখ্যায়িত করার সম্পর্কে ইংরেজ পণ্ডিত, সেকাল ও একালের বাঙালী, পণ্ডিতদের কিছু অভিমত তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

ক) প্রফেসর ডি. জি. হল বলেন, মগ শব্দটি মঙ্গল বা মঙ্গোল শব্দের বিকৃত রূপ। কেন না মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আরাকানী জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য রয়েছে।

খ) গ্রীয়ারসন বলেন, মগ শব্দটি ইন্দোচীন জনগোষ্ঠী থেকে গৃহীত হয়েছে। মগেরা ইন্দোচীন জনগোষ্ঠীর একটি শাখা।

গ) ফারসী মুগ (অগ্নি উপাসক) শব্দ থেকে মগ নামের উৎপত্তি। আরাকানীরা অগ্নি উপাসক বা জড়ো উপাসক।

ঘ) সংস্কৃত মদুগ শব্দ থেকে (জলচরপক্ষী) জলদস্যু মদুগ মগ বা মঘ হয়েছে।

পণ্ডিত ডক্টর আহমদ শরীফ বলেন, এক সময়ে বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাঙলায়, আরাকানে ও বার্মায় প্রচারিত হয়। আরাকানে, বার্মায় কেবল বৌদ্ধধর্মই টিকে থাকে। অন্যগুলো কালে লোপ পায়। আভিজাত্য হিন্দু মাত্রই যেমন আর্যও আর্যাবর্ত উদ্ভূত, বৌদ্ধ মাত্রই তেমনি মগধ উদ্ভূত। মুসলিম মাত্রই মক্কা, মদিনা, ইরান, সমরকন্দ, বখারা থেকে আগত বলে দাবী করেন।

আরাকানের রাজারা সংস্কৃত বা পালি ভাষায় নিজেদের নাম রাখেন। যেমন মহাচন্দ্র, মূলচন্দ্র, শ্রী সুরিয়া (শ্রী সূর্য); চন্দ্রা সুরিয়া, চন্দ্র সূর্য, শ্রী সুধম্মা (শ্রী সুধর্ম) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য; এ মগ বা মঘ ‘মগধ’ শব্দজাত। চট্টগ্রাম ও আরাকানে রচিত বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের প্রমাণ রয়েছে। যেমন—

১) রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ অবতরী

তাহাতে মগধ বংশক্রমে বুদ্ধাবার।

নাম শ্রী সুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।।

২) মগধ রাজ্যেরমত মন্ত্র অনুপম

(দৌলত কাজির সতী ময়না-লোর চন্দ্রানী সম্পাদক সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষাল। পৃঃ ৪৫, ৪৭);

৩) যাহাকে প্রশংসা কৈলা মগধের প্রতি (আহম্মদ শরীফ সম্পাদিত সত্যকালির বিবাদ সংবাদ। পৃঃ ১০০);

৪) নানা শাস্ত্র পারগ বিদ্বান বিদগ্ধ আরবী, ফারসী আর হিন্দুয়ানী, মগধ। (সপ্তপয়কর আরাকানী ভাষার্থে);

৫) মগধের মন কহি গুণ গুণী গণ - (সপ্তপয়কর);

৬) মগধ মনের শুন বিবরণ - (সতীময়না, ঘোষাল, পৃঃ ১০);

৭) মগধের সন সংখ্যা বুঝাই নির্ণয় (তোহফা-আলাউল, আহমেদ শরীফ সম্পাদিত। পৃঃ ১২০);

৮) আধার মানিক যৌজা কদমরসুল;

ফাজিল যে অধিকারী মগধ বহু (বৌদ্ধ অর্থে);

(আওরাদে বারোজ প্রশস্তি - এতিম কাশেম রচিত। বাংলা একাডেমী পত্রিকা ভাদ্র চৈত্র ১৩৬৪ বাংলা। পৃঃ ৩৯/৪০);

৯) হাড়িডোম, মগধ জাতি আর যে কুলাল (বৌদ্ধ অর্থে মগধ) তোমার কল্যাণ হেতু মাগে সর্বকাল।

আরাকান রাজ্যে প্রচলিত সন মাঘী সন নামে আজও চট্টগ্রামে প্রচলিত রয়েছে। চট্টগ্রামে এখনও ভূমির পরিমাণ মঘীকানি (৪০ শতাংশ) হিসাবে চলে। এই মঘী প্রত্যক্ষে আরাকানী অর্থে এবং পরোক্ষ মগধ সম্রত আরাকানী 'বৌদ্ধ রাজকীয়' অর্থে ব্যবহৃত।

নতুন ইংরেজি অভিধানও উল্লেখ করে যে, মগ, মগেন, মোগ এই শব্দগুলি আরাকান এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর অধিবাসীদের নাম হিসেবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

সমাজের মধ্যে প্রচলিত কাহিনি অথবা কিংবদন্তী বিশ্লেষণ করলে মগ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায় যে, প্রাচীন কালে মগ জাতিগোষ্ঠীরা স্রাইমা নামেই পরিচিত। মংকা শোয়েনু নেভীর লেখা 'মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ আছে যে, মারমা শব্দটি মারমাজা বা স্রাইমাচা নামক বাম থেকে ডান দিকে লেখার রীতি অনুসারী বর্ণমালা উপমহাদেশীয় প্রাচীন ব্রাহ্মী হস্তাক্ষর লিপি হতে উদ্ভূত। "স্রাইমা সামাইং রাজ ওয়ং" নামক ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের কুষাণ ও গোদাবরী নদী অঞ্চলের লোকেরা বার্মার দক্ষিণ-পূর্বাংশে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এই অঞ্চলের লোকেরা বর্মীদের কাছে তলইং নামে পরিচিত এবং এদের রাজ্যের নাম ছিল "হাইসাওয়াদী"। পেগু এই রাজ্যের রাজধানী বা প্রধান নগর। সাহমালা এবং ওয়িমালা নামক দু'জন তলইং রাজপুত্র তাদের নেতৃত্বে আনুমানিক প্রায় ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে এই পেগু নগর গড়ে তুলেছিল। এই সময়কালে নৌ-যোগে এরাই সর্বপ্রথম এই মারমাজা বা স্রাইমাচা নামক বর্ণমালা বার্মার দক্ষিণ-পূর্বাংশে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। এ সম্পর্কে Sir Arthur P. Phayere সাহেব History of Burma গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'With south India and pegu constant inter course was maintained by sea. By this route the Buddhist scripture were brought to pegu and thence reached Burma and the alphabet now used by the burmese people shows the same influence' (Page - 29).

"Linguistic survey of India" নামক গ্রন্থে Dr. G. Grierson সাহেবও এই অভিমতকে সমর্থন করে বলেছেন -

"It is written in an alphabet which allowing for its cursive form, is almost identical with the khmer character, which was formerly used in the southern parts of the Burma." (Vol. V. Part - 1) (Page - 132)

যেহেতু মারমা জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষগণ এই প্রাচীন হস্তলিপির মাধ্যমে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে এবং নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এই হস্তাক্ষরের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে নিজ বংশ রক্ষা করে চলেছে, সেহেতু আজ এরা নিজ গোষ্ঠীসহ অপরাপর জনগোষ্ঠীর কাছে নিজেদের ‘মারমা’ নামে পরিচয় দিয়ে থাকে।

এছাড়া ‘মারমা’ কিংবা ‘সাইমা’ নামের একটি জনগোষ্ঠী বা জাতিসত্তার অস্তিত্ব প্রাচীনকালেও ছিল এর প্রমাণ মেলে বিভিন্ন তথ্যসূত্রে। আনুমানিক নবম ও দশম শতাব্দীতে হীনমান বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ও তিব্বতী দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীভুক্ত ‘সাম্মা’ নামে এক জাতির প্রাচীন ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায় — কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রী প্রভাতাংশু মাইতি প্রণীত ‘ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (প্রাচীন যুগ)’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪৮৫-৪৮৬) এর উল্লেখ আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী মগ জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে ‘মারমা’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে এসেছে আরাকান সম্রাট কর্তৃক চট্টগ্রাম এলাকা শাসনের জন্য প্রেরিত বোমাংরাজ বংশের পূর্বপুরুষ পেগু রাজ্যের রাজা বিরান নং - এর উত্তরসূরি মংচপ্যাই তথা মুসলিম নাম আলিমালিক -এর আমল থেকে অর্থাৎ ১৬১৪ইং সাল থেকে। যদিওবা ব্রিটিশ ও মোগল শাসক শ্রেণী কর্তৃক এ জনগোষ্ঠীকে ‘মগ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। তবে স্বাধীনতা - উত্তর বাংলাদেশ সরকারিভাবে মারমা উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ্য যে, মারমা জনগোষ্ঠীর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাবু ক্যাশোয়ে প্রঃ কর্তৃক সংগ্রহকৃত এক তথ্যসূত্রে জানা যায়।

“The term ‘MARMA’ was officially recognised by the East Pakistan Govt. in 1961. The present Bohmonggree Maung Shwe Prue Chowdhury appealed to the Govt. for recognition of ‘MARMA’ instead of ‘Mogh’ used by the British govt. because the people of Bohmong Circle never call them- selves ‘Moghs’ . They know themselves as ‘MARMA’ and used the term ‘MARMA’ among themselves.”
(উপজাতীয় গবেষণা পত্রিকা - সাংগু, বর্ষঃ দুই, সংখ্যা এক, পৃষ্ঠাঃ ১৫)।

আসলেই মারমা একটি নাম। এটা কোন ব্যক্তি কিংবা কোন এলাকার বা বস্তুগত কোন নাম নয়। মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠী ইন্দো-এরিয়ান বংশোদ্ভূত এক আধুনিক জাতিসত্তার নাম। ভারতীয় উপমহাদেশে ওফার-ইষ্ট এশিয়ার সর্বত্র এই জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষগণ বিচরণ করতো। তারা প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, মন্ত্র-তন্ত্র ও সমর শাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। এই জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত মঘা ভেষজ ঔষধ এদেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে আজও সুপ্রসিদ্ধ। মারমা ঐশ্বরিক মন্ত্র-তন্ত্রের কলা-কৌশল আজও প্রচলিত। এ ছাড়াও মারমা পূর্বপুরুষদের দ্বারা গঠিত রক্ষী-সৈন্যদল তলইং বাহিনী বর্মী ও আরাকানী রাজাদের নিকট অত্যন্ত লোভনীয় ছিল। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দেও বোমাং রাজা এ সৈন্য বাহিনীকে প্রতিপালন করে রেখেছিলেন Frontier Protection & Lushai Expedition এর জন্য (Bangladesh District Gazetters : Chittagong Hill tracts. Page : 38)। আরাকানের রাজা মাংরাজাগ্রী

১৫৯৯ ইং সালে পেণ্ড থেকে তেত্রিশ হাজার তলইং যোদ্ধাকে বন্দী করে তার রাজধানীতে নিয়ে এনে সীমান্ত রক্ষী সৈন্যদল গঠন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে ১৬১৪ ইং সালে পর্তুগীজ দৌরাড্যা দমন করার উদ্দেশ্যে ও এই তলইং বাহিনীকে নিযুক্ত করেছিলেন বলে প্রাচীন আরকানী ইতিহাস রাজওয়ং সূত্রে জানা যায়।

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, মারমা শব্দটি ‘মারমাজা’ বা ‘শাইমাচা’ নামক উপমহাদেশীয় প্রাচীন ব্রাহ্মী হস্তাক্ষর লিপি হতে উদ্ভূত। তলইং নামে পরিচিত মারমাদের পূর্বপুরুষ হাইসাওয়াদী রাজ্যের রাজধানী পেণ্ডুর নগরবাসীরা, আনুমানিক ৫০০ হতে ৬০০ খ্রিস্টাব্দে মারমাজা নামক হস্তাক্ষর লিপি বার্মার দক্ষিণ-পূর্বাংশে সর্বত্র ছড়িয়েছিল। এমনকি মারমাদের পূর্বপুরুষ এই তলইং জনগোষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত সুনিপুণ বহু শিল্প-স্থাপত্য কর্মের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আজও বার্মার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অতীত ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য বহন করছে (D. G. E. Hall, A Short History of South-East Asia, Page - 266)। তথাগত গৌতম বুদ্ধের জীবিত কালেও এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পেণ্ডু নামে একটি নগর ও সুদর্শন পাহাড় ছিল এই প্রমাণ মেলে Myanmar-এ তথ্যসূত্রে। এই তথ্যসূত্রে প্রাচীন হাইসাওয়াদী রাজ্যের রাজা সাহমালা ও ওয়িমালা ছাড়াও ৯৮২ ইং সনে রাজা অনুবথা, ১৩৮৫ ইং সনে মোন রাজাধিরাজ ও ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে বায়িং নায়ারাহ কর্তৃক হাইসাওয়াদী রাজ্য শাসনের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, G. E. Herby -এর ‘Baiying nong and his living descendents’ অর্থাৎ ‘বায়িং নং ও তাঁর জীবিত বংশধর’ শিরোনামের প্রবন্ধে মোন বংশধরগণ কখনো নিজেদের ক্ষেত্রে তলইং নামটি ব্যবহার করেন না, কিন্তু ভিন্ন জাতি লোকেরাই এ নামে মোনদের সম্বোধন করে থাকে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তলইং নামটি এ্যাংলো ধারণা এবং ১৯২০-৩০ ইং সালে ইঙ্গ-বঙ্গ ব্যবহারিক শব্দ হিসাবে পেণ্ডু থেকে আগত মোনদেরকে তলইং এবং সেখানকার রাজা বায়িং নং ও ছিল একজন তলইং রাজা বলে মন্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে, তলইংরা আসলে শ্যাম বংশোদ্ভূত। লক্ষ্মীপুর, শিবসাগর, কামরূপ, গোয়াল পাড়া, কাছার এবং গারো পাহাড়ে বসবাসরত আসাম উপত্যকার বর্মীরা ১৮১৭-২৫ ইং সালের দখলদার বর্মী তলইং সেনাদের বংশধর। তাদের অধিকাংশই ছিল শ্যাম বাজিংপ জাতিভুক্ত। ঐতিহাসিক জনাব আব্দুল হক চৌধুরীও শাইমা জনগোষ্ঠীকে প্রাচীন কালে শ্বেতহস্তীর জন্য সুখ্যাত শ্যাম দেশ আজকের থাইলেন্ডবাসী মোন ক্ষেমের তলইং জনগোষ্ঠীর একাংশ বলে মনে করেন। এছাড়াও R. H. S. Hutchinson, Mautice Collies প্রমুখ ইউরোপীয় লেখকদের উদ্ধৃতিতে মারমা জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তে ‘এ ধরনেরই পরোক্ষ কিংবা প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন।

অতএব, এই সব ইউরোপীয় বণিক, পর্যটক, প্রশাসক ও গবেষকগণ উপমহাদেশীয় তথা Indian Subcontinent বাসী এই মারমাভাষী জনগোষ্ঠীকে কোথাও মোনতলইং কোথাও শ্যাম ক্ষেমের, কোথাও মগ আরাকানী, কোথাও তংসা ক্ষ্যংসা, কোথাও জুম্ম-পাহাড়ীয়া, কোথাও মারমা জনগোষ্ঠী নামে আখ্যায়িত করেছেন। ফলে সাধারণ জনগণের মনে মারমা বা শাইমাদের সম্পর্কে নানা অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে। অতীত ইতিহাস হয়েছে বিকৃত

ও স্মৃতি-বিস্মৃতির আড়ালে লুপ্ত।

মারমা ইতিহাস এখনো বিতর্কিত পর্যায়ে আছে। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির উপর লিখতে গিয়ে অনেক বাংলাভাষী লেখকরাও সঠিক ও যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যের অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল তথ্য ও ঘটনার অবতারণা করেছেন। পরবর্তীতে এগুলো লেখকদের হাত বদল হতে হতে একটা ভ্রান্ত ইতিহাসের রূপ নেয়। মগ বা মারমাদের প্রচলিত ইতিহাস ও ধ্যান-ধারণায় যে প্রচুর অসংগতি রয়েছে, তার আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ আসে বাংলাদেশের মগ বা মারমা জাতির প্রধান বোমাঙ রাজা মংশৈপ্র চৌধুরীর কাছ থেকে। 'তিনি ১৯৫০ ইং সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাছে মগদের নামে তালিকাভুক্ত করার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। (সূত্রক্যশৈপ্র)। ক্যশৈপ্র তাঁর 'মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি' নিবন্ধে আরও লিখেছেন, 'মারমা' উপজাতিকে অ-মারমারা 'মগ' বলেন। আসলে মারমাদের কাছে 'মগ' শব্দটি অ-মারমাদের প্রদত্ত ও ব্যবহৃত শব্দবিশেষ। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে আরাকানী জলদস্যুদেরকে 'মগ' অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু উল্লেখ্য যে, মারমা উপজাতি সেই জলদস্যু মগ নয়।'

উপরোক্ত প্রতিবাদ ও নিবন্ধের আলোকপাত জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আকারে আলোড়িত হয়নি। তবে মগ জন-গোষ্ঠীদেরকে জলদস্যু বলে যে অপবাদ বা বদনাম দেওয়া হয়েছে, তা কোন মগ সম্প্রদায় এই অপবাদ মেনে নিতে পারেনি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তারা প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি। তবে সহজ সরল মগ জনগোষ্ঠীরা এই বিষয়ে ভীষণ অপমান বোধ করে।

মগ জনজাতিরা নিজেদেরকে জলদস্যু বলে অস্বীকার করার কারণের পিছনে প্রাচীন ইতিহাসের কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ইতিহাসে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ, সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে Sebastien Gonzeles নামে একজন ভয়ঙ্কর জলদস্যু তাঁর ৪০টি নৌযান ও ৪০০ জন পর্তুগীজ দস্যুসঙ্গী নিয়ে বঙ্গোপসাগরের নৌযান ও উপকূলের গ্রামগুলির উপর সাংঘাতিক ভাবে লুটতরাজ ও উপদ্রব করতো। আরাকান রাজা তাকে দমনের চেষ্টা চালালে গঞ্জালিস ভারতের গোয়াস্থিত পর্তুগীজ ভাইসরয়কে আরাকান জয়ে প্রলুব্ধ করে এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। ঐ সময়, ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে গোয়া থেকে গিয়ে পর্তুগীজ নৌবাহিনী আরাকানের নৌবন্দর আক্রমণ করে। সেখানে নোঙ্গর করা ডাচ (Dutch) জাহাজগুলি আরাকানের পক্ষ নেয়। দুইবার প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে পর্তুগীজ নৌবাহিনীর প্রধান Don Francis de Menses নিহত হলে পর্তুগীজরা যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তারা গোয়ায় পালিয়ে যায়।

অতপর, বিজয়ী আরাকান রাজা মিওংখামং (হোসেন শাহ) বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে পর্তুগীজ জলদস্যুদেরকে চিরতরে সমূলে ধ্বংস করেন। G. E. Harvey তাঁর লেখা History of Burma Arakan গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : Minhkamaung (Husein Shah) 1612-22) Is famous as the king who broke the Power of the Portuguese in his dominions.

বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মতে মগ বা মারমাদের আদিনিবাস হাইসাওয়াদির (বর্তমান মায়ানমার) পেগু শহরে। হাইসাওয়াদির সম্রাট ছিলেন নাইন্দাবায়িন (১৫৮১-১৫৯৯ ইং সাল)।

এদিকে দাঙ্যাওয়াদি (ধান্যবতি) তথা আরাকানের মহারাজা মিঙয়াজাগী এক পরাক্রমশালী সম্রাট। ১৫৯৯ ইং সালে আরাকান-হাইসাওয়াদির মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং যুদ্ধে হাইসাওয়াদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। পেগু রাজকুমারী সাইন্ডুহাং ও নাবালক রাজকুমার মংচপঁয়ো ৩৩ হাজার সৈন্য অনুসারী- সহ আরাকান তথা দাঙ্যাওয়াদির (ধান্যবতী) অধীনে নীত হয়। মংচপঁয়ো পরবর্তী স্বীয় চেষ্টায় দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এক সময় আরাকান সম্রাট মিঙখামং (হোসেন শাহ) -এর দৃষ্টি আকর্ষিত হন এবং ১৬১৪ ইং সালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ প্রসঙ্গে G. E. Harvey তাঁর History of Burma গ্রন্থে লিখেছেন, ‘রাজা মিঙখামং -এর আমলে তাঁর অধিকৃত নোয়াখালীর নদী- সমুদ্র- উপকূলবর্তী এলাকায় পতুর্গীজদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় তাঁর সংমামা পেগুর ভূতপূর্ব রাজকুমার মংচপঁয়োক ১৬১৪ ইং সালে চট্টগ্রামে শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন মংচপঁয়ো তাঁর তলইং বাহিনীকে নিয়ে চট্টগ্রাম আগমন করেন ও অল্পদিনেই পতুর্গীজ দমনে সমর্থ হন। এতে আরাকান রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বোমাঙ উপাধিতে সম্মানিত করেন।’

বাংলাদেশের লেখক আব্দুল হক চৌধুরী মংচপঁয়ো-র তলইং বাহিনীকে ‘মারমা বাহিনী’ আখ্যায়িত করেছেন তাঁর ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের মারমা উপজাতি’ শিরোনামের প্রবন্ধে। মংচপঁয়ো কত সালে বোমাঙ উপাধি পান মিঃ হার্ভে তা উল্লেখ করেননি। তবে মৌলিক ইতিহাস হতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, ১৬২০ ইং সালে তিনি বোমাঙ উপাধিতে ভূষিত হন।

আলোচ্য পতুর্গীজ দস্যুদলে মগদের প্রবিশ্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। প্রথম পর্যায়ে, কারণ তারা আরাকানী রাজাদের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল, দ্বিতীয় পর্যায়ে, বোমাঙ মংচপঁয়ের নেতৃত্বে প্রধানত তারাই জলদস্যু দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মারমা কিংবা মগ জনগোষ্ঠীরা জলদস্যু নয় এবং এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এছাড়াও বাংলাদেশ ও ত্রিপুরায় বসবাসরত মগ জনগোষ্ঠীদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারা অত্যন্ত সহজ, সরল ও শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠী। এদের আচার- আচরণ আদব-কায়দা ও ব্যবহারের সাথে জলদস্যুতার আখ্যা বা সংজ্ঞার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সে যাই হোক আগামী দিনের গবেষকরা এই ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন বলে আশা রাখছি।

বর্তমান বাংলাদেশে মগ জনগোষ্ঠীরা ‘মারমা’ উপজাতি নামেই পরিচিত ও স্বীকৃত। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে মগ আদিবাসীরা ‘মগ’ নামেই সুপরিচিত। তারা নিজেদেরকে মগ নামেই পরিচয় দিয়ে থাকেন।

ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ

মগ জাতিগোষ্ঠীদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যথেষ্ট কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে সঠিক তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রথমত : মগদের পিতৃভূমি রাখাই প্রে (আরাকান) বর্তমান মায়ানমার একটি প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে মায়ানমার কর্তৃপক্ষ কোন বিদেশী লেখক বা গবেষকদেরকে সঠিক ইতিহাস তৈরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত : মহাযুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ সরকার কর্তৃক যে- সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে মায়ানমার সরকার তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে বাধার সৃষ্টি করে, যদিও সেই সমস্ত তথ্য সীমিত আকারে ছিল।

মগদের বিবিধ কিংবদন্তী ও ইতিহাসের উপর আলোকপাত করা গেল। বিভিন্ন প্রবন্ধে মগ, রাখাইন ও আরাকানী এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই তিনটি শব্দ বলতে গেলে প্রায় একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নাম। এর সামান্যতম ব্যাখ্যা The Arakanese community of Bangladesh প্রবন্ধে দেয়া আছে।

ভাষাগত দিক থেকে মগ (ম্যানমা) এবং আরাকানী প্রায় একই ভাষার অধিকারী। শুধু উচ্চারণের দিক দিয়ে বিচার করলে অনেকটা আলাদা বলে মনে হয়। বর্মী বা মায়ানমার ভাষার চেয়ে রাখাইন বা আরাকানীদের ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরায় বসবাসকারী মগদের ভাষায় প্রায় একই রকম মনে হয়।

উচ্চারণের কিছুটা তফাৎ হলেও ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তারা সমান উদ্ভরাধিকারী। বর্মী (ম্যানমা) ও আরাকানী উভয় জাতীয় লোকেরাই বিশ্বাস করে যে, অতীতে তারা একই জাতির অংশীদার ছিল। কিন্তু বিগত সহস্রাধিক বছর ধরে তাঁদের ইতিহাস ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছে। আর তাই তাদের ইতিহাসও অতীতে লিখিত হয়েছিল স্বতন্ত্রভাবে। আরকান এবং বর্মীদের (মায়ানমার) দেশ কীভাবে আলাদা হলো এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের লেখক সুগত চাকমার লেখা কিংবদন্তীর আরাকান প্রবন্ধের কিছু কথা উল্লেখ করছি।

সুদুর অতীতে বর্মী এবং আরাকানীরা যখন একত্রে মিলেমিশে তগং (Tagoung) শহরে বাস করতো তখন একসময় ভারতবর্ষে কোশল রাজার সাথে শাক্য রাজকুমারদের যুদ্ধ বেধেছিল। ঐ যুদ্ধে শাক্যরা পরাজিত হয়। তখন আভিরাজা নামক একজন শাক্য রাজকুমার মধ্যদেশ (Myitzeema pyec) থেকে সসৈন্যে তাঁর অনুগতদের নিয়ে পূর্ব দিকে চিন দুইন (Thallwadee) এবং ইরাওয়াদী (ইরাবতী) নদী পেরিয়ে প্রাচীন তগং (Tagoung or Thinga Tharate) শহরে পৌঁছেন। তিনি সেখানে বর্মী ও আরাকানীদের পূর্বপুরুষদের

উপর রাজত্ব করেন।

দুই রাজকুমারের বিরোধ - বর্মী ও আরাকানী দুটি জাতির সৃষ্টি :

আভিরাজার ছিল দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম কানরাজাগ্রি এবং ছোট রাজকুমারের নাম কানরাজাঙে। পিতার মৃত্যুর পর তগং-এর সিংহাসন নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তখন দু'জনের মধ্যে ঠিক হলো যে, তাদের মধ্যে যে সবার আগে একটি পাকা বৌদ্ধ বিহার (ক্যং) বুদ্ধের জন্য নির্মাণ করতে পারবে, সেই হবে রাজা। দু'জনের কথা মতো প্রতিযোগিতা শুরু হলো। কিন্তু ছোট ভাই ছিল খুব চালাক।

সে এক রাত্রের মধ্যেই বাঁশ দিয়ে একটি মন্দির তৈরি করে তা, কাপড় দিয়ে এমনভাবে মুড়ে দিল যে, দূর থেকে সবাই তা দেখে এটিকে সত্যিকারের পাকা মন্দির মনে করলো। বড় ভাই কানরাজাগ্রিও তাই মনে করে কোন প্রকার পরীক্ষা ছাড়াই তৎক্ষণাৎ সপরিবারে তাঁর অনুগতদের নিয়ে তগং শহর ত্যাগ করে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে চিন দুইন নদীর পশ্চিমতীরে কলাই দং নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে পিউ ও চাক জাতীয় লোকেরা তাঁর সাথে মিলিত হলো। তিনি তাদের উপর তাঁর ছেলে মধু সেইতাকে শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। অতপর কানরাজাগ্রি তাঁর বাকি অনুসারীদের নিয়ে আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর আরাকানের ক্যকপানদং পর্বতে পৌঁছে, সেখানে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করে রাজত্ব করতে থাকেন। ঐ স্থানে এখনও বহু ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এখনও বর্মী ও আরাকানীরা উভয় জাতীয় লোকেরাই বিশ্বাস করে যে, যারা কানরাজাগ্রির সাথে ঐ সময় আরাকানে এসেছিল তারাই হলো আরাকানী বা রাখাইন, আর যারা কানরাজাঙের সাথে তগং শহরে থেকে গিয়েছিল তারাই হলো বর্মী বা ম্রেনমা। ঐ বিশ্বাসের কারণে বর্মীরা এখনও আরাকানীদেরকে ব্যামাগি বা জ্যেষ্ঠ শাখার (elder branch) লোক বলে থাকে।

সুদূর অতীতে কানরাজাগ্রি যখন আরাকানে যাননি তখন ভারতের বারাণসী রাজ্য থেকে এক রাজপুত্র এসে আরাকানে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল রামাওয়াদী (রামবতী) বারাণসী থেকে আগত রাজপুত্রের পরবর্তী কালে এক সময় তাঁর বংশজাত দশজন রাজপুত্র প্রজাদের হাতে নিহত হয়। বেঁচে যায় কেবল তাদের এক বোন। এই রাজকন্যা উত্তর আরাকানে পালিয়ে গিয়ে এক ব্রাহ্মণকে বিয়ে করেন। তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে।

এই বিষয়ে কিংবদন্তীতে একটি কাহিনি পাওয়া যায়। কপিলাবস্তু থেকে অর্জুন নামে এক রাজা সন্ন্যাসী হয়ে গভীর জঙ্গলে আশ্রম তৈরি করে বাস করতো। সন্ন্যাসী সেই স্থানে রোজ মূত্র ত্যাগ করতেন। ঠিক সেই প্রস্রাবাগারে একটি বন্য হরিণী এসে রোজ সন্ন্যাসীর মূত্র পান করে যেতো।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন বন্য হরিণী (গর্ভবতী হল) পেটে গর্ভধারণ করে এবং সঠিক সময়ে একটি মানব ছেলে সন্তান জন্ম দিল।

এক সময় একজন শ্রো সর্দার কুলাডেন নদীর তীরে শিকারে গিয়ে বনে একটি সদ্যজাত মানব শিশু কুড়িয়ে পায়। ঐ বন্য হরিণী শিশুটিকে সেখানে নিয়ে এসেছিল। শ্রো সর্দার শিশুটিকে

নিজের বাড়িতে এনে বড় করে। এরই নাম মারায়ো। মারায়োর শরীর মানুষের মত সুন্দর আকার ধারণ করলেও তাঁর মাথায় হরিণের শিং-এর মত দুটি শিং ছিল। সেই শিং দুটিকে লুকিয়ে রাখার জন্য মাথায় গংবং নামক পাগড়ী বাঁধতো। এই মারায়ো রাজার আমল থেকেই মগ আরাকান পুরুষদের মাথায় পাগড়ী বাঁধার প্রচলন শুরু হয়েছিল। মারায়ো বড় হয়ে স্রো সর্দারের এক কন্যাকে প্রথমে বিয়ে করেন। পরে তিনি পূর্বাঞ্চল ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বারাগসী রাজবংশীয় রাজকন্যার গর্ভজাত কন্যাটিকেও বিয়ে করেন। আরাকানের আদিরাজা মারায়ো সমস্ত আরাকানের উপর তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে নতুন একটি রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে তার নাম রাখেন ধান্যাওয়াদী (ধান্যবতী)। অনেক বছর চলে গেল। এক সময় আরাকানে বিরাট একটি বিদ্রোহ দেখা দিল। ঐ বিদ্রোহের সময় মারায়ো বংশের শেষ রাজার স্ত্রী অর্থাৎ রাণী তাঁর দুইজন কন্যা নিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁরা সেখানে তগং শহর থেকে আগত রাজা কানরাজাগ্রির সাথে ক্যকপানদং পর্বতে গিয়ে দেখা করেন। এই সাক্ষাতের ফলে ঐ দুটি রাজবংশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাজা কানরাজাগ্রি মারায়ো বংশের দুইজন রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। অতপর কানরাজাগ্রি ক্যকপানদং থেকে আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে সমস্ত আরাকানের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। আরাকানে কানরাজাগ্রির বংশধরেরা ৬২ পুরুষ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। তারপর কোন এক সময় ধান্যাওয়াদী (ধান্যবতী) পরিত্যক্ত হয় এবং আরাকানের সুপ্রাচীন রাজধানী ধান্যাওয়াদী ধ্বংস নগরীতে পরিণত হয়। উত্তর আরাকানে প্রাচীন ধান্যাওয়াদী শহরে গেলে এখনও এর বহু ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

আরাকানে চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ এবং প্রাচীন ওয়েশালী (বৈশালী) নগরের পত্তন কাহিনি :

আরাকান রাজা কানরাজাগ্রির ৫৩তম পুরুষের রাজত্বকালে তাঁর রাজ্যে একটি প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দেয়। জ্যোতিষীরা গণনা করে বললো যে, অচিরেই অশুভ শক্তির কারণে ধান্যাওয়াদী (ধান্যবতী) নগর ধ্বংস হয়ে যাবে। এর পরিত্রাণের উপায় হলো আরাকানের রাজাকে তাঁর রাজধানী অন্য কোথাও স্থানান্তর করতে হবে। তখন রাজা মহতইং চন্দ্র জ্যোতিষীদের কথা মত প্রাচীন ধান্যাওয়াদী নগর ত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে নতুন একটি স্থানে রাজধানী স্থাপন করলেন। বৌদ্ধ যুগের প্রসিদ্ধ ভারতীয় নগর বৈশালীর নামানুসারে আরাকানে ঐ রাজধানীর নাম রাখা হলো ওয়েশালী (বৈশালী)।

৮ম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানে বেশ কয়েকজন ‘চন্দ্র’ নামধারী রাজা রাজত্ব করেছেন। তাঁরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

কিন্তু তাঁদের মুদ্রায় হিন্দুদের প্রতীক গরু ও ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। ঐ সকল মুদ্রায় আরাকানী বা বর্মী বর্ণে রাজাদের নাম লেখা ছিল। দশম শতাব্দীতে চুলা চেন্দ্রা (সুলতইং চন্দ্র) নামে একজন আরাকান রাজা ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর দিকে অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম দখল এবং সেখানে চইং ত-গং লেখাযুক্ত একটি শিলালিপি স্থাপন করেন। চইং ত-গং বা চট্টগ্রাম শহরের নামটি এভাবে এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। (Bangladesh District Gazetteer, Ciittagang 1975 খ্রিঃ)।

বর্মী রাজ আনোরথা (অনিরুদ্ধ) কর্তৃক আরাকান জয় :

বার্মার পরাক্রমশালী রাজা অনুরাথা বা অনিরুদ্ধ (১০৪৪-১০৭৭ খৃঃ) তাঁর রাজত্বকালে আরাকান জয় করে পূর্ববর্তী চন্দ্রবংশীয় একজনকে আরাকানের সিংহাসনে বসান এবং পিংসা (Pingsa) নামক স্থানে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় রাজা অনুরাথা চট্টগ্রাম পর্যন্ত যান। তিনি সেখানে একটি বৌদ্ধমন্দির ও সেখানে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এর ষাট বছর পরে আরাকানের তৎকালীন রাজা মংভিলু তাঁর অধীনস্থ একজন অভিজাত আমলা কর্তৃক নিহত হলে তাঁর উত্তরাধিকারী মেংরি বারাং সস্ত্রীক পুগানে পালিয়ে যান এবং সেখানে ২৪ বছর থাকেন। সেখানে লেত্যাংমেনান নামে তাঁর এক ছেলে জন্ম হয়। এখানে উল্লেখ্য বিষয় আরাকান রাজ্যের পাশে হাইসাওয়াদী (হংসবতী) নামক আরও একটি রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের রাজধানী হল পুগান বা পেগু। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরাবাসী মগদের আদি নিবাস হাইসাওয়াদী ও পুগানে ছিল বলে মগ ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

লেত্যাংমেনান কর্তৃক বোধগয়ার সংস্কারকরণ :

বিখ্যাত পেগু বা পুগান রাজ আলংসিথু তাঁর সৈন্য দিয়ে আরাকানে নির্বাসিত রাজকুমার মেংরিবায়ার ছেলে লেত্যাংমেনানকে আরাকানের সিংহাসন অধিকার করার ব্যাপারে সাহায্য করেন। লেত্যাংমেনান ১১০২ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ জগতের শ্রেষ্ঠ তীর্থকেন্দ্র গয়াস্থিত বুদ্ধগয়ামন্দিরের সংস্কারসাধন করেন। সেখানে প্রাপ্ত একটি লিপিতে তিনি নিজেকে এক লক্ষ পিউ সৈন্যের অধিপতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী গানগুলিতেও সে- কথা পাওয়া যায় — পুগান থেকে জলে ও স্থলে উভয় পথে এক লক্ষ পিউ এবং এক লক্ষ তলইং সৈন্য আরাকানে পাঠানো হয়েছিল।

বঙ্গ - আরাকান সম্পর্ক স্থাপন :

লেন্সু রাজবংশের শেষ রাজা মাংচোমোয়েঙ (অন্য নাম নর মিখলা) ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বার্মা (মায়ানমার) রাজা মেং শোয়েই ১৪০৬ খ্রিঃ ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করেন এবং রাজা মাংচোমোয়েঙকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। তখন মাংচোমোয়েঙ বাংলার রাজধানী গৌড়ের রাজদরবারে আশ্রয় প্রার্থী হন। তৎকালীন বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯ খ্রিঃ - ১৪১০ খ্রিঃ) আরাকান রাজ্য আশ্রয় প্রদান করেন। ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শর্কী দ্বিতীয়বার বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। তখন গৌড়ের রাজ দরবারে নির্বাসিত জীবন যাপন করী আরাকান রাজ মাংচোমোয়েঙ ঐ যুদ্ধে সুলতান জালাল উদ্দীন মোহাম্মদ শাহ-কে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বাংলার নবাব বা সুলতান রাজা মাংচোমোয়েঙের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে আরাকানের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। আরাকান রাজ দীর্ঘ ২৪ বছর (১৪০৬ খ্রিঃ - ১৪৩০ খ্রিঃ) গৌড়ে নির্বাসিত জীবন যাপনের পর ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৪২৬ খ্রিঃ - ১৪৫৯ খ্রিঃ) সহায়তায় আরাকানের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। রাজা মাংচোমোয়েঙ পুনরায় আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করার পর ভবিষ্যতে আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্যকে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে আরাকানের রাজধানী লাউংগ্রেট -এর

পরিবর্তে চট্টগ্রামের অদূরে চাইতোয়ে বা আকিয়াব জেলার লেশু নদীর তীরবর্তী মাউক-উ নগরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে সেখানে আরাকানের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। অতীতে এই শহর বাঙ্গালীদের কাছে পাথুরে কিল্লা নামে পরিচিত ছিল। এই সময় আরাকান বাংলার মুসলিম, সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। আরাকান রাজ দরবারে ও সৈন্য বাহিনীতে বহু মুসলিম বহু উচ্চপদে চাকরী করেছিলেন। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন আরাকান বার্মা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে বর্মীদের অত্যাচারে স্রাউক-উনগরী (রাজধানী) ধ্বংসস্থূপে পরিণত হয়। তখন থেকেই আরাকানীদের কাছে স্রো হং (পুরাতন নগর) নামে পরিচিত। এই মোহং নামটি বাংলা-ভাষীদের কাছে বিকৃত হয়ে রোসাং নামে পরিণত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

মুসলিম উপাধিগ্রহণ :

রাজা মাংচো মোয়েঙ পুরনায় আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করার পর নিজ রাখাইং নামের সঙ্গে একটি মুসলিম উপাধি (সোলায়মান খান) গ্রহণ করেন এবং তাঁর আমলে প্রচলিত মুদ্রার এক পিঠে রাখাইং অক্ষরে এবং অন্য পিঠে ফারসি অক্ষরে নিজের নাম ও পদবী উৎকীর্ণ করেন। এভাবে তাঁর পরবর্তী ১৭ জন রাখাইং নামের সঙ্গে একটি করে মুসলিম উপাধি গ্রহণ করেন এবং রাখাইং বা আরাকান ও ফারসি ভাষা সংবলিত মুদ্রা চালু করেন (তথ্য সূত্র : G. E. Harvey/ J.A.S.P.)। রাখাইং বা আরাকান রাজাদের মুসলিম উপাধি গ্রহণ সম্পর্কে প্রফেসর আলমগীর মহাম্মদ সিরাজুদ্দীন বলেন —

“It is difficult to accept the view that assumption of muslim name was the manifestation of muslim influence in Arakan Among other things, it does not explain why only I out of 48 rulers were won over by the muslim. Again Muslim influence rose to its height during the long and prosperous reign of king Sanda Thudamma (1652-84). Yet, he did not take Muslim names and title and was content with his Arakanese name and coin. In reassessing the significance of Muslim names and titles we must not lose sight of the fact that the rulers who assumed Muslim name had chittagong under their possession”. (তথ্য সূত্র : Muslim influence in Arakan and the Muslim name of Arakanese kings / J. A. S. B)।

রাখাইং, রাজাদের রাখাই নামের সঙ্গে মুসলিম উপাধি গ্রহণের পিছনে দুটি কারণ থাকতে পারে : প্রথমত, হত রাজ্য পুনরুদ্ধারে বাংলার সুলতানের সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা। দ্বিতীয়ত, মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল শাসনের সুবিধার্থে। এখানে লক্ষণীয়, রাখাইং বা আরাকান রাজারা যতদিন পর্যন্ত মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল শাসন করেছিলেন ততদিন মুসলিম উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। রাখাইং ও ফারসি লিপি সংবলিত মুদ্রা চালু করার প্রধান কারণ ব্যবসায়িক বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। ইতিহাস গবেষকদের মতে, তখনকার আরবদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সময় (বাণিজ্যিক লেনদেন) ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে আরাকানী মুদ্রার রাখাইং ও ফারসি লিপি উৎকীর্ণ করা হত।



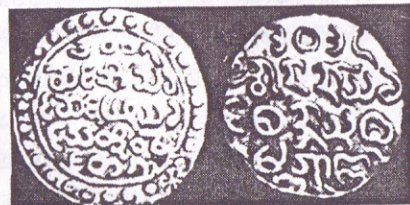
660 RE (1298AD)
Naradipati Uridaw Maha Nandabaya



1000RE (1638AD)
Sinphyuthakhin Sinithakhin Naradipati Gree



963RE (1601AD)
Sinphyushin Naradipati Hsawlai Shah

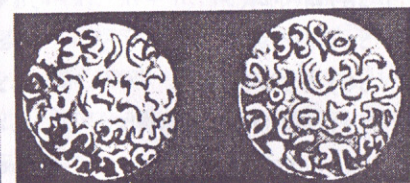


1004RE (1642AD)
Sinithakhin Sinphyuthakhin Thadoe Mong - taragree

1014RE (1652AD)
Shwenanthakhin Sandathudamma Raza

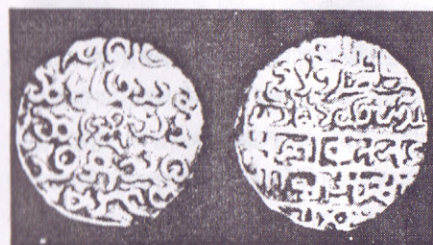


981RE (1619AD)
Sinphyuthakhin Sinithakhin Mongtaragree U Shaung Shah

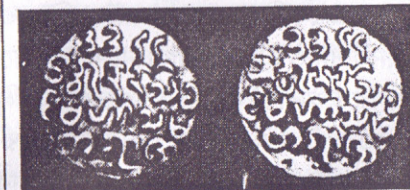


1126RE (1764AD)
Shwenanthakhin Abaya Maharaza

1140RE (1778AD)
Shwepeyihakhin Damma Razadiraza



984RE (1622AD)
Sinphyuthakhin Sinithakhin Thirühudamma Raza



1144RE (1774AD)
Shwenanthakhin Mahathammata Raza

মুসলিম উপাধি গ্রহণকারী আঠার জন রাজার নাম তুলে ধরছি।

আরকানী/রাখাইং	রাজত্বকাল (খ্রিস্টাব্দ)	মুসলিম উপাধি
১) মাংচোমোয়েঙ	১৪৩০-১৪৩৪	সোলায়মান খান
২) মাং খারি	১৪৩৪-১৪৫১	আলী খা
৩) বাচো প্রু	১৪৫৯-১৪৮২	কলিমা শাহ্
৪) মাংডালা/ডক্যা	১৪৮২-১৪৯২	মোখু শাহ্
৫) বাচোঞা	১৪৯২-১৪৯৪	মহম্মদ শাহ্
৬) মাংরাইংঅং	১৪৯৪-	নুরী শাহ্
৭) চোলাংকাথু	-১৫০১	সকমল দৌলা
৮) মাংরাজা	১৫০১-১৫২৩	ইলি শাহ্
৯) কাজাপাডি	১৫২৩-১৫২৫	ইলিরাস শাহ্
১০) মাংচোউ	১৫২৫-	জলা শাহ্
১১) থাজাথা	-১৫৩১	আলী শাহ্
১২) মাংখং রাজা/মাংবাগ্রী	১৫৩১-১৫৫৩	জবৌক শাহ্
১৩) (অম্পপ্ট)	১৫৫৩-১৫৭১	(অম্পপ্ট)
১৪) মাংফালং	১৫৭১-১৫৯৩	সিকান্দার শাহ্
১৫) মাংরাজাগ্রী	১৫৯৩-১৬১২	সলিম শাহ্
১৬) মাংখামং	১৬১২-১৬২২	হোসেন শাহ্
১৭) থিরিথুদা মাহ্ (শ্রীসুদামা)	১৬২২-১৬৩৮	দ্বিতীয় সলিম শাহ্
১৮) নারাপতিগ্রী	১৬৩৮-১৬৪৫	(অম্পপ্ট)

ইতিহাস গবেষকগণ এই আঠারজন আরাকানী রাজাকে রাখাইং বৌদ্ধ রাজা হিসাবেই উল্লেখ করে থাকেন।

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য চর্চা :

আরকানী রাজারা বরাবরই সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। বর্মী ও আরাকানী উভয় ভাষারই সঙ্গীত ও নৃত্য আরাকানের রাজদরবারে বিভিন্ন উৎসবাদিতে প্রদর্শন করা হতো। সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানের রাজ দরবারে বহু মুসলিম চাকরী করেছিলেন। তাদের মধ্যে মাগন ঠাকুর দৌলত কাজী এবং মহাকবি আলাউল বাংলার সাহিত্য চর্চা করার জন্য এখনও বাংলাভাষীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরা সকলেই আরাকানের রাজা থিরিথুদাম্মা (শ্রী সুধর্ম) -এর অজস্র গুণগান গেয়েছেন।

কবি দৌলত কাজী তাঁর রচিত 'সতীময়না' কাব্যে থিরিথুদাম্মা (শ্রী সুধর্ম) সম্পর্কে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখেছেন —

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী।

রোসাংগ নগরী নাম স্বর্গ অবতারী।।

তাহাতে মগধ, বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।

নাম শ্রীসুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।।

উপরে লাইনগুলিতে লক্ষণীয় যে, আরাকানের রাজাকে মগধ - বংশীয় বলে গুণগান গাওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের শাসন দীর্ঘদিন ধরে মগধকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়েছিল। সেই মগধের সুরিয়া চন্দ্র (সূর্যচন্দ্র) নামক এক সামন্ত ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু বৌদ্ধ সৈন্য নিয়ে আদিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ আরাকান চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং সেখানকার রাজা হন। এই নবাগতরা তাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিয়ে এলেন। মগধ থেকে যারা গেলেন এবং স্থানীয় যারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তারা সবাই নিজেদেরকে মাগধী বলে পরিচয় দিতেন। আরাকানে রাজারাও সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা চিরকাল নিজেদের মগধ রাজবংশ উদ্ভূত ও ব্রাহ্মণ গোত্রীয় বলে দাবী করেছেন। আরকান ইতিহাসে দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানেরা এসেছিল তা নয়, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যক মানুষ আরাকানের রাজধানী স্রোহং (রোসাঙ্গ) নগরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সপ্তদশ শতকে স্রোহং -এ বসবাসকারী কবি আলাওলের কাব্যের ভূমিকায়ও তার বিবরণ দেখা যায়—

“নানা দেশীলোক নানা লোক,

শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ,

আইসন্ত নৃপ ছায়াতল,/আরবী, মিসরী, সামী, তুরকী,/হারসীং বাসি,/খোরা সানী, উজবেগী, সকল।।/লাহোরী, মুলতানী, সিদ্ধি,/কাশ্মিমরী, দক্ষিণী, হিন্দী,/কামরনপী, আর বঙ্গদেশী/অহপাই-খোটানচারী,/বর্ণালী, মলয়াবারী,/আটীকুচি কর্ণাটকবাসী।।/বহুশেখ সৈয়দ জাদা, মোগল/পাঠান যোদ্ধা,/রাজপুত হিন্দু নানা জাতি।/আভাই, বরমাং শ্যাম, ত্রিপুর,/কুকির নাম।/কতক কোহিমু ভাতিভাতি।/আরমানী, ওলন্দাজ, দিনমার,/ইংরেজ, কাস্তিলাল, আরফ্রান্সিস।/হিসপানী, আলমানী, ছোলদার,/নছরানী,/নানাজাতি আছে পুত্রকিস।।

হাইসাওয়াদী রাজ্যের পতনঃ

“সাইমাহ্ সামাইং, রাজওয়াং” নামক ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণ ও গোদাবরী নদী অঞ্চলের লোকেরা বার্মার (মায়ানমার) দক্ষিণ পূর্বাংশে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। এই অঞ্চলের লোকেরা বর্মীদের কাছে তলই, নামে পরিচিত এবং এদের রাজ্যের নাম ছিল ‘হাইসাওয়াদী’। পেগু ঐ রাজ্যের রাজধানী বা প্রধান নগর। “সাহমালা” এবং “ওয়ামালা” নামক দু’জন তলইং রাজপুত্র তাদের নেতৃত্বে আনুমানিক প্রায় ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে ঐ পেগু নগর গড়ে তুলেছিল। এই সময়কালে নৌ-যোগে এরাই সর্বপ্রথম ঐ মারমাজা বা ‘সাইমাচা’ নামক বর্ণমালা বার্মার দক্ষিণ পূর্বাংশে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। বর্তমানে হাইসাওয়াদী রাজ্য বার্মা অর্থাৎ মায়ানমার রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হাইসাওয়াদী রাজ্যের পরিসীমা ছিল — পূর্বে বর্মী রাজ্য, পশ্চিমে ধাইন্যাওয়াদী (ধন্যবতী) আরাকান রাজ্য, উত্তরে তংগু রাজ্য এবং দক্ষিণে মাতাবান উপসাগর। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে আরাকানী সৈন্যরা দক্ষিণ বার্মার তৎকালীন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজ্য পেগু জয়ের ব্যাপারে তংগু সৈন্যদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়। আরাকানের মহারাজা মাংরাজাগ্রী ও তংগু রাজ্যের গভর্নর রেং সী হা -এর মিলিত রন - পরিকল্পনা অনুসারে যৌথ সামরিক অভিযানের ফলে হাইসাওয়াদী

রাজ্যের পতন হয়। রণক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলে রেং সী হা, পশ্চিমাঞ্চলে মাংরাজগ্রী, উত্তরাঞ্চলে তংগুরাজপুত্র নাইস্যাংনঙ, দক্ষিণাঞ্চলের রণক্ষেত্রে মাংরাজগ্রী -এর পৌত্র মাংখমং সসৈন্যে সম্মিলিত আক্রমণ চালায়। প্রতিপক্ষ পেঙ রাজা নাইন্দা বরাঙ্‌ এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। Boves নামক এজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর একটি লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে মার্চ পেঙর পতন ঘটেছিল। পেঙর রাজার বিপুল ধনরত্ন ছিল। ৬০০ হাতি ও ৬০০টি ঘোড়ায় বহন করে এসব ধনরত্ন বিজয়ীরা তাদের রাজ্যে নিয়ে যায়- (Ancoarul Islam) দ্রঃ। বিজয়ী আরাকান মহারাজ মাংরাজগ্রী পেঙর ধৃত সুন্দরী রাজকুমারী খাইমা হনাং ওরফে সাইংডহ্মাং-কে বিয়ে করে পেঙর ধৃত নাবালক রাজপুত্র মং চংপ্যাই-কে সঙ্গে নিয়ে তথায় বাজেয়াপ্ত স্বর্ণ, রূপা ও একটি শ্বেতহস্তীসহ সসৈন্যে স্বদেশের রাজধানী শ্রাকউ শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে নিরুপায় পেঙবাসী প্রায় ৩, ০০০ পরিবার উদ্ধাস্ত হয়ে আরাকানে প্রবেশ করে। এইভাবে হাইসাওয়াদী রাজ্যের পগাইং রাজত্ব চিরতরে অবসান হয়। আরাকানে আগত পেঙবাসীরা দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তাই আরাকান রাজা তাদেরকে সৈনিকের কাজে নিয়োজিত করেন। বাংলাদেশে বসবাসকারী মারমা (মগ) ও ত্রিপুরায় বসবাসকারী মগেরা পেঙরাজ নাইন্দাবারাং -এর বংশধর বলে মনে করেন। এছাড়াও ‘রাজুওয়াং’ নামক প্রাচীন আরাকান ইতিহাসের পাতায় এই জনগোষ্ঠীকে হাইসাওয়াদী রাজ্যের রাজধানী পেঙরাজ নাইন্দাবারাং -এর বংশধর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদের অনেক প্রজাকুল হাইসাওয়াদী রাজ্য পতনের কারণে ধান্যাওয়াদী (ধান্যবতী) রাজ্যের ‘মাংরা’ এলাকায় সাময়িক বসবাস করেছিল বলে জানা যায়। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন চট্টগ্রাম অঞ্চল আরাকানী শাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমতাবস্থায় আরাকান রাজ মাংখমং (হোসেন শাহ) পেঙর বন্দী যুবরাজ মংচপ্যাই-কে আরাকানী গভর্নর হিসাবে চট্টগ্রামে নিযুক্ত করেন। যুবরাজ মংচপ্যাই-কে অনুসরণ করে পেঙর উদ্ধাস্ত পরিবারগুলি শ্রাকউ ত্যাগ করে আরাকানী চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মংচপ্যাই অতিসাহসিকতার সাথে পতুর্গীজদের আক্রমণকে প্রতিহত করে আরাকানী শাসনকে সুসংহত রাখতে চেষ্টা করেন। তাতে আরাকান রাজ খুশি হয়ে পেঙর যুবরাজ মংচপ্যাই-কে ‘বোমাং’ উপাধিতে ভূষিত করেন। বোমাং অর্থ মহা সেনাপতি বলা যায়। উপরিউক্ত তথ্যাদি আলোচনা করে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অতীতকালে বর্মী, আরাকানী, সাইমা বা মগ ইত্যাদি জনগোষ্ঠীরা পাশাপাশি তিনটি পৃথক রাজ্যে স্বাধীনভাবে বসবাস করেছিল। কালের অভিযাত্রায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে রাজ্যের সাথে অন্য রাজ্য বা জনগোষ্ঠীদের মধ্যে যুদ্ধ বিবাদ লেগেই থাকতো—পরাজিত রাজ্য ও জনগোষ্ঠীরা বিজয় প্রাপ্ত রাজার অধীনে চলে আসতো বা বসবাস করত। এমনিভাবে কখনো শাসন ও শোষণের জাঁতকলে পিষ্ট হয়ে, বহিঃশক্তি আক্রমণের কারসাজিতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে, মহামারীর প্রলয়ে, নিজেদের মধ্যে কলহ-বিবাদে, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে থাকার ফলে রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা বদলে গেছে, রাজ্যের শাসনকর্তা রাজার পরিবর্তন হয়েছে, রাজধানীও স্থানান্তরিত হয়েছে। এই পরিবর্তন হতে হতে মগ জাতিগোষ্ঠীরা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে, ভারতের মিজোরামে ও ত্রিপুরায় বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে বসবাস করছে। বার্মার রখইং প্রদেশে খিন প্রদেশে, রেঙ্গুন (ইয়াঙুন) শহরে বিভিন্ন এলাকায়ও মগ বা মারমা জনগোষ্ঠীর বংশধরদের বসতি রয়েছে বলে জানা যায়।

ত্রিপুরায় মগ জনগোষ্ঠীদের আদি ও বর্তমান বাসস্থান

ভারতবর্ষে শাসন দীর্ঘদিন মগধকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়েছিল। সেই মগধের চেন্দ্রাসুরিয়া (চন্দ্র সূর্য) নামক এক সামন্ত ১৪৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু, বৌদ্ধ সৈন্য নিয়ে আদিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশ আরাকান চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং সেখানকার রাজা হন। পূর্বে ওয়েশালী (বৈশালী) তাঁদের রাজধানীর নাম ছিল। সেই ওয়েশালীর (বৈশালী) স্মৃতি রক্ষা করার তাগিদে নতুন রাজ্যের রাজধানীর নাম রাখা হয় ওয়েশালী (বৈশালী)। এই নবাগতরা তাদের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিয়ে এলেন। প্রচলিত মৌখিক ধারণাও এই যে, যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের ঐ প্রাচীন কেন্দ্রে হিন্দু ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় তখন মগধ রাজ পরিবারের একটা শাখা আরাকানে পাড়ি দেয় এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে।

আরাকানে প্রাপ্ত মগ ভাষায় লেখা ‘পাদম্ভা দেওয়ী’ (দেবী) নামক প্রাচীন গ্রন্থে (পৃঃ ৯) উল্লেখ করা আছে যে, সুরিয়া চেন্দ্রা (সূর্য চন্দ্র) বাল্যকালের নাম মাংবাগ্রী মগান্দ - ৮৯৩ সনে বীরত্বের সঙ্গে রাজত্ব করে গেছেন। সেই সময়ে ধাঞাওয়াদী (ধান্যবতী), রম্যাওয়াদী (রম্যবতী), মেঘাওয়াদী (মেঘবতী), দ্বারওয়াদী (দ্বারবতী), ওয়ঙ্গ (বঙ্গ), আসাম, মণিপুরা (মণিপুর) পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বা রাজত্ব ছিল।

চাইন্দামালা মহাথেরোর লেখা (মগ ভাষায়) “জেমুদীপা ইন্ডিয়া নিপোং ক্যাইং” নামক প্রাচীন গ্রন্থে (পৃঃ ৩০৩) উল্লেখ আছে যে — রাখাইনপ্রে (আরাকান দেশ) চট্টগ্রাম ভগীরথ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অপরদিকে বঙ্গ (কলিকাতা বন্দর), পশ্চিমে কুমিল্লা নগর, রংফ্রো (রংপুর) বিলাক নগর, কাইংসা (কর্ণফুলী নদী - ইত্যাদি আরাকান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরাকান বা মগ ভাষায় লেখার সময় ‘প’ কে ‘ব’ উচ্চারণ করে থাকে। তাই সম্ভবত, পিলাক -কে বিলাক নগর লেখা হয়েছে। এতে অনুমান করা যায় যে - দক্ষিণ ত্রিপুরার অন্তর্গত ‘পিলাক’ প্রাচীনকালে বিলাক নগর নামেই খ্যাত এবং তা আরাকান রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আরাকানে অবস্থিত ‘আনন্দচন্দ্র ক্যউ চাঃ (আনন্দ চন্দ্র শিলালিপি)তে পিলাক সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। আরাকানের যুবরাজা মাংবাগ্রী (সূর্য চন্দ্র) মোগল ও পুর্তগীজদের সাথে যুদ্ধ করে জয় লাভ করার পর ফিরে এসে বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ শ্রাউ শহরে ‘রেঅংজীয়াঃ সীংদংগ্রীঃ’ নামে বুদ্ধ মঠ নির্মাণ করেছিলেন (১৫৩৬ খ্রিঃ)। বৌদ্ধ মঠের প্রথম দরজায় বামপার্শ্বে ১১ ফুট উঁচু চার কোণাবিশিষ্ট একটি প্রাচীন স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভের তিন দিকে খোদিত শিলালিপি

আছে। এই শিলালিপিকে আনন্দ চন্দ্র শিলালিপি বলা হয়। মগ ভাষায় যার নাম “আনন্দ চাইন্দ্রা ক্যউঃ চাঃ”। এই শিলালিপি সমেত স্তম্ভটি, পাশে সুরক্ষিত অপর একটি স্তম্ভের চেয়ে অনেক প্রাচীন। সম্ভবত, আরাকান রাজা মাংবাগ্রী ওয়িশালী (বৈশালী) শহর থেকে স্রোহং শহরে এই প্রাচীন স্তম্ভটি নিয়ে আসেন।

এই স্তম্ভের পূর্ব পশ্চিম উত্তর তিনদিকে খোদিত লেখা আছে। এই লিপি ভারতের উত্তরদিকে ব্যবহৃত দেবনাগরী অক্ষরে লেখা। দেবনাগরী অক্ষর হলেও তিন দিকে তিন রকমের আলাদা আলাদাভাবে লেখা আছে। এক দিকে লেখার অক্ষরের সাথে অন্যদিকের লেখার মিল নেই। ঐতিহাসিকদের মতে সেকালে আরাকান রাজ্যের ঐ অক্ষরের লেখা ব্যবহার করা হতো। স্তম্ভের পূর্ব ও উত্তর দিকের লেখাগুলি অনেক পুরান রীতিতে লেখা। তবে স্তম্ভের পশ্চিম দিকের লেখাগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এই লিপিটি রাজা আনাইন্দ্রা চাইন্দ্রা (আনন্দ চন্দ্র) ৭২৯ খ্রিঃ লিখিয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন। আরাকানে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের ইতিহাস এই শিলালিপিতে উল্লেখ করা আছে। এই লিপিতে ৫৭ নং স্তবকের দুটি লাইন তুলে ধরছি।

পিলাক্ক ব (দকু) হুপি

দৌমঘে পূর্ব নামকো।

বীথিকা বিবিধারা ম (১ঃ)

কারিতা সেতু সংক্রমা।।

আনন্দচন্দ্র শিলালিপিতে এটাই উল্লেখ আছে যে, পূর্বে নামছিল দৌমঘে (দমঘাট) পরে পরিবর্তন করে পিলাক্ক বদনাম রাখা হয়। অর্থাৎ পিলাক্ক বঁদের পূর্বের নাম ছিল দমঘে বা দমঘাট। হয়তো প্রাচীন কালে পিলাকে বড় ধরনের বাঁধ নির্মাণ করে রাখা হয়েছিল। যাতে পিলাক্ক নগর সুরক্ষিত থাকে। উচ্চারণ ভেদে সেই বাঁধ কে বঁদ বলা হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হলো সেই পিলাকে বিভিন্ন ধরনের মন্দির, সেতু, রাস্তাঘাট, সংক্রমণ গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। ৪৭ নং স্তবকে উল্লেখ করা আছে যে, রাজা আনন্দ চন্দ্র (পিলাকে) স্বর্ণ, রূপা ও পাথর দিয়ে বহু বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন।

বুদ্ধের ধাতু দিয়ে প্রচুর চৈত্যবাস্তুপ নির্মাণ করেছিলেন। ‘চুন্দা মিথী’ নামক বুদ্ধ সন্ন্যাসীর মূর্তিও তিনি তৈরি করান। ৪৮ নং থেকে ৫৭ নং স্তবকে উল্লেখ করা হয়েছে বা লেখা আছে, তাঁর নির্মিত কাঁস পিতল ও তামার মূর্তিগুলি অতি বিস্ময়কর। তিনি গাছ, পোড়ামাটি ও পাথর দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধ ও দেব-দেবীর অগনিত মূর্তি তৈরি করে গেছেন। এছাড়া তিনি বহু পুঁথি পুস্তকও লিখে গেছেন। এই রাজা অতি দানশীল ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁকে দানশীল কর্ণের সঙ্গে প্রজারা তুলনা করতো। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে মন্দির, বাসস্থান ও শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন।

রাজা আনন্দ চন্দ্র হিন্দু ব্রাহ্মণদের থাকা খাওয়ার জন্য জমি, গরু, মহিষ, দাসদাসী ইত্যাদি দিয়ে গেছেন। তাঁদের জন্য বাদ্য যন্ত্র, দ্রব্যসামগ্রীসহ চারটি হিন্দু মন্দির স্থাপন করে গেছেন।

৫৫) পঞ্চাশ দ্বারান্না বংশ

কেশত্র ভূত্য সমন্বিতম্।

३० यथाकृताप्रत्यक्षं लब्धं धेवेषु । यदनुसूयते च ह्येताः कालाश्च । ३१
 ३१ कृतं सगुणं विराजते देवैः कथं भाष्यते । संप्रयुक्तं भाषितं । ३२
 ३२ पूर्वनाडगतवाच्यं भाष्यं च देवैर्कृतं । ३३
 ३३ मन्त्रोक्तं च देवैर्कृतं । ३४
 ३४ कुप्यानि गच्छन्तं । ३५
 ३५ नायभागतानं । ३६
 ३६ कृतापि यद्वैदं । ३७
 ३७ पितृयं यद्वैदं । ३८
 ३८ तेषां यद्वैदं । ३९
 ३९ भूनिना योयितायताः । ४०
 ४० न दशमहायता । ४१
 ४१ न दशमहायता । ४२
 ४२ तेषां यद्वैदं । ४३

त्रिलोक सम्प्रर्कित आनन्दचन्द्र त्रिलालिपिर् एकटि अर्थ

বাদ্য বাদক সংযুক্তং
কারিতং মঠ চতুষ্ঠায়ম্ ।।
(৫৭) সমতীর্থ' দ্বিজাবাসে
মঠশ্চানন্দ মাধবঃ ।
আনন্দে স্বর নামাপি
নৌলক্কে চ মঠ স্মৃতঃ ।।

তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণদের থাকার জন্য 'সমতীর্থ' নামক জায়গায় "আনন্দ মাধব" নৌলাকা বা নৌল নামক জায়গায় "আনন্দে স্বর" নামে মন্দির স্থাপন করে গেছেন। "আনন্দচন্দ্র কাউড়াঃ" নামক গ্রন্থটি পুস্তক আকারে ছাপানো হলে তখন পাঠকবৃন্দ বিস্তারিত ভাবে জানতে পারবেন।

এতে আশা করি পিলাক ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে একটা নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। তবে এইসব শিলালিপি থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, পিলাকের প্রাচীন সভ্যতা আরাকানে রাজা আনন্দচন্দ্রই গড়ে তুলেছিলেন। তাছাড়া পিলাকে প্রাপ্ত রৌপ্য মুদ্রাগুলিতে আনন্দচন্দ্র উৎসর্গীকৃত পিলাক বঁদ কথটি লেখা রয়েছে। পিলাক থেকে পীরক দেবগিরী নামাঙ্কিত মুদ্রাও পাওয়া যায়। পীঃ হলো একটি গাছের নাম রোওক থেকে করা হয়েছে রক। এই 'রক' শব্দের অর্থ হলো পাতা "পীরক" মগ ভাষার শব্দ। পীঃ নামক গাছের পাতাকে মগ ভাষায় বলা হয় পীরক। পীরক নামক পাতায় মগ আদিবাসীদের প্রাচীন কালে তাদের ইতিহাস বা কাহিনী লেখা হতো। মগ পণ্ডিতেরা বলেন প্রাচীন কালে ঐ অঞ্চলে প্রচুর পীঃ গাছের বনে আবৃত ছিল। সেই পীঃবনে ঘেরা অঞ্চলটির নাম হয়েছে পিলাক। তাছাড়া আনন্দচন্দ্র শিলালিপিতে উল্লেখ করা আছে যে, পিলাক বদের পূর্ব নাম ছিল দমঘে বা দমঘাট। পিলাক বঁদ শব্দ থেকে বাঁধ শব্দটি আসতে পারে। পিলাক শব্দটিকে আরাকানীরা কোন কোন গ্রন্থে 'বিলাক নগর' লিখেছেন। তারা অনেক ক্ষেত্রে 'প' কে 'ব', এবং 'ধ' কে 'দ', 'স' কে 'থ' ইত্যাদি উচ্চারণ করে এবং বই পুস্তকেও এইভাবে লিখে থাকেন। যাই হোক 'দমঘাট' শব্দের সঙ্গে পিলাক বাঁধ শব্দটি উভয় নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত শব্দ। তা হলে অনুমান করা যায় যে পিলাকের কাছাকাছি বিশাল অঞ্চল জুড়ে জলে পরিপূর্ণ ছিল এবং পূর্বে নৌকা-ফেরী করা বা পারাপারের জন্য সেখানে 'ঘাট' ছিল। যার নাম দমঘে বা দমঘাট। পরবর্তী সময়ে সেখানে বিশাল আকারে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। যার নাম হয়েছে পিলাক বঁদ বা বাঁধ।

মগ আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কাপিয়া বা কবিগানে এ সম্পর্কে গান চালু আছে। কোন এক যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত জেনে শত্রুপক্ষ অথবা নিজেরাই বাঁধটিকে ভেঙ্গে দেওয়া দিয়েছিল। এইভাবে যুদ্ধ অথবা ভৌগোলিক পরিবর্তনের কারণে পিলাকের এই নগর সভ্যতা জলের তলে ডুবে যায়। সম্প্রতি পশ্চিম ত্রিপুরায় সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত বক্সনগরে প্রাচীন বৌদ্ধ প্রাচীন টিবির পুরাতাত্ত্বিক খনন কার্যের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে বক্সনগরে ইটের নির্মিত ত্রিখ স্তূপের ভিত্তি যেটি ক্রমান্বয়ে গোলাকৃতি হয়ে স্তূপের রূপ ধারণ করেছে। (প্যাগোডা) স্তূপছাড়াও ইষ্টক নির্মিত চৈত্যগৃহের ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সিলমোহর, বৌদ্ধমূর্তি ও রূপার মুদ্রা উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, ত্রিপুরায় 'মগ' জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি

এবং ধর্ম ও সংস্কৃতিতে তার প্রভাব কোন নতুন ঘটনা নয়। প্রাপ্ত তথ্যাদির আলোকে আরও বলা যায় যে, মগ জাতির সঙ্গে পিলাক ও বক্সনগরের সংস্কৃতি গভীর ভাবে জড়িত। সারা ভারত থেকে যখন বৌদ্ধ ধর্ম অবলুপ্ত তখনই এই পার্বত্য রাজ্যটিতে টিকে ছিল তথাগত নির্দেশিত স্তর ভিত্তিক ব্যবস্থা। চীনা পরিব্রাজক সেঙ চীর ভ্রমণ কাহিনিতেও এর উল্লেখ আছে। আর সে কারণেই ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা যখন ক্রমশ হ্রাসমান তখন এই পিলাক ও সম্মিহিত অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটা গরিষ্ঠ অংশ বহুকাল ধরে বাস করেছেন ও বৌদ্ধ ধর্মের চর্চা করে চলেছেন। রাজমালায় ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৬২ এবং এছাড়াও অনেক পুরোনো রাজমালায় মগ জাতির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এতে অনুমান করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে ময়নামতিতে, পিলাকে ও বক্সনগরে আবিস্কৃত মন্দিরের ধংসাবশেষগুলি আরাকানের চন্দ্র বংশীয় রাজারাই তৈরী করেছিলেন।

আরাকানী ঘটনাপঞ্জীর উৎস অনুযায়ী, রাজা চুলাচেন্দ্রার মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান মহিষী সাইন্দা দেবী অনুচর সমেত প্রধানমন্ত্রী ধেম্মাজেয়া (ধর্মজয়)কে কোলাডেং নদীর উত্তর দিকে তাড়িয়ে দেন। অনুচরদের নিয়ে ধেম্মাজেয়া অসংখ্য নদনদী এবং পর্বত শ্রেণী অতিক্রম করলেন। পরে তাঁরা ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে পৌঁছলেন এবং প্রাণ বাঁচার জন্য তাঁরা সেখানে বসতি স্থাপন করলেন। “আরাকান ইতিহাস রাজওয়ং গ্রন্থে ত্রিপুরাকে খুরুতং লেখা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক কর্নেল ফেয়ার খুরুতংকে সুবর্ণগ্রাম নির্মাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।” “রাজমালা” ২য় ভাগ ৪র্থ অঃ ১১ “খুরু” শব্দটির অর্থ হলো — লম্বা আকৃতির এক জাতীয় শামুক আয়তন, আর তং শব্দটির অর্থ হলো পর্বতশ্রেণী। অর্থাৎ খুরুতং শব্দটির পুরোপুরি অর্থ হলো শামুক আকৃতি পাহাড়। এই শব্দটি মগ ভাষার শব্দ। আরাকান ইতিহাসিকের মতে খুরুতংকে ধেম্মাজেয়া (ধর্মজয়) ত্রিপুরা নাম রেখেছিল। ধেম্মাজেয়া মণিপুর, আসাম ও খুরুতং এই তিনটি রাজ্যকে নিয়েই রাজত্ব করেছিলেন। পালি ভাষায় ‘ত্রি’ শব্দের অর্থ হলো তিন, আর পুরা শব্দের অর্থ হলো দেশ। এই তিনটি দেশকে মিলিতভাবে তিনি ত্রিপুরা নাম রেখেছিলেন। সেই খুরুতং ত্রিপুরা নামে পরিচিত হয়। আসামদিখা ও মণিদিখা নামে ধেম্মাজয়ের দুই ছেলে ছিল। আসাম ও মণিপুর এই দুই, রাজ্যকে দুই ছেলের উপর শাসন করার ভার দিয়েছিলেন। এই দুটি রাজ্যের নাম তাদের নামানুসারে রাখা হয় আসাম ও মণিপুর।

ধেম্মাজেয়া তাঁর অনুচরদের নিয়ে ত্রিপুরাতে বসতি স্থাপন করেন প্রায় ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। তাঁর অনুচরদের মধ্যে প্রায় পাঁচশ জন ত্রিপুরা পর্যন্ত অনুসরণ করেনি — আসার পথে কিছুটা দক্ষিণে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। এই লোকেরা ভারতের মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা রাজ্যে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে আছে। গঙ্গা বদ্বীপে যারা বাস করে তাদের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার আর যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে তারা প্রায় ৪,২০০ বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে আছে। এই লোকদের প্রথম দল দশম শতাব্দীতে সেখানে বসতি স্থাপন করে। ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশে পাওয়া চন্দ্রদেব ময়নামতী তাম্রপত্র লিপিবদ্ধ আরাকানী ইতিহাসের বিবরণকে সমর্থন করে। প্রাচীন কালে সমগ্র উপকূল এম্নকি সুদূর চট্টগ্রাম এবং ঢাকা ব্যাপী এলাকা আরাকানী রাজাদের দখলে ছিল। মগ ভাষায়

চইতে-গং থেকে রূপান্তর হয়ে যেমন বাংলায় চট্টগ্রাম নামকরণ করা হয়েছে। ঠিক, তেমনি ‘দা আত্মা’ নামক অঞ্চলকে বাংলায় বলা হয়েছে ঢাকা। ‘দা’ শব্দের অর্থ দাকং বা তলোয়ার, আত্মা শব্দের অর্থ হলো সীমানা আলাদা করে দেওয়া। আরাকান রাজা একসময় যুদ্ধে জয়ী হবার পর যেখানে দা বসিয়ে সীমানা আলাদা করে দেখানো হয়েছে যে এর বেশি যুদ্ধে এগিয়ে যাব না। ঠিক এই জায়গাটির নাম হল দা আত্মা বা দাখা। দাখা থেকে পরবর্তী সময়ে ঢাকা নামে পরিচিতি লাভ করল। এক দিকে বাংলা ও পারস্য লিপি এবং অন্য দিকে আরাকানী লিপিতে লেখা পূর্বোল্লিখিত শহরগুলির রাজ প্রতিনিধিদের দ্বারা ছাঁচানো মুদ্রা আজও বিদ্যমান। ১৯৪৪ সালে কুমিল্লা জেলার (বাংলাদেশে) ময়নামতীতে তিনটি চন্দ্র রাজাদের তাম্রপত্র পাওয়া যায়।

খননকালে ময়নামতীতে আরাকানের চন্দ্রা রাজবংশের মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রা এবং আরাকানী পুরুষ এবং মহিলাদের প্রতিমূর্তিযুক্ত পোড়ামাটির ফলক পাত্রাদি পাওয়া গিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বিরাট একটা অংশ বাংলাদেশেও বাকীরা আরাকানে ফিরে যায়।

পূর্ববঙ্গে পুনরায় আরাকানী বসতি স্থাপন :

সংখ্যাগত এবং সংস্কৃতিগত উভয়ভাবে মগেরা এখানে দশম শতাব্দীর অনেক আগেই আসে এবং ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করে। পরে তারা বাংলার বিভিন্ন অংশ জুড়ে ব-দ্বীপ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এটাই ছিল পূর্ববঙ্গে মগদের প্রথম বসতি স্থাপন। ঐ সময় চট্টগ্রাম বসবাসকারী মগরা ব্যাপকভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাঙ্গালী মহিলাদের সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হয়। পুরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা ‘ত্রিপুরার রাজমালা’ পৃঃ ৪১, উল্লেখ আছে যে —

রাজ্যমাটি জিনি খ্যাতি যুঝারে আপন (রাজ্যমাটি জয় করে স্বয়ং ‘যুঝার’ অর্থাৎ যোদ্ধা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন)।

রাজ্যমাটি দেশতে যে লিকা রাজা ছিল। সহস্র দশেক সৈন্য তাহার আছিল। ধামাই জাতি পুরোহিত আছিল তাহার। অভ্যক্ষ্যনাথ্যে তারা সুভক্ষ্য ব্যভার। বৎসরে বৎসরে তারা নদী পূজা করে। স্রোত যে স্তম্ভিয়া রাখে গোমতী নদীরে।

স্রোত বন্ধ রাখে তারা পূজা যতক্ষণ।

পূজা সাঙ্গে পুনর্বীর স্রোতের বহন।।

ধর্মেতে নিপুন তারা নামে লিকা জাতি।

রাজ্যমাটি পূর্বস্থান তাহার বসতি।।

ধাবইং থেকে ধামাই শব্দের অর্থ দা বা তলোয়ার ধারণকারী। (পৃঃ - ৪২)

(লিকাজাতি মগ জাতির শ্রেণী বিশেষ) স্তম্ভিয়া রাখে গোমতী নদীরে : কথিত আছে প্রাচীনকালে নদীর পূজা করবার সময় মন্ত্র প্রভাবে নদীর স্রোত স্তম্ভিত হত বা থেমে যেত।

মগজাতির প্রাচীন কাল থেকে বছরে একবার হলেও মিলিতভাবে খুব ঘটা করে নদী পূজা করত। এই নদী পূজার প্রচলন কীভাবে হল এই বিষয় নিয়ে মগ জনগোষ্ঠীদের একটি লোক কাহিনি আছে। প্রাচীন আরাকানে “দোওয়াই তফং” নামে এক বিখ্যাত তান্ত্রিক রাজা ছিলেন। তিনি অত্যধিক ক্ষমতাবান ছিলেন। জন মানব প্রজা ছাড়াও দেব-দেবী সমস্ত ভূতপ্রেত পিশাচ

ইত্যাদি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে চলত এবং তাদের তিনি লালন পালন করতেন। তারাও রাজার বশ্যতা স্বীকার করে মেনে চলত। যত বড় খরশ্রোতা নদী হোক না কেন ‘দোওয়াই ফং’ যেকোন সময় নদীর স্রোতকে থেমে যাওয়ার জন্য আদেশ করলে বিনা বাঁধে নদী স্তম্ভিত হয়ে যেত। একদিন সেই রাজা ও রানী তার অমাত্যদের নিয়ে নদী পথে অন্যত্র যাত্রা করছিলেন। সেই নদীতে গোলামুখা তোওয়াং নামে ভয়ানক অনেক নীচু খাদ ছিল। যেখানে পড়লে কেউ জীবিত ফিরতে পারে না। নিশ্চিত ভাবে ঐ খাদে পৌঁছার এক মাইল উপর থেকে নদীর স্রোত তীব্র বেগে ছুটত। নদীর এইরূপ স্রোতের অবস্থা দেখে রাজার অমাত্যগণ বুঝতে পারল যে তাঁরা “গোলামুখা তোওয়াং” নামক খাদের কাছাকাছি এসে গেছে। নৌকাটাকে কোন মতে ফেরানো যাচ্ছে না। সবাই জানেন এক মাত্র দোওয়াই তফং রাজাই এই নদীর স্রোতকে থামাতে পারবেন। কিন্তু রাজা তখন গভীর ঘুমে আছেন। রাজাকে সবাই ভীষণ ভয় করতেন। রাজা ঘুমালে কেউ কোন দিন কখনও জাগাতে সাহস পেতেন না। সম্মুখে মহাবিপদ, এখন রাজা ঘুম থেকে উঠে নদীর স্রোতকে না থামালে নৌকা সমেত সকল মানুষ এই গোলামুখা খাদে পড়ে মারা যাবে। রাজাকে ঘুম ভাঙাবে কে এই নিয়ে নৌকার মধ্যে সোরগোল বেঁধে গেল। কেউই রাজার কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত সবাই রাজার ঘুম ভাঙবার জন্য রানীর উপর দায়িত্ব দিল। রানী পরলেন বিপাকে। পতিব্রতা রানী রাজাকে যেমন ভয় করতেন, ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন ঠিক প্রজাদেরকেও তদ্রূপ ভালবাসতেন। তখন অমাত্যগণ রাজা ও সবার জীবন রক্ষার জন্য ছোট রানীকে বাধ্য করিয়ে রাজাকে জাগাতে হলো। রানী তাঁর মাথার চুলকে রাজার পায়ে সাতপাকে বেঁধে নমস্কার করে, কপাল ঠুকিয়ে রাজাকে ঘুম থেকে জাগালেন। রাজা ঘুম থেকে উঠে ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তলোয়ার দিয়ে রানীকে কেটে নদীতে ফেলে দিলেন। অমাত্যগণ সবাই রাজার ঘুম ভাঙবার কারণ বর্ণনা করে বলল এবং স্রোত বন্ধ করে বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য অনুরোধ করল। রাজা তাঁর তরবারি নদীতে রেখে বললেন যে স্রোত থেমে যাও। নদীর স্রোত থেমে গেল, রানী ছাড়া সবাই প্রাণে বাঁচল। রানীর গলা কাটা যাবার পরও নৌকার পিছে পিছে ছুটছে এবং কাতর মিনতি করছে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য। রাজা বললেন— ‘মায়ো’ অর্থাৎ ফিরে নেব না। রাজা বলেছেন যে, তুমি এই নদীতে থেকে যাবে। অন্যের প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন করেছে। এই নদীপথে যারা যাতায়াত করবে সবাই তোমাকে পূজা করবে। এই পূজা নিয়েই সম্ভ্রান্ত হয়ে থাক। সেই দিন থেকে আরাকানের এই বিখ্যাত নদীর নাম হয় ‘মায়ো’ ‘স্র’ (মায়ো নদী) রানী মরবার সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মৃত্যুর সময় তার দুটি সন্তান জন্ম হয়। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। মেয়েটির নাম রিপাইনজাং আর ছেলেটির নাম রে অংজাইন। রানী ‘মায়ো’ নাইমা - অর্থাৎ মায়ো দেবী নামে পরিচিতি লাভ করেন। তখন থেকেই আরাকানীরা নদীর ধারে তাঁর মূর্তি তৈরি করে পূজা করত। পিলাক থেকে চার কিলোমিটার দূরে কলসীতে সুজাউ চৌধুরী বুদ্ধমন্দিরের পিছনে মুহুরী নদীর কিনারায় মাটি খনন করে এই ধরনের একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। গ্রামের মানুষ এখনও সেই মূর্তিকে পূজা করে থাকেন।

আমার মাতামহ (দাদু) শ্রীযুক্ত সুজেইউ চৌধুরীর আমলে কলসীতে মুহুরী নদীতে

সম্মিলিতভাবে দক্ষ পুরোহিত বা বৈদ্য দ্বারা মহা সমারোহে ঘটা করে নদী পূজা করতেন। শুনা যায় এই দক্ষ বৈদ্যরা মন্ত্র বলে নদীর স্রোতকে থামিয়ে দিতে পারতেন।

আরাকানে উল্লিখিত লোক কাহিনি ও রাঙ্গামাটিতে গোমতী নদীর পূজার ঘটনা দুটির মধ্যে প্রায় মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এতে অনুমান করা যায় যে, গোমতী নদীর ধারে ছবি মুড়ার পাহাড়ে মূর্তিগুলি মগ রাজারাই খোদাই করেছিলেন। এইখানে তারা ঘটা করে নদী পূজা করত। মগধ থেকে আরাকানে আগত সামন্তরা যেমন তাদের প্রাচীন রাজধানীর নামানুসারে আরাকানের রাজধানীর নাম রাখেন ওয়িশালী (বৈশালী)। ঠিক তদ্রূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটির নামানুসারে দক্ষিণ ত্রিপুরার রাজধানীর নাম রাখা হয় রাঙ্গামাটি। মগেরা দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরাতে রাজত্ব করে গেছেন। রাজমালায় ও বিভিন্ন ইতিহাসে তার প্রমাণ মিলে। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরী গ্রন্থে স্থানান্তরে লিখেছেন— “চট্টগ্রাম বন্দর মগ রাজার অধিকারভুক্ত।” রাজমালা ২য় ভাঃ ৪র্থ অঃ—। ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে আরাকান পতি মাংফালং পর্তুগীজ দিগের সাহায্যে যে চট্টগ্রাম পর্যন্ত অধিকার করে নিরস্ত হয়েছিলেন তা নয়, তিনি সমগ্র ত্রিপুরা লুণ্ঠন করে মেঘনার তীরে স্থায়ী বৈজয়ন্তী উদ্ভীন করেন। (৬৫-২য় ভাঃ ৫ম অঃ)।

ঐতিহাসিকদের মতে রাঙ্গামাটিতে লিক বা নিক নামের রাজা হচ্ছে মগ জাতি। ব্রহ্মদেশীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা চট্টগ্রাম থেকে আরও ভেতরে প্রবেশ করে ত্রিপুরায় রাজত্ব স্থাপন করে। তাদের পুরানো জায়গার নামানুসারে রাজধানীর নাম রাখা হয় রাঙ্গামাটি। পরবর্তী সময়ে বহিরাগত জুব্বারফা লিকদের হারিয়ে এই রাঙ্গামাটি অধিকার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন “জুব্বার প্রসিদ্ধ কীর্তি রাঙামাটি জয়।” রাঙ্গামাটি তখন প্রবল পরাক্রান্ত মগদের দ্বারা অধিকৃত। প্রাচীন ভূগোল আলোচনা করলে বোঝা যায় যে রাঙ্গামাটি বলতে তখন ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের পশ্চিমাংশ বোঝাত। তবে, উত্তর আরাকানে লিকপাড়া অবস্থিত ত্রিপুরার লিক বা নিকদের সঙ্গে আরাকানের বাসিন্দাদের সংযোগই দৃষ্ট করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে লিক বা মগদের একটা অংশ পুরানো রাঙ্গামাটিতে ফিরে যায়। তারা সেখানে মিলিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বাকি অংশ ত্রিপুরাতেই থেকে যায়। ঘুরেফিরে পুরানো রাঙ্গামাটিতে আবার ফিরে এসেছে বলে মগ জাতিদের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে একটি প্রবাদ প্রচলন হয়ে আসছে— “আচ্চোওয়ে রাঙ্গোওয়াঃ হৌং”, আচ্চোঃ শব্দের অর্থ হলো সম্মিলিত হওয়া। ‘রাঙ্গোওয়া’ শব্দের অর্থ হলো — রাঙ্গামাটি, হৌং শব্দের অর্থ— পুরাতন বা পুরান জায়গা। অর্থাৎ পুরাতন রাঙ্গামাটিতে পুনরায় মিলিত হওয়াকেই বোঝায়।

জুব্বারফা মগদেশ জয় করে রাঙামাটি অঞ্চলে রাজপাট স্থাপন করেন। মগদের উপর প্রভাব বিস্তার করার ফলে ত্রিপুরার মহারাজারা নিজেদের নামের সঙ্গে “ফা” উপাধি যুক্ত করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মগ ভাষায় ‘ফা’ হচ্ছে প্রভু বাচক শব্দ। ‘ফা’ শব্দের অর্থ হলো পিতা। যেমন—

ছেংথোমফা, আচংগফা, ক্ষিচংফা ডুঙ্গুরফা ইত্যাদি নামে ত্রিপুরার রাজারা ছিলেন।

জুয়ারফার কাছে পরাজিত হয়ে মগরা আরাকানে ও চট্টগ্রামে ফিরে গেলেও রাঙামাটি বা ত্রিপুরার প্রতি টান বা আকর্ষণ তাদের মনের গভীরে রয়েই গেছে। তাঁদের প্রিয় রাজ্যের কথা তারা কোন দিন ভুলতে পারেনি। তাই বারে বারে মগ রাজাদের সাথে ত্রিপুরার রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ প্রায়ই লেগে থাকত। কখনো আরাকানরা জয় লাভ করেছে, আবার কখনও ত্রিপুরার রাজা জয় লাভ করেছে। ১৫২৩ খ্রিঃ দেব মাণিক্য আরাকান রাজা কাজাবদি (ওরফে ইলিয়াস শাহ্)কে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করে নেন।

পুরুজন প্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা - ‘ত্রিপুরার রাজমালা’য় (পৃঃ - ৫০) উল্লেখ করা আছে যে, আরাকান রাজ মাংফলং ওরফে সিকান্দার শাহ্ রত্নখচিত একটি গজদন্ত নির্মিত রাজমুকুট দূত মারফতে ত্রিপুরার শিবিরে পাঠিয়েছিলেন একটি সন্ধির প্রস্তাব সহ। ত্রিপুরেশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করে উপহার স্বরূপ এই রাজ মুকুটটি পাঠানো হয়েছে বলে সন্ধির প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। রাজ মুকুটটি দেখা মাত্র, অমর দুর্লভ ও যুবক নারায়ণ (যুধাসিং) মুকুটের অধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু করেছিলেন। রেভারেন্ড জের্মস্ লঙ এই সম্পর্কে লিখেছেন :-

On this the king of Mugs wished to make peace and send the brothers a crown of ivory as a present, a dispute arose among them as to who should possess it and one who lost it abused the Mugs (Journal of Asiatic Society of Bengal, Vol-XIX)

মুকুট নিয়ে বিরোধের এই ঘটনাকে অবলম্বন করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘মুকুট’ নামক নাটকটি রচনা করেছিলেন।

আরাকান রাজ মাংফলং (সিকান্দার শাহ্) ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার তদানীন্তন রাজধানী উদয়পুর পুনরায় দখল করে নেন। পরে অবশ্য উদয়পুর ত্যাগ করে আরাকানে ফিরে যান। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে যশোদর মাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করার পর প্রথমেই মগ রাজাদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ত্রিপুরার রাজ্যবাসীর মগভীতি তখন কিছুটা দূরীভূত হল।

আরাকান রাজাদের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজাদের যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকলেও ত্রিপুরার মহারাজার এই দুর্দিনে আরাকান রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন না করে তাঁকে সসম্মানে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন। গোবিন্দ মাণিক্য দীর্ঘ দিন নিরাপদে আরাকান রাজ্যে বাস করেছিলেন। এই কথা “ত্রিপুরার রাজমালাতে”ও উল্লেখ করা আছে।

দ্বিতীয় বসতি স্থাপন :

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দিকে এলাকাটি মুঘলদের দ্বারা অধিকৃত হয় এবং মুঘল ও মগদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়। ১৬৬৬ খ্রিঃ চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম মুঘলদের শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়। চট্টগ্রামে মুঘল শাসন ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। তারপর অঞ্চলটি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে যায়। কৈলাস চন্দ্র সিংহের রাজমালায় লেখা আছে যে, “১৭৭৬ খ্রিঃ পর্বতবাসী চাকমা সরদার শ্রী দৌলত খাঁ এবং রামখাওন নামক মগ সরদার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন, তাহাদের দমনের জন্য একটি যুদ্ধ যাত্রার প্রয়োজন হইয়াছিল।

(৩য় ভাঃ ৪র্থ অঃ)।”

পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসকগণ চিটাগাং হিলট্রাস্ট ম্যানুয়েল প্রণয়নের মাধ্যমে সাক্‌থং, বোমাথং, পেলেংথং অর্থাৎ চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল, পেলেং সার্কেল গঠন করে স্বায়ত্তশাসন প্রথা অনুমোদন করে। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা এই তিনটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এখানে ‘থং’ শব্দের অর্থ হলো হাজার সংখ্যায় গ্রাম এবং শহর গড়ে ওঠা। মগদের মধ্যে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে বোমাথং এবং পেলেংথং নামে দুটি অঞ্চল নিয়ে পৃথকভাবে বসবাস করে।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কংহুয়াফু তাদের মুখ্য কেন্দ্র হিসাবে রোওয়াডং অথবা বান্দরবন পত্তন করেন। বোমাগ্রী উপাধি নিয়ে কংহুয়াফু তখন থেকেই বান্দরবন অঞ্চল শাসন করতেন। খ্যাংসাং রেগ্রেসা, রাইংব্রেসা, চিরীংসা ইত্যাদি শ্রেণীর মগ জনজাতিরা এই অঞ্চলে বাস করতে দেখা যায়। বোমাং অঞ্চলে যারা বাস করে তাদেরকে বলা হয় বোমাং থংসাং।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে অধীনস্থ অঞ্চলে রূপান্তরিত করার পর ব্রিটিশ সরকার ১৮৬০ খ্রিঃ “পালাইং থং” গঠন করে। পার্বত্য এলাকার উত্তরাংশ থেকে প্রায় ৭০০ বর্গমাইল এলাকা নেওয়া হল এবং তাকে পেলেংথং নাম দেওয়া হল। অধিকাংশ পেলেংসা শ্রেণীর জনজাতিরা এই অঞ্চলে বাস করতে দেখা যায়। কারণ এরা প্রকৃতপক্ষে আরাকানের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত পেলেং কৈং থেকে এসেছিল। আবার মগ পণ্ডিতদের ধারণা— বোলাইং শব্দ থেকে পালাইং শব্দ রূপান্তরিত হয়েছে। বোলাইং শব্দের অর্থ হলো বলবান, শক্তিশালী। এই শ্রেণীর দলনেতা নাকি সুন্দর ও অত্যধিক বলবান ছিলেন। তাই তাঁকে বলতেন বোলাইং এবং তাঁর অনুগামী সকলকেই বলা হতো ‘পালাইংসা’ বা ব্লাইং সা। ১৮৬০ খ্রিঃ ব্রিটিশ সরকার দ্বারা ক্যাজেসংকে মং রাজা নিযুক্ত করা হল।

মগদের একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে— “সাক্‌হিতাং স্রোংগোনক্‌খ্যা, পেলেইংসাজে আলোন্না।”

অর্থাৎ, চাকমাদেরকে আগে এবং ত্রিপুরীদেরকে পিছে রেখে পেলেইংসা মাঝখান দিয়ে যাও। সাক হলো চাকমা জাতি, স্রোং শব্দের অর্থ হলো ত্রিপুরী সম্প্রদায়। মগেরা ত্রিপুরীদেরকে স্রোং বলতো। পালাইংসা হলো মগদের একটা শাখা - পালাইংসা জাতি। ত্রিপুরাতে পরবর্তী সময়ে চাকমা, পালাইংসা মগ জাতি ও স্রোংরাও প্রবেশ করেছিল।

১৭০৪ শকাব্দে (১৭৮২ খ্রিঃ আরাকান ব্রহ্মরাজ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়। এই সময় বিতারিত আরাকানবাসীরা নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাবার জন্য পূর্ববঙ্গে পুনরায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্রিপুরায় পালিয়ে আসে।

দক্ষিণ ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে মগ জাতিগোষ্ঠীর ভাষা দ্বারা প্রভাবিত স্থানের নাম বেশি পাওয়া যায়। যেমন - বংগাং (বংগাফা), বেখোউরে (বাইখোড়া), ফোয়াইরো তং (জুলাইবাড়ি), পূর্বে জুলাইবাড়ি বাজারের টিলাটির নামছিল ফোয়াইরোতং। নেহরো (দেবদারু)— নেহ-শব্দের অর্থ দেবতা, আরু-শব্দের অর্থ ছবি বা মূর্তি। পিলাক থেকে দেবদারু অঞ্চলে - প্রাচীনকালে প্রচুর দেব-দেবীর মূর্তি ছড়িয়ে পড়ে থাকত। শোনা যায় যে আমার প্রপিতামহরা অল্প বয়সে যখন পিলাক অঞ্চলে বনে মহিষ চড়াতেন তখন এই মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে থাকা

মূর্তিগুলির উপরে লাফালাফি করতেন এইগুলি নিয়ে খেলা করতেন। শুধু মূর্তির উপর পা রেখে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতে পারতেন। পরবর্তী সময় ঐ অঞ্চলগুলিকে জংগল কেটে মূর্তিগুলিকে ভেঙ্গে ফেলে চাষাবাদ শুরু করে। কিছু কিছু মূর্তি মানুষের বাড়িতে স্থান পায় ও পূজিত হয়। এই নেহ রং থেকেই নাম পরিবর্তিত হয়েছে দেবদারু। তঃ ক্রাইমা, বং গো (বনকুল), মগরুম, লুকথোং (মুহুরীপুর) — মগ ভাষায় লুক শব্দের অর্থ কাজ করাকেই বোঝায়। থোংয়ং শব্দের অর্থ হলো জংগল কেটে আবাসভূমি গড়ে তোলা। মগ আদিবাসীদের একটা বিশাল দল ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। বন কেটে পরিষ্কার করে আবাসভূমি গড়ে তুলেছিল বলেই জায়গাটার নাম রাখা হয় লুকথোং। প্রবীণদের মুখে শোনা যায় এখানে থাকাকালীন তাদের দলের একটা শিশুকে বনের বাঘ তুলে নিয়ে যায়। তাই জায়গাটাকে আরোওয়েং (খারাপ) বলে ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় তারা।

পিলাকের কাছেই একটি অঞ্চলের নাম ঠাকুরছড়া। ঠাকুরছড়া নামটি কী করে হলো তাই নিয়ে মগ জাতিদের মধ্যে একটি লোক কাহিনি আছে। প্রাচীনকালে সেই ঠাকুরছড়াতে একটা জায়গায় গভীর জলাশয় ছিল। সেই জলাশয়ের নীচে গুহার ভিতরে সুন্দর একটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মূর্তি ছিল যা পুরোপুরি স্বর্ণ ধাতু- দিয়ে গড়া। মূর্তিটির চোখ দুটি অতিমূল্যবান মণি দ্বারা খচিত। এই মূর্তিটি নাকি আগ্রত ছিলেন। কোন একদিন এক রাখাল ছেলে তার হারানো গরুকে খুঁজতে গিয়ে বিকালে পড়ন্ত বেলায় সেই ছড়ায় দেখেছিল — হেলানো গাছের ডালের উপর বসে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রোদ পৌঁছাচ্ছিল। রাখাল ছেলেটিকে দেখা মাত্রই বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী জলাশয়ে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে নীচে চলে গেল। পরবর্তী সময়ে একদিন আরাকান থেকে আগত ‘সং লইসা’ অর্থাৎ গুপ্তধন সম্বানকারী সেই ছড়ার জলাশয়ে এসে গভীর জলে গুহার ভিতর থেকে সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মূর্তির চোখ দুটোকে উপরে তুলে নিয়ে যায়। লোক মুখে শোনা যায় যে, সংলইসা মস্ত্রের প্রভাবে ঔষধিগন্ধ দ্বারা জলাশয়কে ফাঁক করে ফেলে এবং সহজেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করে তার কাঙ্ক্ষিত ধন মূর্তির মণি খচিত চোখ দুটি তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বাকি মূর্তিটিকে কারা নিয়ে গেছে তা আর জানা যায়নি। ঐ ছড়াতে বৌদ্ধ ঠাকুরের মূর্তি ছিল বলে সেই অঞ্চলের নাম রাখা হয় — ঠাকুর ছড়া। এমনকি আরাকানে আনন্দচন্দ্র শিলালিপিতে ৪৭ নং স্তবকে উল্লেখ করা আছে যে, রাজা আনন্দচন্দ্র সোনা, রূপা ও পাথর দিয়ে বহু বৌদ্ধ মূর্তি বোধিসত্ত্ব তৈরি করান। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ‘চুন্দামিথী’ বা মূর্তিও তৈরি করেছিলেন। তাই অনুমান করা যেতে পারে যে, চুন্দাদীন ঠাকুরছড়ায় বৌদ্ধ ঠাকুর মূর্তিটি আরাকানের রাজা আনন্দচন্দ্র তৈরি করেছিলেন।

পিলাকের কাছে মুহুরী নদীর আসল নাম হলো ‘মরোয়ী খ্যং’। মগ ভাষায় মোরোওয়া শব্দের অর্থ হলো জাতপাত বিচার বা বাছাই করা হয় না। ‘খ্যং’ শব্দের অর্থ নদী। এই মরোওয়া নদীর কিনারে বসবাসকারী মানুষেরা অর্থাৎ ত্রিপুরী, মগ ও হিন্দু, বৌদ্ধ, ধর্ম-জাত বিচার না করে পরস্পর জাতির মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। তাই সেই নদীটির নাম হয়ে গেল মরোয়ী খ্যং। এই মরোয়ী নদীকে বাংলাভাষীরা বলতো মুহুরী নদী। পিলাকে প্রাপ্ত বিভিন্ন বুদ্ধ ও হিন্দু

দেবদেবীর মূর্তি এই অঞ্চলের সংস্কৃতিরই প্রমাণ বহন করে। ফোয়াইনী নদীকে বাংলা ভাষীরা বলতো ফেনী নদী। গো-সাপকে মগ ভাষায় ‘ফোয়াই’ বলা হতো ‘নীং’ শব্দের অর্থ হলো থাকা বা বাস করাকে বোঝায়। প্রাচীনকালে এই নদীর কিনারে প্রচুর পরিমাণে গো-সাপ নামক সরীসৃপ প্রাণী বিচরণ করতো। তাই মগ জাতিরা এই নদীটির নাম রাখে ‘ফোয়াইনিং খ্যং’। ফোয়াইনী থেকেই বাংলা ভাষীদের কাছে হয়ে গেল ফেনী নদী। গোমতী নদীকে মগ ভাষায় বলা হতো গোং ম্যে খ্যং। গোং শব্দের অর্থ বিনুক আর ম্যে শব্দের অর্থ কালো রং। প্রাচীনকালে সেই নদীতে প্রচুর পরিমাণে কালো রঙের বিনুক ছিল। তাই মগ জাতিরা নদীটির নাম রাখে গোংম্যেখ্যং।

প্রচলিত মৌখিক কাহিনি আছে যে, কোন এক ত্রিপুরার রাজা যখন গোমতী নদীতে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করছিলেন তখন দেবতামূড়া ছবিমূড়া পাহাড়ে খোদাই করা ছবিগুলি দেখে প্রবীণ মাঝিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এটা কাদের ছবি? উত্তরে প্রবীণ মাঝি বলেছিল, ছবিগুলি আরাকান রাজার খোদাই করা ছবি। আরাকান রাজা ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করার পর বিজয়ের চিহ্ন স্বরূপ এই ছবিগুলি খোদাই করিয়ে গেছেন। যুদ্ধে আরাকান রাজা ত্রিপুরার রাজাকে মেরে ফেলেছিল। প্রবীণ মাঝির মুখে এই কথা শুনে, রাজা রাগান্বিত হয়ে সেই ছবিগুলির গায়ে বন্দুক দিয়ে গুলি মেরেছিলেন। সেই ছবিগুলির গায়ে নাকি এখনও বন্দুকের গুলি পড়ার গর্ত বা চিহ্ন আছে।

বহু বছর পূর্বে আরাকান থেকে রাখাইংসা বা আরাকানীদের কিছু কিছু লোক প্রায় সময় ত্রিপুরাতে আসত গুপ্তধনের সন্ধানে। তাদের সঙ্গে সইচাজং নামে প্রাচীন পুঁথি থাকতো। কোথায় কোথায় গুপ্তধন লুক্কায়িত আছে তা স্থানের নাম দিয়ে সেখানে নকসা করে লেখা আছে। পুঁথিতে যারা এই গুপ্তধনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতো তাদেরকে মগ ভাষায় বলা হতো “সই লই সাং”। বহু বছর পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষেরা যখন ত্রিপুরা ত্যাগ করে চলে যায় বা আরাকানে ফিরে যায় তখন তাদের মূল্যবান ধনরত্ন সোনা, রূপা ইত্যাদি নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করে মাটিতে পুঁতে রেখে যায়। কারণ সেকালে এতগুলো ধনরত্ন বয়ে নিয়ে পায়ে হেঁটে দেশ-দেশান্তরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে এই সইচাজং পুস্তক যাদের হাতে যায় তারাই গুপ্তধনের সন্ধানে ত্রিপুরাতে বারে বারেই ফিরে আসে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থান, ভূমিরও পরিবর্তন হয়ে যায় এবং অনেকেই বাড়িঘর তৈরি করে তাদের দখলে চলে যায়। তাই তাদের কাক্ষিত পূর্বপুরুষের ধন সঠিকভাবে খুঁজে পায় না। এতে প্রমাণ হয় যে প্রাচীনকাল থেকেই মগ জনগোষ্ঠীরা ত্রিপুরাতে বসবাস করেছিল।

১৫৯৬ খ্রিঃ অমর মাণিক্য বিষ পানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তারপর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম রাজধর মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেছিলেন। রাজধর মাণিক্যের আমলে মগেরা রাংগামাটি বা উদয়পুর অঞ্চল ত্যাগ করে ত্রিপুরার আরও দক্ষিণে চলে যায়। উদয়পুরে যেখানে তারা বাস করেছিল সেই অঞ্চলটির নাম এখনও মগ পুষ্করিণী নামে খ্যাত। মগ জাতিরা বাসবাসকরাকালীন সেখানে অনেক বড় দিঘি খনন করেছিলেন। তাই জায়গাটির নাম এখনও মগ পুষ্করিণী রয়ে গেছে। উদয়পুর অঞ্চল ত্যাগ করে মগরা ত্রিপুরার দক্ষিণে অমরপুর, শান্তির বাজার,

বিলোনীয়া, সাক্রম মহকুমায় বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। ত্রিপুরার উত্তর দিকে কুমারঘাটে (ধনভিলা), কৈলাসহর দস্তা, কাঞ্চনপুর ও ত্রিপুরার পশ্চিম খোয়াই, তেলিয়ামুড়া মহকুমায় বিভিন্ন প্রান্তে একটা অংশ ছড়িয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

আরাকান ইতিহাস রাজওয়ং নামক গ্রন্থ ও বিভিন্ন সূত্র থেকে অনুমান করা যায় যে, মগ জনগোষ্ঠীরা হাজার বছর পূর্ব থেকেই ত্রিপুরাতে বসবাস করতো। ভৌগোলিক দুর্যোগের কারণে, যুদ্ধ বিগ্রহ, সংঘর্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে মগ জনজাতিদের একটা অংশ কোনো সময় ত্রিপুরা ছেড়ে বাংলাদেশ কিংবা আরাকানে ফিরে গেছে। একটা অংশ রয়ে গেছে। আবার কখনো শান্ত হলে পুনরায় অন্যান্য দলকে নিয়ে ত্রিপুরায় ফিরে এসেছে। আসা আর চলে যাওয়া। এমনি করে যাবাবরের মতো অনেক বছর কাটিয়েছিল। তাদের দলের একটা অংশ তখন থেকেই ত্রিপুরাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল। আর বিরাট একটা অংশ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। অপর একটি অংশ আরাকানে বসবাস করে।

বর্তমানে বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বান্দরবন, মাণিকছড়ি, খাগড়াছড়ি, পানছড়ি, ডাইবোনছড়া, রামগড়, রাঙ্গামাটি, মাটিরাঙ্গা, গুইলমারা, মহালছড়ি, এছাড়াও হারবাঙ, কক্সবাজার, বরিশাল, ছকরিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে মগ জনজাতিরা ছড়িয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে থাকে।

বর্তমানে ত্রিপুরায় - দক্ষিণ জেলার বিলোনীয়া, শান্তির বাজার, অমরপুর ও সাক্রম মহকুমায় বিভিন্ন অঞ্চলে, পশ্চিম জেলায়— তেলিয়ামুড়া ও আগরতলায়, ধলাই জেলায়— আমবাসা, গন্ডাছড়া, উত্তর জেলায়— কৈলাসহর ও ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর ইত্যাদি বিভিন্ন মহকুমায় অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে মগ জনজাতিরা ছড়িয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

গোত্র :

মারমা বা মগ জনজাতিকে প্রফেসর পিয়ের ব্যাসানেত ২১টি গোত্রে বিভক্ত করেছেন। জনাব আব্দুল হক চৌধুরী করেছেন ২২টি গোত্রে ও জনাব আবদুস সাত্তার করেছেন ১৫টি গোত্রে। সে যাই হোক, মগ জনজাতিকে প্রধানত পল্লাইসা, রিগ্রেসা, থংসা, ক্যকফ্যাসা, ফ্রাংসা, মারোসা, খ্যাংসা, ওয়েইংসা, চিরিংসা, দাকছোয়েসা, সাক্প্রেগ্যাংসা, কক্‌ডাইনসা, লুঙ্ডুক্সা, মুরিখ্যাংসা এই ১৩টি গোত্রের -কথা বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক মংক্যাশোয়েনু নেভী তাঁর লেখা মারমা সমাজ ও সংস্কৃতি নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। দেশে বোমাংসা মগ জনজাতিগোষ্ঠীর বন্ধন লড় শিথিল যদিও বা তাদের গোষ্ঠী- গোত্র ভেদাভেদের জন্য কোন পৃথক কার্যক্রম নির্ধারণ করা যায় না। তবে তাদের কথাবার্তা ও অন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য যেমন — পাগড়ী পরা বা মাথায় কাপড় বাঁধবার নিয়ম - কানুন দেখে অতীতকালে কোন্ মগ বা মারমা কোন্ গোত্রের তা অনায়াসে এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীকে আলাদা করা যেত। এছাড়া দলের নাম তাদের বসতি অঞ্চলের নামানুসারে নামকরণ করা হয় বলে অনেকের বিশ্বাস। যেমন রিগ্রীসার বা খ্যাং নদীতীরবাসী। পাল্লাইগোসা ছোট পেলেই শাখা- নদীতীরবাসী, উয়ংসা উয়ইং অর্থ বাগান যারা বাগান বা অরণ্যভূমি রক্ষা করে বা সেখানে বসবাস করে। ক্যকফ্যাসা অতীতে যারা পাথরের গুহা বা অঞ্চলে বসবাস

করেছিল। পালাইংসা পালইং নদীর তীরবাসী।

ত্রিপুরায় বর্তমানে মগ জনগোষ্ঠীদের লোক সংখ্যা মোট প্রায় ৩২,০৯৭ জন। পুরুষের সংখ্যা মোট ১৬,১৭৯ জন, স্ত্রী লোকের সংখ্যা মোট ১৫,৯১৮ জন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোট মগ জনসংখ্যা - ৫১০ জন।

পুরুষের সংখ্যা - ২৬০ জন, মোট স্ত্রী লোকের সংখ্যা - ২৫০ জন।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার মোট মগ জনসংখ্যা - ২২৭৭ জন।

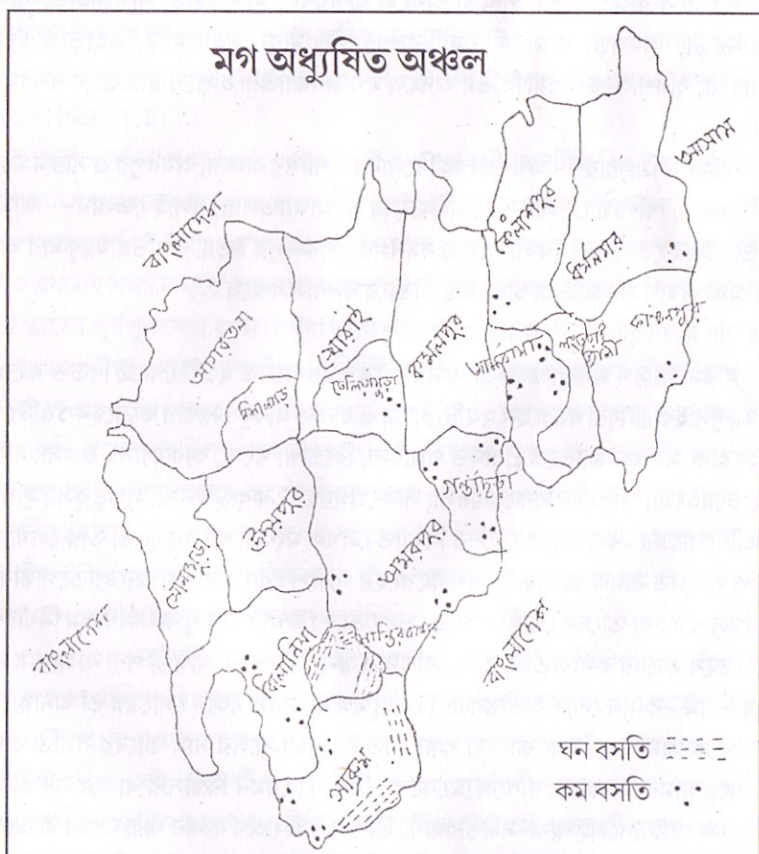
পুরুষের সংখ্যা - ১১৫০ জন, স্ত্রীলোকের সংখ্যা - ১১২৭ জন।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মোট মগ জনসংখ্যা - ২৫,৩৪০ জন।

পুরুষের সংখ্যা - ১২,৭৫৪ জন, স্ত্রীলোকের সংখ্যা - ১২,৫৮৬ জন।

ধলাই জেলার মোট মগ জন সংখ্যা - ৩৯৭০ জন।

পুরুষের সংখ্যা মোট - ২০১৫ জন, স্ত্রীলোকের সংখ্যা - ১৯৫৫ জন।



সামাজিক কাঠামো ও প্রথা

শারীরিক বৈশিষ্ট্য :

মগ জাতিগোষ্ঠীরা সাধারণত হলুদ পিঙ্গল অথবা হালকা পিঙ্গল বর্ণের। অন্যান্য মঙ্গোলিয়ানদের মতই তারা পেশীবহুল সুঠাম শরীর, প্রশস্ত মাথা, গোলাকৃতি মুখ, পুরু ঠোঁট, ছোট চোখ, বোঁচা নাক ও কালো চুলের অধিকারী। তাদের শরীরে লোম ও দাড়িগোঁফ খুব কমই থাকে। পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণী- নির্বিশেষে তারা কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা রাখেন। পুরুষেরা লম্বায় মাঝারি আকারের। মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় একটু বেঁটে।

মগ সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতিনীতিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

যেমন, জন্মকালীন সংস্কার ও আচার।

অন্যান্য উপজাতিদের মতই মগ জাতিরাও জন্মকালীন বিভিন্ন সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। সন্তান গর্ভে থাকাকালীনই কোন বৈদ্য দ্বারা পূজা দিতে হয়। মগ ভাষায় এই পূজাকে বলা হয় খাইং থা ফিরে। মা ও সন্তানের মঙ্গল কামনা করে বিম্বী ধানের খই, কলা, গুড়, বিভিন্ন ধরনের ফল ও ফুল দিয়ে জলে ও স্থলে পূজা দেওয়া হয়। জলে খ্যাংসাং মাকে অর্থাৎ জলদেবীকে স্থলে বুদ্ধমন্দিরে গিয়ে পূজা দেওয়া হয়।

সন্তান প্রসবের সময় মগ রমণীকে আলাদা ঘর তৈরি করে (আঁতুড় ঘর) রাখা হয়। আঁতুড় ঘরে একজন ছারামা (ধাই) ও একজন সাহায্যকারিণী থাকেন। এছাড়া অন্যান্য মহিলারাও সাহায্য করবার জন্য বাইরে অপেক্ষা করে বসে থাকে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই মা ও শিশুকে গরম জল দিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর সদ্যজাত শিশুকে নূতন কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে উপযুক্ত জায়গায় বিছানা করে শুইয়ে দেওয়া হয়। প্রসূতির কাপড় চোপড় পরিবর্তনের পর সুবিধানুযায়ী একটি জায়গায় আগুন জ্বালানো হয়। তিনদিন ধরে সেই আগুন জ্বালানো থাকে। আগুনের ধারে একটি মাটির চাকা বসিয়ে রাখে। প্রসূতির পেটের ব্যথা উঠলেই সেই গরম মাটির চাকার সাহায্যে স্যাঁক দিয়ে ব্যথা দূর করা হয়। তিন দিন পরে বাঁশ বেতের তৈরি খোং-খোওয়ক নামক বুড়ি তৈরি করে নিয়ে সেখানে খই, কলা, গুড় ও ফুল দিয়ে আঁতুড় ঘরে আগুন-সহ নিয়ে একটু দূরে তিন মুখের রাস্তার মাঝখানে পূজা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার তিনদিন পর নূতন দোলনা ঝুলিয়ে প্রথমে পাথর, লোহার খণ্ড, কার্পাস রেখে তিনবার মন্ত্র পাঠ করে দোলানো হয়। তারপর শিশুটিকে দোলনায় রেখে আনুষ্ঠানিকভাবে দোলানো হয়। শিশুটিকে দোলনায় তোলার পূর্বে পাথর রেখে দোলানোর উদ্দেশ্য হল, শিশুটি যেন পাথরের মত শক্ত ও ধৈর্যশীল হয়। লোহার খণ্ড তুলে দোলানোর উদ্দেশ্য হল,

শিশুটির স্বাস্থ্য যেন ভবিষ্যতে বলবান ও মজবুত হয়। কাপাঁশ রেখে দোলানোর উদ্দেশ্য হল - শিশুটির স্বাস্থ্য যেন কাপাঁশের মত হাল্কা ও সুস্থ হয়। এ অনুষ্ঠানে মনরী সাং হোয়ী খাইং নামক গীত পরিবেশন করা হয়। তারপর বৌদ্ধ ভিক্ষু কিংবা বৈদ্য (ওঝা) দ্বারা দিনক্ষণ দেখে নবজাতকের নামকরণ করা হয়। তখনই বৈদ্য দ্বারা শিশুর গলায় লাক্ষ্যেয়ী বা মাদুলি ধারণ করানো হয়ে থাকে। একমাস পরে নবজাতকসহ প্রসূতিকে ঘরে তোলা হয় এবং হলুদ ও চন্দনের জল ছিটিয়ে প্রসূতিকে শুদ্ধি করানো হয়।

কিশোর থেকে যৌবনঃ

মগ জনগোষ্ঠীদের সন্তান কিশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করলে, এই সময়ে পিতামাতা তাদের উপর সামাজিক নিয়মে ক্রিয়াকর্ম করার একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। এই সময়ে ছেলে সন্তানকে নির্দিষ্ট শুভ দিনে বুদ্ধ মন্দিরে নিয়ে শ্রমণ বা প্রবজ্যাগ্রহণ (বৌদ্ধ ভিক্ষু) অনুষ্ঠান করাতে হয়। মগ জাতিগোষ্ঠীরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এই অনুষ্ঠানকে মগ ভাষায় স্যাং প্রোঃ পোয়ে বলা হয়। আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের লোকজনদেরকে নিয়ে মিলিতভাবে এই পুণ্য অনুষ্ঠানটি করে থাকে। প্রথমে ছেলেকে মাথার চুল মুগুন করে স্নান করানো হয়। তারপর শ্বেতশুভ্র নতুন পোশাক পরিধান করিয়ে তাকে বৌদ্ধভিক্ষু জীবনগ্রহণ বা প্রবজ্যাগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যাকে বলা হয় অষ্ট পরিষ্কার গ্রহণ করা। অষ্ট পরিষ্কার হলো (১) সাংবইং বা সাংগ্রাইন (সাংগ্রাইন শব্দের অর্থ হলো ভিক্ষুকের ব্যবহৃত চীবর বা সেলানো কাপড়) (২) সাং বোয়ী (পিণ্ডপাত্র বা ভিক্ষাপাত্র) (৩) থীং (ছাতা) (৪) য়েং (পাখা) (৫) তংমোয়ীং (যষ্ঠী বা লাঠি) (৬) সাংথোং (ক্ষুর) (৭) রীজই (জল ছাকনী) (৮) এং থ্রী (সূচ ও সূতা)।

পিতামাতা তারবোয়ী (পূজার অর্ঘ্য) মাথায় নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করে। একটা বড় পাত্রে চাল, ডাল, তেল, লবণ, চিনি, সাবান, ফলমূল, নারিকেল, পান- সুপারি - ধূপকাঠি, মোমবাতি, প্রদীপ, থীং তাংখোয়েং, মোলী বা ক্রাউস্যা (ছাতা, রঙিন পতাকা) আত্মপল্লব, মঙ্গলঘট ইত্যাদি দিয়ে তারবোয়ী, অর্থাৎ পূজার অর্ঘ্য সাজানো হয়। ছেলে ন্যাড়া মাথায় নূতন পোশাকে সজ্জিত ও অষ্ট পরিষ্কার সঙ্গে নিয়ে শ্রমণ বা প্রবজ্যা গ্রহণের জন্য মন্দিরে যায়। আত্মীয় স্বজন ও অভিভাবকরা অন্যান্য সামগ্রী ও পূজার অর্ঘ্য নিয়ে মন্দিরে যায়। সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা গুরু স্থানীয় সন্ন্যাসী দ্বারা স্যাংপ্রো পোয়ে (শ্রমণ বা প্রবজ্যা গ্রহণ) অনুষ্ঠান হয়।

ছেলে নিয়ম অনুযায়ী দীক্ষা নেওয়ার পর ভিক্ষু বেশে কম পক্ষে সাতদিন পর্যন্ত বুদ্ধ মন্দিরে ব্রত পালন করে থাকতে হয়। ঐসময় রোজ মন্দিরে ছোয়াইং (অন্নভোগ) দিতে হয়। সাতদিন অতিক্রান্ত হলে গ্রামের সকল লোকজন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদেরকে নিমন্ত্রণ করে ভাত খাওয়ানো হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদেরকে সাধ্যমত দ্রব্য সামগ্রী ও পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে দান করা হয়। পুত্রের ভবিষ্যত মঙ্গল কামনা করে প্রত্যেক অভিভাবক স্যাংপ্রো পোয়ে নামক এই অনুষ্ঠান করে থাকে। মগ সমাজে কোন ছেলে প্রবজ্যা (ভিক্ষু) গ্রহণ করার পূর্বে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এছাড়াও ছেলেকে লাপাইং ছোয়ে পোয়ে নামক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবসা মাং বা যুবক প্রধান বলে ঘোষণা করা হয়। বিশেষ করে গ্রামের জমিদারের পুত্রকেই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবসা মাং বলে

ঘোষণা করা হয়। ডঃ ভল্লভাংমের লেখা ‘পার্বত্য চট্টগ্রামের কৌম সমাজ’ নামক গ্রন্থে সুবসা (যুবক) মাং সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

এবার আসা যাক লাপাইং ছোয়ে সম্পর্কে কিছু কথা। লাপাইং শব্দের অর্থ হলো হাত বা হাতের অগ্রভাগ। ছোয়ে শব্দের অর্থ হলো ঝোলানো। কোন নির্দিষ্ট দিন দেখে শুভলগ্নে লাপাইং ছোয়ে অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠান সাধারণত সকালের দিকেই করতে হয়। পূর্বে ঘোষিত কোন সুবসা মাং বা যুবক নেতা অথবা বিবাহিত হলোও লাপাইং ছোয়েই এমন ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে থাকতে হবে। তার পরিচালনায় অন্যান্য যুবকদের নিয়ে এই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। অনুষ্ঠানের নিয়ম-ঘরের বারান্দায় চতুর্দিকে কলা গাছ লাগিয়ে মঞ্চ তৈরি করে চারিদিকে বিল্লী ধান রেখে তার উপর চারটি মঙ্গল ঘট বসিয়ে মঞ্চ সাজিয়ে রাখবে। তারপর উক্ত যুবককে স্নান করিয়ে তাকে লুঙ্গি বা ধুতি জামা এবং মাথায় গংবং বা পাগড়ী বেঁধে ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত করে দেওয়া হয়। গ্রামের অন্যান্য যুবকেরা ভাবী সুবসা মাংকে ধরে ঘর থেকে বের করে আনা হয়। নির্দিষ্ট শুভ সময়ো তাকে বারান্দায় মঞ্চের মাঝে ঘরের সঠিক শক্ত চালে অথবা কাঠকে ধরে ঝুলিয়ে থাকতে দেওয়া হয়। তখন অন্যান্য যুবকেরা হাসি ঠাট্টা ইঃ হঃ হঃ বলে জয়ধ্বনি করে এবং সে যাতে মাটিতে পা রাখতে না পারে সেদিকে সকলে নজর রাখে। ঐ অনুষ্ঠানে গ্রামের যুবকেরা যা যা দাবী করে অভিভাবকরা তা হাসি মুখে মেনে নেন। বিশেষ করে বিল্লী চাউল দিয়ে তৈরি করা স্বাফাই বা চিংরে নামক মিষ্টি রস নেশাজাতীয় খাবার দাবি করে থাকে। তা খেয়ে তারা আনন্দ ফুটি করে। তাদের দাবি মেনে নিলেই উক্ত যুবককে ঝোলানো অবস্থা থেকে মাটিতে নামিয়ে দেওয়া হতো। সবাই জয়ধ্বনি করে তাকে সমাজে সুবসা মাং বা যুবক নেতা বলে ঘোষণা করা হয়। গ্রামের যেকোন বিয়েতে এই সুবসা নেতাকে কর হিসাবে টাকা দিতে হয় মগ সমাজে এই রীতিকে আকইংখাঃ বলা হয়।

এছাড়াও সমাজে যেকোন অনুষ্ঠানে বা শুভকাজে সুবসা মাং কার্য পরিচালনা করার অগ্রাধিকার থাকে। এই সব অনুষ্ঠান করতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। গ্রামের লোকজনদেরকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়। তাই সবার পক্ষে এই ধুমধাম করে অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

গরীবদের ক্ষেত্রে কোন যুবক ছেলে জুম চাষের জন্য জংগল কাটবার সময় কোন গাছ যদি অর্ধেক অংশ কেটে দেওয়ার পর গাছটি নিচে পড়ে যায়, তবে গোড়ার দিকে দুই ভাগ হয়ে গেলে, কাছের অন্য কোন যুবক সুযোগ বুঝে সেই যুবকের হাতটি ধরে কেটে যাওয়া গাছটির গোড়ার ফাঁকে ঢুকিয়ে আটকে রাখা হতো। এবং খাওয়ানোর জন্য যা খুশি দাবি করত। যুবকের অভিভাবকেরা দাবি মেনে নিলে গাছের গোড়ায় আটকে রাখা হাত ছেড়ে দেওয়া হতো। তখন তাকে সুবসা বা যুবক বলে ইঃ হঃ হঃ ধ্বনি দিয়ে ঘোষণা করতো। সেদিন থেকে সেও সুবসা বলে সমাজে পরিচিতি লাভ করে।

রাংতাং পোয়ে :-

কন্যা সন্তান যৌবনে পদার্পণ করার প্রাককালে ওয়া (আশ্বিন পূর্ণিমা), সাংগ্রাইং (চৈত্র

সংক্রান্তি) ইত্যাদি শুভদিনে রাংতা পোয়ে অনুষ্ঠান করে থাকে। যাকে রাংতাং ফোং অর্থাৎ যার বুক নতুন কাপড় রাংগাইং বাঁধানো হবে। তাকে নতুন কাপড়ে সাজিয়ে বুদ্ধ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। নতুন একটা ঐতিহ্যবাহী নক্সা করা হাতে বোনা রাংগাইং (বুক বন্ধনী কাপড়) সঙ্গে নিয়ে যায়। গ্রামের অন্যান্য যুবতীরা ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করে। মূলত এটা যুবতীদের অনুষ্ঠান। ভগবান বুদ্ধের সম্মুখে মন্ত্র পাঠ কয়েকবার উক্ত মেয়েটিকে অন্য দুইটি যুবতি মেয়ে রাংগাইং বেঁধে দেবে। অন্যান্য যুবতী মেয়েরা হাতের তালি দিয়ে ইং ছং ছং বলে কয়েকবার জয়ধ্বনি দিয়ে তাকে যুবতি বলে ঘোষণা করা হয়। নব প্রতিষ্ঠিত যুবতি মেয়ে বুদ্ধকে ও বুদ্ধ ভিক্ষুদেরকে প্রণাম করে তারপর অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ও আত্মীয় স্বজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। সেই দিন থেকে মগ সমাজে সে যুবতি রূপে পরিচিতি লাভ করে। এই অনুষ্ঠানে হাসিঠাট্টা ও তরইং নামক গান গেয়ে আনন্দ উপভোগ করে। এই গানটির কয়েকটি লাইন তুলে ধরছি।

তেই ছংছং তেই ছং বোলা ছংউ ক্যারে, ইংগ্রী সখা ইংস্যংরাসী, নাইংদাংউংমা চোলোমোয়ীং
সমিঙ স্যোগো পোয়েগ্রী সফ্রাং পোয়েব্রাং চালে —

মেত মোয়ে — লে।

আথাউ কাজা তজইং সোয়েম্যা থইং

অং উকাজা তজইং জ্যেম্যা থইংলে।

হুচইংমা জইংলে হুচইং আত্রাং

গ্যেমােসেগো আয়েজা খ্যা-লে।

পোয়েগ্রীজা সফ্রাং পোয়েব্রাং চালে

মে তি মোয়ে লে.....।

বিবাহ :-

মগ জনগোষ্ঠীদের মধ্যে বিবাহ সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমত, সামাজিক রীতি অনুযায়ী আলোচনার মাধ্যমে যে বিবাহ।

দ্বিতীয়ত, মেয়েকে চুরি করে নিয়ে বিবাহ করা।

তৃতীয়ত, ঘর জামাই উঠে বিবাহ।

নিচে তিন প্রকার বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথমত - সামাজিকরীতি অনুযায়ী বিবাহ—

এই বিবাহের নিয়ম হলো পুত্রের অভিভাবক কন্যার বাড়িতে পান-সুপারি ও মিষ্টি নিয়ে উপস্থিত হয় এবং কন্যার অভিভাবকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেন। যদি উভয়পক্ষের সন্তানের কোষ্ঠী মিলে যায় ও বিয়েতে মত থাকে, তাহলে উভয়পক্ষের অভিভাবকরা মিলে মেয়ের বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ভাবী পুত্রবধূকে পুত্রের অভিভাবক যেকোন একটি গয়না দিয়ে আশীর্বাদ করে। গ্রামের আত্মীয় স্বজন ও বোওয়াসুগ্রী (সমাজপতি) এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে এবং সকলের মতামত নেওয়া হয়। গ্রামের রোওয়া সুগ্রী (গ্রামের নেতা)কে ছেলের অভিভাবক পান- সুপারি ও মিষ্টি ও ১৫ টাকা দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করেন এবং

বিয়ের অনুমতি নেওয়া হয়। এই নিয়মকে মগ ভাষায় বলা হয় ‘পোয়েরামাঁগিয়া’। গ্রামের যুবক প্রধান বা যুবকদেরকে ন্যূনতম চার টাকা দেওয়া হয়। মগ ভাষায় যাকে বলে ‘আকইংখা’। এই আকইংখা যদি ছেলের অভিভাবকা না দেয় তাহলে যুবকেরা ইচ্ছা করলে বিয়েতে বাধাও দিতে পারে।

মগ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়েতে ছেলের পক্ষ থেকে কোন যৌতুক বা পণ দাবি করে না। পূর্বেও কোন কালে এই প্রথা ছিল না। তবে কন্যা ও তার অভিভাবক ইচ্ছা করলে ছেলের বা তার পিতা-মাতার কাছে যৌতুক দাবী করতে পারে। তাদের দাবিপূরণ না হলে অনেক ক্ষেত্রে বিয়েতে অমত প্রকাশ করে। মেয়েরা সাধারণত গায়ের অলংকার দাবি করে। মেয়ের পক্ষের দাবি মেনে নিলে তবেই বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দাবি ছাড়াও উভয় অভিভাবকের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে বিয়ে হয়ে থাকে। মগদের মধ্যে বিবাহ ছেলেদের বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয়। মাথার চিরকনি থেকে শুরু করে মেয়েদের ব্যবহৃত কাপড় গয়না সবকিছু দিয়ে পুত্র বধূকে বরণ করা হয়। এই কাপড় ও অলংকারে সজ্জিত হয়ে নববধূ শ্বশুরালয়ে গমন করে। বরপক্ষের কুমারী মেয়েদের দ্বারা ছাতা দিয়ে ঘেরাও করে নববধূকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যায়। লাইংখোওয়াছিঃ অর্থাৎ গ্রামের ছেলেরা আটক করে— তাদের দাবিমত টাকা দিলে রাস্তা ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কন্যা বধূরূপে নিয়ে যাবার সময় ছেলের অভিভাবক কন্যার মাকে নোঃ আফোঃ নামক দুধের দাম ৩১ টাকা (রূপার মুদ্রা) দিতে হয়। কন্যা মায়ের বুকের দুধ পান করে বড় হয়েছিল তাই এই দুধের দাম দেওয়ার প্রথা। বরপক্ষের কুমারী বা আস্যের মেয়েদের দ্বারা বিভিন্ন রঙের ছাতা দিয়ে নববধূকে ঘেরাও করে শ্বশুরালয়ে নিয়ে যায়। বর বা কন্যার আত্মীয় স্বজনরা ঢোল বাজাতে বাজাতে বিয়ের বাড়িতে নিয়ে যায়। বিয়ের বাড়িতে পৌঁছার আগে প্রবেশ পথে গ্রামের ছেলেরা একটি বাঁশ দিয়ে বাঁধা সৃষ্টি করে বা আটকে রাখে। মগ ভাষায় এই বাধাকে বলে লাইংখোওয়াছিঃ। এই সময় অনেকে চা মিষ্টি দিয়ে নববধূকে আপ্যায়ন করে ও মুখ দেখাবার জন্য অনুরোধ করে। তারা আনন্দ ফুটি করবার জন্য বরপক্ষের কাছে টাকা দাবি করে। সাধ্যমত টাকা দিলে রাস্তা ছেড়ে দেয়। বরের বাড়ির উঠানে পৌঁছে গেলে প্রথমে শ্বাশুড়ি এসে নববধূর হাত ধরে বরণ করে গৃহের ভিতরে নির্দিষ্ট কক্ষে নিয়ে যায়। বরের বাড়ির উঠানে উপযুক্ত একটি জায়গার চার কোণায় চারটি কলা গাছ পুঁতে তার পাশে বিল্লী ধানের উপর চারটি মঙ্গলঘট বা অম্র-পল্লবসহ জল ভরা কলসী বসিয়ে দেওয়া হয়। কারুকার্য করা বাঁশ ও রঙিন কাগজ ও কাপড় দিয়ে সাজিয়ে ঐতিহ্যবাহী বিয়ের মঞ্চ তৈরি হয়। সেই মঞ্চ বর-কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়া হয়। প্রথমে বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা মন্ত্র ও মঙ্গল স্তোত্র পাঠ করে বিবাহের অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। তারপর বরের একটি কনিষ্ঠ আঙুল নিয়ে কনের কনিষ্ঠ আঙুলের সাথে আড়াআড়ি করে ধরতে দেয়া হয়। এরপর গ্রামের দক্ষ পুরোহিতের দ্বারা মন্ত্র পাঠ করে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে। বর ও কনেকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষে বসিয়ে দেওয়া হয়। একটি থালায় ভাত তার উপরে বড় মাপের একটি আস্ত মাছ ভাজা ও মোরগ মাংসের আস্ত মাথার টুকরা সাজিয়ে পোয়েজাং (ভাতের থাল রাখার জিনিস)- এর উপর দেওয়া হয়। পুরোহিত সেই থাল

থেকে দুই হাতে দুই মুঠো ভাত নিয়ে হাত দুটি আড়াআড়ি করে ধরে বর ও কনেকে এক সাথে ভাত খাইয়ে দেয়। এই নিয়মে কোন কোন ক্ষেত্রে বরের পিতামাতারা ভাত বর ও কনের মুখে দেয়। তারপর অনুষ্ঠানে ভাতের থালের মাছ ও মোরগের মুখ থেকে জিহ্বা টেনে পুরোহিত পরীক্ষা করে দেখে যে বর-কনের দাম্পত্য জীবন সুখী হবে কি না। তারপর বর-কনের হাত ধরে ঘরের ভিতরে একটা নির্দিষ্ট জায়গা করে বসিয়ে দেওয়া হয়। বসার সময় কনেকে বরের বামপার্শ্বে বসানা হয়। তাদের সামনে রজাং ওঃ (মঙ্গল ঘট) ও বিনী ধানের খই সাজিয়ে রাখা হয় এবং হাতের চুরি সমান সুতাকে পাকিয়ে অনেকগুলি চুরির আকারে গোল গোল করে সাজিয়ে রাখা হয়। প্রথমে বর ও কনের পিতামাতা নবদম্পতির উভয়ের হাতে গোল পাকানো সুতা পরিয়ে দেয়, তারপর ঘট থেকে জল ছিটিয়ে খই ছিটিয়ে বর-কনেকে সাধ্যমত কিছু দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। তারপর আত্মীয় স্বজন আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে সবাই এমনি করে আনুষ্ঠানিকভাবে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করে।

দম্পতিদের হাতে পরা গোল পাকানো সুতা গুনে দেখলেই বোঝা যায় যে, নবদম্পতির কত জনের আশীর্বাদ পেয়েছেন। বিয়ের পরের দিন নির্জন কোন গাছের গোড়ায় বড় আকারে একটি জল ভরা পাত্র বসিয়ে রাখা হয়। নবদম্পতিকে নিয়ে সেই পাত্রের উপর মাথা নিচু করে দাঁড়াতে দেওয়া হয়। তারপর উভয়ের মাথায় জল ঢেলে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে। নবদম্পতির মাথার জল গাছের গোড়ায় রাখা পাত্রটির ভিতরে পড়ে গেলে আশীর্বাদ প্রাপ্ত বর-কনের হাতের সুতাগুলিকে খুলে নিয়ে বলের আকারে গোল করা হয়। তারপর কোনটা বরের সুতা কোনটা কনের সুতা চিহ্নিত করে আনুষ্ঠানিক ভাবে জল ভরা পাত্রটির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাদের দাম্পত্য জীবন ভবিষ্যতে কীরূপ হবে তা এই পাত্রে ভাসমান সুতা দিয়েই পরীক্ষা করা হয়। এই দৃশ্য দেখার জন্য প্রচুর লোকের সমাগম হয়। এইভাবে মগ সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিয়ের কয়েকদিন পরে কনের বাপের বাড়িতে নবদম্পতি বেড়াতে যায়। মগ ভাষায় বলে কইত ফো লারে। তখন কনের মা বাবা আত্মীয়রা সাধ্যমত উপহার দিয়ে আশীর্বাদ করে। মগ ভাষায় যাকে বলে ‘লাউ ফোয়িরে’।

দ্বিতীয়ত, মেয়েকে চুরি করে নিয়ে বিয়ে করা —

সমাজে এক সাথে বসবাসের পর কোন কোন মেয়ে ও ছেলে নিবিড় প্রেমে আবদ্ধ হয়। যদি মেয়ে ও ছেলে উভয় পক্ষের অভিভাবক সন্তানদের বিয়ের ব্যাপারে অমত প্রকাশ করে ও বিক্ষোভ প্রকাশ করে। সাধারণত সেই সবক্ষেত্রেই মেয়েকে চুরি করে নিয়ে বিয়ে করা হয়। কোন ছেলে কোন মেয়েকে এইরূপ চুরি করে নিয়ে যদি বিয়ে করতে চায়; পুত্রের পিতা মাতা অপরাধী ছেলের মীমাংসা করার জন্য মিষ্টি, পান- সুপারি ইত্যাদি নিয়ে মেয়ের পিতা মাতার কাছে যায়। মেয়ের অভিভাবক তখন তাদের ইচ্ছানুযায়ী ছেলের অভিভাবকের কাছে নগদ টাকা দাবি করে। ঐ দাবিকে মগ ভাষায় বলা হয় ‘দা-ফা’। তাদের দাবি অনুযায়ী টাকা না পেলে মেয়ের মা বাবা বিয়েতে সম্মতি দেয় না। প্রয়োজনে রোওয়া সুগ্রী অর্থাৎ গ্রামের সর্দারের কাছে বিচার প্রার্থী হয়। এই বিয়েতে মেয়ের যদি সম্মতি থাকে তা হলে রোওয়া সুগ্রী উভয় পক্ষের অভিভাবককে বুঝিয়ে

বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। তখন ছেলের পিতা-মাতা মেয়ের অভিভাবককে সাধ্যমত 'দা-ফা' কিংবা নগদ টাকা দেয়। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

তৃতীয়ত, ঘর জামাই —

বিভিন্ন রকম সুবিধা ও অসুবিধার কারণে অনেক সময় বা অনেক ক্ষেত্রে মগ সমাজে কন্যার পিতা-মাতার গৃহেই ঘর জামাই হয়ে ওঠে। সেই সব ক্ষেত্রে কন্যার গৃহেই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানের সব রকম খরচ তখন কন্যার পিতা মাতাকে বহন করতে হয়। বিয়ের পর ঘর জামাই হয়ে ছেলে তার শ্বশুর বাড়িতে থাকে।

আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ে প্রচলন —

ছুছাং, সুংছাং, অর্থাৎ দুই তিন সিঁড়ি ব্যবধানের দূরত্বে যদি পিসতুতো বা মামাতুতো ঘরের ভাই-বোনের সম্পর্ক থাকে। ইচ্ছা করলে তাদের মধ্যে বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা পুনরায় আরও ঘনিষ্ঠ করা যায়। মগ সমাজে এই রীতি চালু আছে। এছাড়া বিধবা বিবাহ মগ সমাজে প্রচলন আছে। কোন স্বামীর স্ত্রী মারা গেলে পুনরায় যেকোন মেয়েকে সে বিয়ে করতে পারে। প্রয়োজনে স্ত্রীর বোন শালীকেও বিয়ে করা যায়।

পারিবারিক সংগঠন —

বৈবাহিক সূত্রানুযায়ীই মগদের পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রত্যেক মগ জনগোষ্ঠীদের পরিবারের কেন্দ্রস্থলেই বাবা মা থাকেন। পিতা-মাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে তাদের পরিবার। অত্যন্তরূপ প্রত্যেক গোষ্ঠী বা শাখার মধ্যেই সন্তানেরা পিতার গোষ্ঠী বা শাখার পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যারা ঘর জামাই ওঠে বিবাহ করে তাদের সন্তান সাধারণত মায়ের গোষ্ঠীর পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করে। প্রত্যেক পরিবারের সদস্যই অর্থনৈতিক কাজে, যথা - খাদ্য সংগ্রহ করা, খাদ্য শস্য উৎপাদন, বস্ত্র তৈরি, বাঁশ বেতের কাজ ইত্যাদি কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, পিতা-মাতার নেতৃত্বে যৌথভাবেই এ সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়। পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজে প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি পরিবারের কর্তা হিসাবে বাবাকেই করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাবার কর্মক্ষমতা হারিয়ে গেলে বা মারা গেলে মা এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মা বয়স হলে কিংবা বৃদ্ধ কিংবা অক্ষম হলে পরিবারের বড় ছেলে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সাধারণত তিন পুরুষ পর্যন্ত মগ জনগোষ্ঠীর যৌথভাবে একই পরিবারের বসবাস করে। তবে বর্তমানে এ ধরনের বড় পরিবারের সংখ্যা কম। মগ জাতিগোষ্ঠী সম্বন্ধ প্রাথমিকভাবে পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, নিজেদের বংশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। বেশিরভাগ নদীর ধারে সংঘবদ্ধভাবে দলনেতার অধীনে বসবাস করে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক :

মগ আদিবাসীদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক সাধারণত যৌথ পরিবারের নিয়ম অনুযায়ী প্রচলিত। একঘরে থাকা, একখানে খাওয়া, ঘুমানো সবক্ষেত্রেই স্বাভাবিক রেওয়াজে চলে। তবে পরিবারে আলাদা অন্যান্য দম্পতিদের জন্যও আলাদা থাকা অথবা কক্ষের ব্যবস্থা থাকে। মগ সমাজে প্রত্যেকস্ত্রীরা স্বামীকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে এবং মেনে চলে। অধিকাংশ পরিবারে স্ত্রীরাই

স্বামীর চেয়ে অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করে। তারা গৃহকর্ম অর্থাৎ ভাত রান্না করে খাওয়ানো, হাঁস, মোরগ, গরু, শূকর ইত্যাদি লালন-পালন, শিশুদের পরিচর্যা, কাপড় বোনা এইরূপ বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করে গৃহের বাইরে লাকড়ি জোগাড়, বাঁশ কাটা, জঙ্গল কাটা, ক্ষেতে ও জুমে চাষ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। অর্থাৎ ঘরে ও বাইরের কাজ উভয় ক্ষেত্রে মগ মহিলারা পারদর্শী। এই পরিবারে সবাইকে ঠিক মত সেবা করা এটাই তাদের কর্তব্য বলে মনে করে।

বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সম্পর্ক—

পরিবারের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নিয়মেই পিতার হাতে বর্তায়। এই নিয়ম যতদিন পিতার কর্মক্ষমতা থাকে ততদিন পর্যন্ত বজায় থাকে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে বিয়ের পর স্বনির্ভর বিবেচনায় ভিন্ন হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই ছেলেমেয়েরা নিজেদের কর্তৃত্ব সংসার চালায়। নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের বাড়িয়ে তোলার কাজ সমভাবেই বাবা-মা করে থাকেন। তবে যৌথ পরিবারে শিশুদেরকে ঠাকুরমারাও দেখাশোনা করে। এখানে উল্লেখ্য ব্যাপার এই যে, ছেলে সন্তানরা সাধারণত কিশোর বয়স থেকেই বাবার অধীনে জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, যথা-শিকার করা, বাঁশ বেতের কাজ, চাষাবাদ ইত্যাদি শিক্ষা নিয়ে থাকে। অপরদিকে মেয়েরা মার অধীনে থেকে, জল আনা, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা, রান্না করা, লাকড়ি আনা, কাপড় বোনা, চাষাবাদ, শিশুদের দেখাশোনা ইত্যাদি কাজকর্ম শিখে থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে বড়জনদের সম্পর্ক —

প্রায় সমাজেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ সামাজিক নিয়মানুসারে প্রচলিত। কোন পরিবারের স্বামী-স্ত্রীই তাদের বড়জনদের নাম ধরে ডাকেন না। বিশেষ করে শ্বশুর শ্বাশুড়ি, খুড়োখুড়ি বড় ভাই বড় বোন ইত্যাদিদের স্বামী-স্ত্রী উভয়রা সমীহ করেই চলে। প্রয়োজনের অধিক কথাবার্তা বলেন না। রান্না খাওয়া পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোন রকম ঝগড়া থাকলেও পরিবারের বড়জনদের বিশেষ করে স্বামীর বড় ভাই কিংবা স্ত্রীর বড় বোনদের ছোঁয়ার নিয়ম মগ সমাজে পরিলক্ষিত হয় না। তবে ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমারা সম্পর্কে বড় হলেও তাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা ও বাক্যালাপ হয়।

স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে ছোটদের সম্পর্ক :

পরিবারের ছোটদের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বড়জনদের সঙ্গে সম্পর্কের বিপরীত থাকে। স্বামীর ছোট ভাই ও বোন বা স্ত্রীর ছোট ভাই ও বোনদের সঙ্গে স্ত্রীর সহস্র বাক্য বিনিময়, হাসি-ঠাট্টা, হালকা কথাবার্তা ইত্যাদিরও বিনিময় হয়। স্ত্রী মারা গেলে অনেক স্বামী স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করে। আবার স্ত্রী জীবিত থাকাকালীনও শালীকে বিয়ে করার প্রমাণও পাওয়া যায়।

পোশাক পরিচ্ছদ —

অন্যান্য আদিবাসীদের মতই মগদের পোশাক পরিচ্ছদও অতি সামান্যই। মগ পুরুষেরা নিম্নোক্তের জন্য লুঙ্গি, খয়উ, জল কাংসা অর্থাৎ লুঙ্গি, ধুতি ও নিজেদের তৈরি গামছা এবং উচ্চাংগের জন্য রাংজি দিয়া (জামা বা সার্ট বিশেষ), পোছোঃ (নিজেদের বোনা চাদর) ব্যবহার করে থাকেন। গংবং (আঁচল জাতীয় পাগড়ী), পোছোঃ (চাদর)। অধিকাংশ বয়স্কদেরই নিজের তৈরি গংবং, রংমা (আঁচল জাতীয় পাগড়ী) ব্যবহার করতে দেখা যায়। বিশেষ করে পুরুষেরা বুদ্ধ

মন্দিরে যাওয়ার সময় ধুতি কিংবা লুঙ্গির সঙ্গে মাথায় গংবং নামক পাগড়ী বাঁধে। আধুনিক ছেলেরা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে অধিকাংশই পেণ্ট, সুট সার্ট ব্যবহার করেন বা পরিধান করেন।

মগ মহিলারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। তারা নিজের তৈরী রাং গাইং (বক্ষাবরণ) বুকো বাঁধেন। মেয়েরা প্রাক যৌবনে শুভদিনে বুদ্ধবেদীর সামনে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বুকো রাংগাইং বাঁধতে হয়। তারপর থেকে সে যুবতী বলে ঘোষিত হয় এবং রাংগাইং রাংজী অঙ্গি (ব্লাউজ), রংমা (আঁচল), থাবিং (পাছড়া), লুঙ্গি ইত্যাদি ব্যবহার করে। বয়স্ক মহিলারা অনেকে বুকো রাংগাইং (বক্ষাবরণ) বেঁধে রাখেন।

অলংকার :

অলংকারের মধ্যে মহিলারা কানের যারী (ফুল ও পাতা দিয়ে তৈরি) নাদং (গোলাকার আকৃতি বিশেষ) নাসাইং (দুল) নাবোত্তয়ং (কান পাশা) পরেন। হাতে কনুই-এর উপর 'দাইং' নামক অলংকার পরে থাকেন। হাতে - লাকউ আতোং (বালা) চুলা লাকউ (খণ্ড বিশেষ বালা), লাকউ আত্রোয়ী (চিকন চুড়ি) থ্রীমা লাকউ ইত্যাদি আঙুলে ও লাকচোয়ে অর্থাৎ আংটি পরে। গলায় - পাদী (পুতির মালা, হাইংদ্রোস্সী, (কামরাস্পা আকৃতি ছোট মালা), হ্রোয়ীফ্রোংসী (কোমর আকৃতি সোনার মালা), টেংগাসীং (টাকার মালা) ইত্যাদি পরিধান করে। কোমরে - খাগ্রো (রূপা বা সীসার তৈরি কোমর বিছা, খোঁপায় - ছাইংগ্যাং, (খোঁপার কাঁটা), ছাইং বোত্তয়ং (চুলের ফুল), লাইংব্রীং ছাইংগ্যাং (চেইনসহ ফুল), ওয়াফ্রী - খোঁপার জন্য চিরুনি, পায়ে ছোলে (নুপুড়) কথ্যাং, (খাড়ু) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের অলংকার পরতে ভালবাসে। মাথার চুল ও খোঁপায়, কোমরে, হাতে ও পায়ে বেশির ভাগ রূপা দিয়ে তৈরি গয়না ব্যবহার করে। আর উভয় ধাতু দিয়ে গড়া গয়না পরে। মগ পুরুষেরাও অনেকে কানের নাবোত্তয়ং-সো ও আঙুলে লাকচোত্তয়ে (আংটি) পরতে ভালবাসে।

বয়স্কদের মধ্যে উল্লিখিত পোশাক অলংকারের ব্যবহার দেখা গেলেও আধুনিক মেয়েদের মধ্যে, সে-ধরনের পোশাক ও অলংকারের ব্যবহার খুব কমই নজরে পড়ে। আধুনিক মেয়েরা বিভিন্ন ডিজাইনে নকসা করা ও ছাপানো লুঙ্গি পরেন। আংঙ্গিবা বিদে রাংজি (ব্লাউজ) ছাড়াও বিভিন্ন ডিজাইনের লুঙ্গির সাথে মেচিং করা টপ ব্লাউজও ব্যবহার করতে দেখা যায়। শহরাঞ্চলে অনেকে শাড়ি ও সালায়্যার কামিজ ব্যবহার করতে দেখা যায়। কোমরে, খোঁপায় ও পায়ে ভারী ওজনের অলংকার ব্যবহার তারা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। আজকাল প্রায় সকলে আধুনিক ডিজাইনের হাক্সা ওজনের গয়না পরতে ভালবাসে।

খাদ্য ও পানীয় :

সাধারণত মগ আদিবাসীরা আরামপ্রিয় এবং ভোজনবিলাসী। তবে তাদের পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সংগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই খাদ্যাভাস গড়ে উঠেছে। মগেরা সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা চব্বিশ ঘণ্টায় তিনবার খেয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য, ভাত তাদের প্রধান খাদ্য। তরকারী হিসাবে বাঁশ কুড়ুল, গুহের ও বনের আলু, বিভিন্ন রকমের শাক সজি, মাছ গৃহপালিত পশু ও বন্য

পশুপাখির মাংস, শামুক, বিনুক, সোনা ব্যাঙ ইত্যাদি খেয়ে থাকেন। (প্রধানত সেদ্ধ, পোড়া, সেকাঁ) তারা আপ্রাই, আপ্রো (সেদ্ধ) আফোউ (পোড়া) আকাং (সেকাঁ) আথোঃ (গুদক) আহুঃ (ভাজা) লাকসু (ভর্তা) আখ্যা, চাখ্রই, (সোদা বা খারপান দিয়ে তরকারী) ছাইং হঃ (চালের গুঁড়া দিয়ে তরকারী) ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে রান্না করে তরকারী খেতো।

১। আপ্রো— (সেদ্ধ) ভাতের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের সেদ্ধ তরকারী খেতে ভালবাসে। তবে এই আপ্রো মরিচ ভর্তা দিয়ে ভাতের সঙ্গে খায়।

২। আপ্রাইং — সুটকি, লবণ, প্রয়োজনে রসুন দিয়ে যেকোন সজ্জি তরকারীকে সেদ্ধ করা হয় তাকে বলে আপ্রাইং। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আপ্রাই, চাখ্রই ছাইংহুঃ রান্না করলে সঙ্গে মরিচ ভর্তা দিয়েই খাওয়া হয়।

মরিচ ভর্তা প্রথমে শুকনা কিংবা কাঁচা মরিচ ও সিদলকে কয়লার আগুনে পুড়িয়ে নিতে হয়। তারপর মরিচ পাটাতে অথবা বাতির মধ্যে নিয়ে পরিমাণ মত লবণ, পেঁয়াজ বা রসুনসহ পিষিয়ে মরিচ ভর্তা তৈরি করা হয়।

আথো (গুদক) :

যেকোন কাঁচা তরকারীগুলিকে কুচিকুচি করে কেটে একটি কচি বাঁশের চোঙ্গে লবণ কাঁচা মরিচ ও শুটকি দিয়ে তার উপরে পরিমাণ মত জল ঢেলে দেয়া হয়। তার চোঙ্গার মুখ ভাল করে কলা পাতা দিয়ে বন্ধ করে জ্বাল দেওয়া হয়। আগুনের তাপে গরম হয়ে চোঙ্গের তরকারী ফুটতে ফুটতে মুখ বন্ধ করা পাতা উপরের দিকে ঠেলতে থাকলেই বোঝা যাবে তরকারী সেদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর চোঙ্গটিকে ঠান্ডা জায়গায় সরিয়ে আরেকটি ছোট অথচ শক্ত বাঁশের ডাঙা দিয়ে (থো সাইং) ভিতরের তরকারীগুলিকে গুঁড়া করা হয়। প্রয়োজনে জুমের সং, নোংসো ইত্যাদি মশলা জাতীয় পাতা দেওয়া যায়। অনেকে এই গুদকে চিংড়ি, কাঁকড়া ছোট মাছ ইত্যাদি দিয়ে খায়। কচি মোরগের মাংসকে এই পদ্ধতিতে রান্না করলে সুস্বাদু হয়। তবে কাঁচা লংকা হলুদ লবণ মাংসের বেলায় আদা পেঁয়াজ রসুন দিয়ে গুদক রান্না করতে হয়।

বর্তমানে গুদক রান্নার পদ্ধতিরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাঁশ পরিবেশ থেকে যারা দূরে থাকেন তারা চোঙ্গার পরিবর্তে ডেকে বা কড়াইতে তরকারী, লবণ মরিচ ও শুটকি দিয়ে সামান্য জল মিশিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়। পাত্রের উপরে ঢাকনা দেওয়া হয়। তরকারী সিদ্ধ হয়ে গেলে পেঁয়াজ কুচি ও প্রয়োজনে ছুসে বা সং (জুমের মশলা) দিয়ে কাঠের ঘুঁটনি দিয়ে পিষে, মিলিয়ে দেওয়া হয়।

চাখ্রঃ

এর স্থানীয় বাংলা নাম, ক্ষারপানি। প্রথমে বাঁশ পোড়া কয়লাগুলিকে বেতের তৈরি তিন কোণা বিশিষ্ট একটি পাত্রে নিয়ে উপর দিক থেকে জল ঢালা হয়। ছাই কয়লার সাথে সেই জল মিশে ক্ষার তৈরি হয় এবং ঐ ক্ষার জলই তরকারীর ঝোল হিসাবে কাঁচা তরকারীর সাথে মিশিয়ে জ্বাল দেয়া হয়। বলা বাহুল্য লবণ, মরিচ ও শুটকি সব পদ্ধতির রান্নাতেই প্রযোজ্য। তবে যারা নিরামিষ খেতে পছন্দ করে তারা শুটকি মাছ ছাড়া সব রকম তরকারী রান্না করে খায়। বিশেষ

করে শক্ত বা শুকনো তরকারীগুলিকেই চাপ্ত রান্না করা হয়। বর্তমানে অনেকেই বাজার থেকে সোজা সংগ্রহ করে ক্ষার জলের অভাব পূরণ করে থাকেন।

জ্বরৌশ্বেং (ঝোল) :

কড়াই-এর ভিতর পরিমাণ মত জল, সিদল ও কাঁচা লঙ্কা চিরে দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। জল ফুটে উঠলে কাঁচা তরকারী কেটে ধুয়ে ফুটন্ত ঝোলে ছেড়ে দেবে। তরকারী সিদ্ধ হলে রুচি মত রসুন বা পেঁয়াজ দিয়ে নামিয়ে ভাতের সাথে খাওয়া চলে। কাঁচা তরকারি ছাড়া অনেক সময় পরিমাণ মত জলে বাঁটা মরিচ, লবণ ও শুটকি দিয়ে সামান্য ঝোল রেখে পেঁয়াজকুঁচি দিয়ে সেদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতির রান্নাকে গুরুচী হাং বলা হয়।

ছাইংহুঃ (পিঠালী) :

কাঁচা তরকারী কেটে, লবণ ও শুটকি ও পরিমাণ মত জল কড়াইতে দিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়। তরকারী সেদ্ধ হয়ে গেলে ভিজানো আতপ চাল বেটে তরকারীতে ঘুলিয়ে দেওয়া হয়। নামানোর আগে রসুন ছেঁচে দিয়ে ছাইংহুঃ রান্না করা হয়। আবার ছাইংহুঃ পরিবর্তে আবার ছাইংলুহঃ ও খাওয়া যায়। ছাইংহুঃ হলো ভাজা করা আতপ চালকে গুঁড়ি করে তরকারীতে দেওয়া হয়। আরেকটি কড়াইতে সরষে তেল গরম করে রসুন ছেঁচে দেওয়া হয়। রসুন লালচে হলে ছাইংহুঃ ঐ কড়াইতে ঢেলে দেওয়া হয়।

লাক্সু (ভর্তা) :

যেকোন কাঁচা তরকারীকে প্রথমে সেদ্ধ করে জল নিংড়ে নিতে হয়। তারপর পিঁয়াজ, মরিচ ভর্তা ও লবণ সঙ্গে মিশিয়ে মেখে ভর্তা তৈরি করা হয়। তিল ভেজে গুঁড়া করে ভর্তার সঙ্গে মেখে দিলে খেতে সুস্বাদু হয়। অনুরূপ সেদ্ধ অথবা সেকঁকে মাছ, মাংস ভর্তা করে খাওয়া যায়। এছাড়া কতকগুলি সবজি আছে যা কাঁচাই ভর্তা করে খায়। যেমন - শশা, খিড়া, আনারস, আম, পেঁপে, কলমী শাক, থানবুনিপাতা, ধন্যা, কঁচি হলুদ পাতা, আদা পাতা ইত্যাদি।

আফোড়ি (পোড়া) :

পুড়ে খাওয়া সম্পূর্ণ আদিম পদ্ধতি। মাছ, মাংস, আলু পুড়ে খাওয়ার অভ্যাস এখনও উপজাতিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও আলু, বেগুন, করলা, টমেটো ইত্যাদি পুড়ে ভর্তা তৈরি করে খাওয়া যায়। বিশেষ করে ভর্তা করার পদ্ধতিতে মরিচ ও শুটকি অবশ্যই পুড়িয়ে দিতে হয়।

আকাং (সেঁকা) :

সেঁকে খাওয়াও আদিম পদ্ধতির অন্যতম। বিশেষ করে মাছ ও মাংস সেঁকে নিয়ে ভর্তা করে অথবা পুনরায় লবণ, হলুদ মরিচ দিয়ে রান্না করে খাওয়া যায়। পদ্ধতি—

প্রথমে লাটি, মাগুর, শেল ইত্যাদি মাঝারি আকারে মাছকে আস্ত ভাল করে কেটে ধুয়ে নিতে হবে। আকারে বড় হলে মাছের গায়ে একটু হালকা করে চামড়ার উপর কেটে দিতে হয়, মাছে গায়ের ভিতরেও ভাল পাক হয় বা সিদ্ধ হয়। তারপর মাছের গায়ে লবণ মেখে একটি শিকের মধ্যে গোঁথে নিয়ে কয়লার আগুনে সেঁকে নিতে হবে। মাছ সিদ্ধ হয়ে আধা মচ্ মচ্ ভাব

ধরলে নামিয়ে কাঁটা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরা করে একটা পাত্রে নেওয়া হবে। তারপর কাঁচা মরিচ পুরে আদা দিয়ে বেটে নেবে। টুকরো টুকরো করা সেকা মাছ, মরিচ বাঁটা, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, ধন্যপাতা, সামান্য লেবুর রস দিয়ে মেখে মাছের ভর্তা তৈরি করা হয়। এই ভর্তা খেতে খুব সুস্বাদু। একই পদ্ধতিতে সেকা মাংসকেও ভর্তা করে খেতে মগরা খুব ভালবাসে। ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের বেশি মাছ পাওয়া গেলে মাছগুলিকে কুটে ভালকরে ধুয়ে নিয়ে বড় বড় চালুনের মধ্যে বিছিয়ে চুলার আগুনের উপর ঝুলিয়ে সেকঁকে নেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে সেকা মাছ দীর্ঘ দিন ধরে খাওয়া চলে। এর নাম গুগ্গিউ। অধিক পরিমাণে শুকর, হরিণের মাংস পেলে বড় বড় টুকরো করে কাঠির মধ্যে গাঁথে সেকঁকে চুলার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। অথবা মাংস ঠিকভাবে শুকিয়ে গেলে কোন পাত্রে ঢুকিয়ে দীর্ঘদিন রাখা যায়। যখন খুশি মাংসগুলিকে পরিমাণ মতো নিয়ে কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর ভেজানো মাংসগুলিকে ছোট ছোট টুকরো করে - লবণ, হলুদ, মরিচ, আদা, পেঁয়াজ দিয়ে পুনরায় রান্না করেও খাওয়া যায়। এই পদ্ধতি আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গেলেও মাংসাদির বেলায় 'সিক' গাঁথে রেখে খাওয়ার পদ্ধতি চোখে পড়ে। মগদের আর ১টি প্রিয় খাবার হলো 'গুগ্গি' - গু-অর্থ মাছ, গুগ্গি-অর্থ-পিষিয়ে গুড়া করা, সজ্জি, তরকারিতে দিয়ে রান্না করা যায়। বাঁশ কুড়ুল, মুলা, বিচি ছাড়িয়ে সিম, বাঁধাকপি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শাকসবজিও ছোট ছোট টুকরো করে কেটে শুকিয়ে রাখার রেওয়াজ এখনও মগ সমাজে প্রচলিত আছে।

আল্‌হঃ (ভাজা) :

বহুকাল আগে থেকেই মগ জাতির প্রকৃতিপ্রদত্ত তেল দিয়ে বিভিন্ন রকম মাছ, মাংস, তরিতরকারি ভাজা করে খেতে শিখেছে। যেমন শুকরের তেল ভাজা করলে গরম ভালভার মত তরল হয় তখন সেই তেলকে কোন পাত্রে জমিয়ে রাখা হয়। মাছ, মাংস, সবজি যেকোন সময়ে ভাজা করে খাওয়া হয়। মরিচ, হলুদ, লবণ দিয়ে রান্না করে খাওয়া যায়। চালের গুঁড়া পিঠা, শুকরের তেলে ভাজা করে খেতে সুস্বাদু। এছাড়া মাছের তেল কাঁকড়ার তেল দিয়েও আল্‌হঃ (ভাজা) করে খাওয়া যায়।

ফলের বিচি দিয়ে তরকারি :

মগ জাতির বিভিন্ন রকম ফলের বিচি বেটে তরকারিতে দিয়ে রান্না করে খেতে ভালবাসে। যেমন পাকা বহেরাকে কেটে বিচি বের করে নিয়ে শিলনুড়াতে বেটে নেওয়া হতো। টাটকা মাছ, ভাজা করে নিয়ে শুকনো মাছ বা ডিম ইত্যাদি যেকোন তরকারি, লবণ, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ দিয়ে বাটা বহেরা বিচি জল দিয়ে ঘুলিয়ে একটা পাত্রে কিংবা করাইতে নিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়। তরকারি সিদ্ধ হয়ে জল শুকিয়ে আসলে ধন্যপাতা দিয়ে নামিয়ে রাখা হয়। অন্য পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ ছেড়ে দিয়ে রান্না করা তরকারিতে ঢেলে দেওয়া হয়।

ঐ একই রকম পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণগাছী (বেড়ন গাছের পাকা ফলের বিচি) ফোরোংচী, (মিষ্টি কুমড়োর বিচি), স্যাসাচী (পাকা শশার বিচি) নোয়ী ছোট্টী (লতায় ধরে এক জাতীয় ফলের বীজ) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ফলের বীজ বেটে নিয়ে তরকারির সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করে খাওয়া যায়।

এছাড়া আছে, সরষে দানা, তিল, রায় শাকের বিচি, মূলার বিচি ইত্যাদি বেটে তরকারির সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করে খাওয়া যায়।

মগ ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে জুমে কিংবা ক্ষেতে উৎপাদিত নিজস্ব কতকগুলি মশলা তরকারির সঙ্গে ব্যবহার করে খায়। যেমন সং— এটি পুরোপুরি ধন্যা গাছ বা পাতার মতো দেখতে তবে গন্ধ আলাদা ধরনের। নোহস্যে— দেখতে তুলসী গাছের মত স্বাদ ও গন্ধ পুরো বিপরীত। এছাড়া আছে আদা ও আদা পাতা, কচি হলুদ পাতা ইত্যাদি।

(বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের রান্না মগ জাতির নিজেদের আয়ত্তে এনেছেন।)

টক :

মগ জাতিদের মধ্যে টক খাওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

সারাক্ষী পোংরে : কাঁচা আমকে কয়লার আগুনে পুড়িয়ে নেয়া। আম সিদ্ধ হয়ে গেলে ঢুলা থেকে বের করে ধুয়ে একটা পাত্রে রাখা হয়। তারপর গুপী (শুটকির গুঁড়া) অথবা সিদল ও শুকনা মরিচ কয়লার আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর এটি পরিষ্কার পাত্রে পোড়া শুটকি, মরিচ, লবণ নিয়ে মেখে পরিমাণ মতো জল ঢেলে দেওয়া হয়। পোড়া আমের খোসা ছাড়িয়ে ঐ জলে খুলিয়ে দিয়ে 'পোংরে' বা আম টক তৈরি করা হয়। কাঁচা তেঁতুলকে আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে একই পদ্ধতিতে টক তৈরি করা হয়।

দাগাপোং (মেস্টা জাতীয় গাছের টক পাতা ও ফল) :

কাঁকড়া কিংবা যেকোন ধরনের মাছ কেটে ধুয়ে, কাঁচা হলুদ পরিমাণ মত বেটে নিয়ে পরিমাণ মতো কাঁচা মরিচ চিড়ে নিয়ে লবণ ও পরিমাণ মতো জল একটি পাত্রে নিয়ে সিদ্ধ করা হয়। জল ফুটে উঠলে একটি পেঁয়াজ কুঁচি কুঁচি করে মাছের ঝোলে দিয়ে দেবে। মাছ সিদ্ধ হয়ে গেলে দাগা পোং (টক পাতা অথবা ফলের উপরের অংশ) দিয়ে নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নেবে। তারপর অন্য একটি কড়াই এ সরষে তেল দিয়ে গরম করবে। তেল গরম হলে রসুন ছেঁচে ফোড়ন দেওয়া হয়। রসুন লালচে ভাব ধরলে মাছের ঝোল ঢেলে দেবে। প্রয়োজনে ঐ টকে শুকনা মাছ বা শুটকিও দেওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে চালতা টক, কাঁচা আমের টক, তেঁতুল টক, টমেটো ইত্যাদি রান্না করে খাওয়া যায়।

এছাড়া বিভিন্ন ধরনের সবজি ও টক দিয়ে রান্না করে খাওয়া যায়। যেমন নাহাংপোং (বাঁশ কুড়ুলের টক), মূলা, বড়বটি, কচুছড়া ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়।

জাক্সাপোং (মোরগ মাংসের টক) :

প্রথমে মোরগ মাংসকে কেটে ধুয়ে নিয়ে কাঁচা হলুদ বাটা, আদা বাটা, কয়েকটা গোল মরিচ বাটা, পেঁয়াজ কুঁচি, লবণ ও পরিমাণ মতো জল একটি পাত্রে দিয়ে সিদ্ধ করতে হয়। মাংস সিদ্ধ হলে পরিমাণ মত যেকোন টক দিয়ে নামিয়ে রাখবে। অন্য আর একটি পাত্রে তেল গরম করে রসুন ছেঁচে ভাজা করে নিয়ে সিদ্ধ করা মাংসের টকে ঢেলে দেওয়া হয়। ঐ টক থেকে মাংসের টকরাগুলি তুলে নিয়ে ছোট ছোট করে টকরা করবে। তারপর কাঁচা মরিচ পুড়িয়ে আদা লহ বেটে নিয়ে সঙ্গে পেঁয়াজ কুঁচি দিয়ে মাংসের সঙ্গে মেখে ভর্তা তৈরি করা হয়। মাংস টকের

সঙ্গে মাংস ভর্তা খেতে সুস্বাদু হয়।

একই পদ্ধতিতে শূকর মাংসের টকও রান্না করে খাওয়া যায়।

আখ্যাউ :

টক, ভর্তা, গুদক ছাড়াও মগ জাতিরা বিভিন্ন ধরনের মাছ, মাংস, শাক সবজি, হলুদ লবণ, মরিচ, মশলা ইত্যাদি দিয়ে রান্না করে খায়। বর্তমানে নিত্য নূতন আধুনিক প্রাপ্য সমস্ত খাদ্য উপকরণই তারা খেয়ে থাকেন।

মোং পিঠা :

প্রাচীন কাল থেকে মগ গোষ্ঠীরা আলু সিদ্ধ ও চালের গুঁড়া দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করে খায়। শুধু পিঠা খাওয়ার জন্য সুস্বাদু জাতীয় ধান, বিল্লী ধানের চাষ করা হতো।

পিঠার মধ্যে কঙাংবং, যাগোউ বা ছাঁইগ্রো, কাইংদৌ মোং, ফাখাই মোং, ছাইস্ফঃ মোং, ছিলহ্ মোং, পইংজ্রায়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কঙাংবং :

বিল্লী চালকে আগেরদিন রাতে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর জল থেকে বিল্লী চালকে তুলে নিয়ে লবণ দিয়ে মিশিয়ে নেওয়া হবে। বিল্লী চাল কিংবা পিঠা ভাপে সিদ্ধ করার জন্য পাত্রে নিচের অংশ ছোট ছোট করে ছিদ্র করা থাকে। ঐ পাত্রে লবণ দিয়ে মিশানো ভিজা বিল্লী চালকে ভরিয়ে দেওয়া হবে।

আলাদা একটি পাত্রে জল দিয়ে ফোটানো হয়। সেই জল ফোটানো পাত্রের উপর বিল্লী চাল দেওয়া পাত্রটি বসিয়ে দেবে। উপরে পাত্রের মুখ ঢেকে দেওয়া হয়। লক্ষ্য করতে হবে নীচের পাত্রের ধোঁয়া যেন বাইরে না-গিয়ে সরাসরি উপরের পাত্রে উঠে যায়। মাঝে মাঝে চালগুলিকে নেড়েচেড়ে দিতে হয়। বিল্লী ভাত সিদ্ধ হয়ে গেলে কুড়ানো নারকেল ভাতের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে নামিয়ে দেওয়া হয়।

কদঃ মোং :

উপকরণ — কচি কলা পাতা, বিল্লী চালের গুঁড়া, গুড় অথবা চিনি, সামান্য পরিমাণে লবণ, কুড়ানো নারকেল।

পদ্ধতি— প্রয়োজন মতো চালের গুঁড়া, সামান্য লবণ, পরিমাণ মতো গুড় অথবা চিনি ও পরিমাণ মত কুড়ানো নারকেল সবকিছু এক সাথে মিশিয়ে নেওয়া হয়। তারপর কচিকলা পাতাকে টুকরো করে কেটে নিয়ে চোঙের মতো তৈরি করে সেই চোঙে মিশ্রিত গুঁড়া ভরিয়ে মুখ বেঁধে দেওয়া হয়। এমন করে সমস্ত মিশ্রিত গুঁড়াগুলিকে পাতার চোঙে ভরিয়ে ছোট ছোট আকারে পুঁটলি তৈরি করে বেঁধে নিতে হয়।

তারপর নিচের অংশ ছিদ্র করা আছে এমন একটি পাত্রে পিঠার পুঁটলিগুলিকে ভরিয়ে পাত্রের মুখ ঢেকে দেওয়া হয়। অন্য আর একটি পাত্রে অর্ধেক পরিমাণ জল নিয়ে আগুনের চুলায় বসিয়ে দেওয়া হয়। সেই ফুটন্ত জল পাত্রের উপর পিঠার পুঁটলি ভরানো পাত্রটি বসিয়ে দিয়ে জলের বাষ্পের সাহায্যে পিঠার পুঁটলিগুলি সিদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে খাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে

পিঠাকে বলা হয় কদঃ মোং।

খউপং মোং (সিদ্ধ পিঠা) :

আতপচালের গুঁড়া, চিনি, কুড়ানো নারকেল ও সামান্য লবণ দিয়ে একসাথে ভাল করে মিশিয়ে নেওয়া হয়। একটি বড় পাত্রে পরিমাণ মতো জল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হয়। ফোটানো জলের পাত্রে মুখে মাঝখানে ছিদ্র করা এমন একটি ঢাকনা দেবে। তারপর মিশ্রিত চালের গুঁড়োকে ছোট একটি বাটিতে ভরিয়ে নিয়ে পাতলা একটি ছোট কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে জল ফুটন্ত পাত্রে ঢাকনার ছিদ্রটির উপর বাটিটাকে উপুড় করে বাসিয়ে দেয়া। কিছুক্ষণ পড়ে পিঠা সিদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নেবে। বাটি থেকে সিদ্ধ পিঠাকে তুলে নিয়ে আবার মিশ্রিত চালের গুঁড়ো বাটির মধ্যে ভরিয়ে নিয়ে পুনরায় পদ্ধতিতে সিদ্ধ করে নিতে হয়।

মগ ভাষায় এই পিঠাকে খউপং মোং বলা হয়।

ক্যাংদৌ মোং (চোঙা পিঠা) :

বিমী অথবা যেকোন আতপ চালের গুঁড়া, চিনি বা গুড়, কুড়ানো নারকেল ও সামান্য পরিমাণে লবণ এক সঙ্গে মিশিয়ে ছোট ছোট কচি বাঁশের চোঙায় ভরিয়ে নেওয়া হয়। তারপর কলাপাতা দিয়ে চোঙার মুখ বন্ধ করে নিয়ে আগুনে পুড়ানো হয়। ঠিকমত পোড়া হলে চোঙা থেকে পিঠা বের করে খাওয়া যায়। এই পিঠাকে মগ ভাষায় ক্যাং দউমোং বলা হয়।

ছাইসফঃ মোং :

বিমী চালকে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে জল বারিয়ে গুঁড়া করে নিতে হয়। কুড়ানো নারকেল, গুড় বা চিনি দিয়ে মিশিয়ে ভাজা করে নিতে হয়। তারপর চুলাতে কড়াই বসিয়ে দিয়ে কড়াই গরম হলে চালনের মধ্যে এক মুঠো চালের গুঁড়া নিয়ে কড়াই মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। চালের গুঁড়া রুটির মত হয়ে গেলে তুলে নিয়ে সেই গরম শুকনা রুটির মধ্যে নারকেল পুর দিয়ে পাটির মত গুটিয়ে নেবে। গরম গরম এই পিঠা খেতে খুব সুস্বাদু। মগ ভাষায় এই পিঠাকে বলে ছাইসফঃ মোং।

জিহুঃ মোং :

বিমী চালের গুঁড়া, চিনি ও কুড়ানো নারকেল মিশিয়ে ছোট ছোট আকারে লুচির মত তৈরি করে তেলে ভাজা হয়। এই পিঠাকে ছিলহঃ মোং বলে।

পইংজ্জা :

পইংজ্জা শব্দের অর্থ প্রাপ্তিযোগ। নবগৃহে প্রবেশে, মগ জাতিদের পইংজ্জা পিঠা একটা বিশেষ পিঠা বিশেষ দিনে বিশেষ অনুষ্ঠানে তৈরি করা হয়। চালের গুঁড়াগুলি ভালভাবে মেখে ছোট ছোট গুল্লি আকারে তৈরি করা হয়, আবার নারকেলের পুর ভরিয়ে ছোট ছোট বিনুকের আকারেও তৈরি করা হয়। তারপর পাত্রে দুধ জ্বাল দিয়ে গরম করে নিতে হয়। দুধ গরম হলে তৈরি করা গুল্লি, অর্ধচন্দ্র পুলি ছেড়ে দেওয়া হয়। গুল্লি আকারে পইংজ্জা সিদ্ধ হয়ে গেলে কিছু গুঁড়া কুড়ানো নারকেল ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে পইংজ্জা তৈরি করে। এছাড়া আছে ওয়াহীসামোং। ফাউখে মোং, রি-বং মোং ইত্যাদি।

বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতেও বিভিন্ন ধরনের রুচিসম্মত খাবার তৈরি করে মগরা খেয়ে থাকেন।

ধূমপান :

প্রায় অর্ধেকাংশ মগ জাতিরা ধূমপানে অভ্যস্ত। নারী, পুরুষ নির্বিশেষে অন্যান্য উপজাতিদের মতই তারা ধূমপান করেন। প্রত্যেকের ঘরেই বাঁশের তৈরি হুঁকা থাকে। কাজের ফাঁকে বিশ্রামের সময় তারা ধূমপান করেন। বিভিন্ন প্রকার আলাপের সময়, বিবাহ উৎসব ও দেবদেবীর পূজা-পার্বণে ধূমপান তাদের অপরিহার্য। বন্ধু-বান্ধব কিংবা ঘরে অতিথি এলে প্রথমেই তারা হুঁকায় ধূমপানের অভ্যর্থনা জানান ও তারসাথে পান সুপারিও সাজিয়ে দেওয়া হয়। শুকানো নেশা জাতীয় সাদা পাতাকে সিগারেট আকারে পৌঁচিয়ে নিয়ে মগ জাতিরা ধূমপান করতো। তবে বর্তমানে অনেকেই বাজারে প্রাপ্ত বিড়ি, সিগারেট কিনে খাচ্ছেন।

পানীয় :

মগরা চা পান করতে খুব ভালবাসে। প্রাচীনকালে জঙ্গলে প্রাপ্ত কাংমোয়ে পোং আগ্রোয়ায়েং (সিকাকাই নামক এক ধরনের কচিপাতা), ডাংগ্যাটা (একধরনের শুকনোবিচি), গুচীহ্রাং নামক এক ধরনের লতাগাছ ইত্যাদি ফুটন্ত জলে দিয়ে মগরা কালো কিংবা সবুজ রঙের চা পান করতো। এইগুলি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসম্মত ছিলো। কিন্তু বর্তমানে বাজারে প্রাপ্ত চা পাতা ও দুধ দিয়ে চা পান করে থাকেন।

মগ জনজাতিরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও অনেকে অন্যান্য দেবদেবীদের পূজা করে থাকেন। দেবদেবী পূজাগুলির মধ্যে বিশেষ করে খ্যাংস্যাংমা নদীরদেবী ও ইংনে (গৃহদেবতা) পূজা করার প্রাক্কালে মদ্য প্রদান করার বিধান আছে। তবে আজকাল ঐ সব প্রথা প্রায় লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিবাহ অনুষ্ঠানেও মদ্য প্রদানের রীতি রেওয়াজ আছে। এছাড়া মদ্য পান করে কেউ যদি মাতলামি করে সমাজে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার বিধান আছে। অনেক শিক্ষিত ছেলে মদ্যপানের কুফলতার প্রত্যক্ষ ফল, সমাজে প্রতিফলিত হওয়ার কারণেও মগ সমাজ থেকে মদ্যপান ক্রমশ দূরীভূত হচ্ছে।

আর্থ - সামাজিক জীবন

অন্যান্য উপজাতিদের মত মগ আদিবাসীরাও বংশ পরম্পরায় প্রাকৃতিক পরিবেশে লালিত ও বর্ধিত। তাই তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও গড়ে ওঠে প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। প্রকৃতির সবুজ বনানীর গভীরেই সমৃদ্ধ থাকে তাদের অর্থ। তাদের খাদ্য সংগ্রহ বা আহরণের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপও তাই প্রকৃতির উন্মুক্ত ধন ও পাহাড়কে ঘিরেই। প্রধান খাদ্য থেকে আরম্ভ করে ফল মূল জাতীয় আনুষঙ্গিক তাদের অধিকাংশ খাদ্যই বন থেকে আহরিত। নিজের কায়িক পরিশ্রমের উপর ভিত্তি করে যা কিছু জুম কৃষির মধ্যে উৎপাদন হত তাই পরিবারের এক বৎসরের রসদ হয়ে যেত। বন পাহাড়কে ঘিরে তারা যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তোলেন তাতে প্রত্যেকেই স্বনির্ভর থাকেন।

এই স্বনির্ভরতাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

ক) খাদ্য উৎপাদন :

অন্যান্য আদিবাসীদের মতই মগ সম্প্রদায়রা যে- প্রথায় খাদ্য উৎপাদন করে থাকেন সেই প্রথাকে “জুম” বলা হয়। মগদের ভাষায় সেই প্রথার নাম “য়াঃ”।

জুম চাষের পদ্ধতি (মাংস লোউ চাষাং) :

জুম চাষ সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এর জন্য সময়কাল -বৎসরের প্রাকৃতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই জুম চাষ আরম্ভ করতে হয়। জুম চাষে প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত জুমিয়ারা নানাবিধ সংস্কার পালন করে থাকেন।

জায়গা নির্বাচন :

প্রথমে পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক গৃহকর্তা ঘুরে ঘুরে জুমের স্থান নির্বাচন করে নেন। নির্বাচিত স্থানে কোন দোষ আছে কি না অথবা কোন অশুভ অভিযোগ আছে কি না তা যাচাই করে দেখতে হয়। কোন রকম ঝগট না থাকলে পরিবারের সকলের মত নিয়ে উক্ত স্থানটি দখলাধীনস্বরূপ একটি চিহ্ন বসিয়ে দেওয়া হয়। একটি ওয়া (বাঁশের মাথায় আড়াআড়ি ‘ক্রস’ চিহ্নের মত আরও দুখণ্ড বাঁশ এঁটে তৈরি) পুঁতে রাখা হয়। যাতে অপর কেউ এসে তার নির্ধারিত স্থানটিকে দখল করতে না পারে। এই স্থিতি গেড়ে দিলেই সবাই জেনে গেল ঐ স্থানে কোন ব্যক্তির দ্বারা কুক্ষিগত হয়ে গেছে। সমস্ত জুমিয়ারা এই বিধি নির্দিধায় মেনে চলেন।

অতঃপর পরিবারের গৃহকর্তা ঐ দখলাকৃত জুম ক্ষেতের স্বল্প মাটি একটি কাঁচা বাঁশের চুদাতে ভরে ঘরে নিয়ে এসে বালিশের নীচে চেপে রাখিতো ঘুমাতে হত। এরাত্রি স্বপ্নে যদি চাষের ফলপ্রসূ স্বরূপ শুভ ইঙ্গিত দৃষ্ট হয় তা হলে সেই স্থানে জুমে নিরানির বা জঙ্গল কাটা শুরু করে দিত। স্বপ্নে অশুভ ইঙ্গিত দেখা দিলে ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্য জুম ক্ষেত পছন্দ মত পাহাড়ের

সন্ধান করে নিতে হয়। প্রসঙ্গতঃ তৎকালে সমাজে বিশেষ কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, যে জুমের হাওয়ার দোষে জুমিয়া পরিবারের যেকোন ব্যক্তির মধ্যে রোগগ্রস্ত বা অনেক কিছু ক্ষতিসাধন হতে পারে। অনেক সময় পরিবারে যেকোন ব্যক্তির উক্ত কারণে মৃত্যু ঘটে থাকে। তথাকথিত ভাষায় জুম চাষের পরিপ্রেক্ষিতে নানারকম ক্ষতি স্বীকার করাকে মগ ভাষায় বলা হয় ‘য়া’ ফাইন জাইতে। অর্থাৎ জুমের দোষে রোগের শিকার বলে নির্ণয় করা হত। তাই মগ সম্প্রদায়রা অনেক চিন্তা ভাবনা করে জুম ক্ষেতে হাত দেয়। তাই অনেকে একটি মোরগ অথবা এক জোড়া ডিম বলি দিয়ে জুমদেবীকে পূজা করে সন্তুষ্ট করা হয়। ওঝার বিচারে বন দেবতা সন্তুষ্ট হলে জুম চাষ করা যায়, অন্যথায় আবার জায়গা পরিবর্তনের প্রশ্ন দেখা দেয়।

জঙ্গল বা জুম কাটা :

সাধারণত চৈত্র মাসের প্রথম ভাগেই জুম কাটা বা জঙ্গল কাটার কাজ শুরু হয়ে যায়। মগ ভাষায় তাকে বলা হয় যাঃ খোয়াইতে বা তঃ খোয়াইতে। বিশেষ করে জুম ক্ষেতে বাঁশ বন হলেই সবচেয়ে কৃষি ফলন বেশি হয়ে থাকে এবং জঙ্গল কাটতেও সুবিধা হয়। সাধারণত এই সব ক্ষেতেই জুমচাষের চর্চা হয়ে থাকে। বড় বড় গাছ বেতের বনে জুম ক্ষেত হিসাবে বাদ পড়ে যায়। জুমের সমস্ত বাঁশ ও ছোট ছোট গাছ কেটে পরিষ্কার করে এবং তাকে পোড়ানোর জন্য ছোট ছোট স্তুপ বানিয়ে শুকিয়ে রাখা হয়। বড় আকারে গাছগুলিকে ঠিক গোড়ায় না কেটে মাটি থেকে কিছু উপরে কাটা হয়। ঐ কাটা ঝোপ শুকিয়ে যাওয়ার পর আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হত এবং এই ছাই জুম ক্ষেতের সার - এর বিকল্পরূপে ফসলের উৎপাদনকে আরও বেশি সহায়তা করে।

এইভাবে জুম ক্ষেতটি পুড়ে দন্ধ হয়ে গেলে দুই-তিন দিনের পরে উক্ত ক্ষেতে আবার সপরিবারে যেটা অগ্নিদন্ধ হয়নি বা বাদ পড়ে গেছে, এই সব বড় আকারের গাছের টুকরাগুলিকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। বাকি অদন্ধ টুকরাগুলিকে আবার জমা করে পুড়িয়ে জুম পরিষ্কার করতে হয়। এই জুম পরিষ্কার করাকে মগ ভাষায় বলা হয় “ত্রোয়েং লোংরে”। আবার আধপোড়া টুকরাগুলিকে এক এক জায়গায় জড়ো করে জুম এলাকা চাষোপযোগী করা হয়। সেই সমস্ত আধপোড়া টুকরাগুলির আবার লাকড়ি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

টংঘর নির্মাণ :

তারপর এক শুভদিন দেখে বাঁশ দিয়ে বানানো হয় যাঃ চাং অর্থাৎ টংঘর। টংঘর বানানো শেষ হলে বিগত বছরের টংঘর ছেড়ে বাসা বদল চলে নতুন টংঘরে বা নতুন জুমের টংঘরে। এইভাবে বছরের পর বছর চলে এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে বাসা বদল।

শস্যরোপণ :

আগুনে দন্ধ বাকি জুমক্ষেত পুনরায় কাটা-নিড়া শেষ করার পর যখন জুমক্ষেতে বীজ রোপণের অনুকূলতা এসে যাবে তখন শুধু প্রাকৃতিক বর্ষণের প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হয়। এইভাবে জুম আবাদ ক্ষেতের উপযোগী হতে হতেই বৈশাখ মাস এসে পড়লে কিছু না কিছু বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকেই। বৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই তারা সপরিবারে জুম ক্ষেতে বীজ বপনের জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। নারী পুরুষ মিলিতভাবে দা কোমরে খউখ্যাঃ (বেতের তৈরি ছোট খাড়া বিশেষ)

বেঁধে বাম হাতে দাগোওয়ং (পুরানো দা বা নিড়ানি) নিয়ে সারি সারি এক দুই কোপ মাটিতে দিয়ে ডান হাত দিয়ে কিছু কিছু বীজ ফেলে দেয়। এই বীজ গুলির মধ্যে থাকে ধান, কার্পাস, তিল, চাল, কুমড়োর বীজ, মিষ্টি কুমড়োর বীজ, জোয়ার, কাউন, শশা, ধন্যা, মরিচের বীজ, বিনঈ ধানের বীজ ইত্যাদি।

যখন জুমের ফসল ক্রমে বৃষ্টি হয়ে মৃদু বাতাসে খেলতে থাকে তখন জুম নিড়ানির কাজের সময় হয়ে ওঠে, তাকে মগ ভাষায় বলা হয় “পং খোয়েতে”। পরপর দুই তিন বার আগাছা কেটে নিড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এতে ফসলের উর্বরতা এবং বৃদ্ধির পক্ষে খুবই সহায়ক হয়ে থাকে। শরতের প্রারম্ভে জুমের ধান পাকা শুরু হয়। ধান পাকার পূর্বে আবংমা পূজা দেওয়া হয়। বাড়িতে সবচেয়ে বড় খুঁটিতে বেঁধে ঐ সময় অনেকে মোরগ বলি দিয়ে থাকে। আবার কেউ বিম্বী ধানের খই, কলা, মিষ্টি, ফুল, ধূপ, বাতি দিয়ে তারপর জুম থেকে একগুচ্ছ ধান কেটে নিয়ে বাড়িতে ‘খংসদইন’ অর্থাৎ সবচেয়ে বড় খুঁটিতে বেঁধে দিয়ে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়।

শরতের প্রারম্ভে জুমের ধান পাকা শুরু হয়। ধান পাকার পূর্বে জুমক্ষেতে ‘আবংমা’ পূজা দেওয়া হয়। ঐ সময় অনেকে মোরগ বলি দিয়ে থাকে। আবার অনেকে বিম্বী ধানের খই, কলা, শুড়, ফুল, ধূপবাতি দিয়ে জুমে আবংমা পূজা দিয়ে থাকে। ধান কাটার আগে জুম থেকে এক গুচ্ছ ধান কেটে নিয়ে বাড়িতে ‘খংসদইন’ সবচেয়ে বড় খুঁটিতে ধানের ছড়িগুলি বেঁধে দিয়ে দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। তারপর ক্ষণে বৃষ্টি ক্ষণে প্রখর রোদ উপেক্ষা করে ফসল তোলার আনন্দে মেতে ওঠেন সমস্ত মগ জুমিয়ারা। ধান কাটার সময় ধানের গাছটা বাদ দিয়ে অর্থাৎ খড়টা বাদ দিয়ে শুধু ধানের ছড়িটা কেটে তুলে নিতে হয়, তাতে অল্প জায়গাতেই প্রচুর ধান মজুত রাখা যায়। তারপর এটাকে মাড়ায় করে ধান বৎসরের রসদ হিসাবে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। শুধু ধান নয়। জুমক্ষেত থেকে আমদানিকৃত ফল ও সব্জী বৎসরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়ে থাকে। এই ফসল ও পাকা সব্জীর মধ্যে যেমন - তিল, কার্পাস, মক্কা, চিমড়া, অরল, কুমড়া, চাল কুমড়া, নানান তৈল বীজ এবং মশলা জাতীয় দ্রব্যাদি। ৫-৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এই সব ফল মূল হচ্ছে যেমন শশা, কুমড়া, চালকুমড়া, আদা, ওলকচু, পাকা মক্কা আরও অনেক কিছু। ধান কাটার পর তিল ও কাউন ধান এইগুলি কাটা শুরু হয়। তারপর কার্পাস তুলা সংগ্রহের সময় এসে পড়ে। নূতন ধান পাওয়ার পরে কউসং চা পোয়ে (নবান্ন উৎসব) এর আয়োজন করা হয়। ঐদিন নূতন ধানের ছোয়াইং নবান্ন বুদ্ধ মন্দিরে নিয়ে পূজা করা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে দান করা হয়। তারপরে ঘরের লক্ষ্মীদেবীকে গৃহদেবী, জলদেবী, রান্নার উনুনে, কুড়াল নিড়ানী (দা গোওয়ং) দা, কোদাল, কাঁচি, টেকিতে নূতন ভাতের মোয়া ও তরি তরকারি ইত্যাদি কলা পাতায় সাজিয়ে দিয়ে পূজা করা হয়। মো নাইসা (বৃষ্টির দেবতা) লিনাইসা (পবন দেব), নিং নাইসা (সূর্য দেব) ইত্যাদি দেবতাদেরকে নব অন্ন দিয়ে পূজা করা হয়। পূজা শেষে আত্মীয়স্বজন পরিবার সম্মিলিত ভাবে আহার করা হয়।

আধুনিক সমতল চাষীদের সান্নিধ্যে এসে মগরা বর্তমানে বহুলাংশে কৃষি কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। বর্তমান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও পারিপার্শ্বিক আধুনিক পরিবেশকে ঘিরে

তারা প্রায় ধীরে ধীরে জুম চাষ ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এছাড়া জুম চাষের সেরকম পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গাও নেই বলে অনেকে বাধ্য হয়ে জুম চাষে বিরত থাকতে হচ্ছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, এক সময় ঘন আগাছা ও কাটা গাছ-গাছরাতি কেটে সমস্ত মগরা কৃষিযোগ্য সমতল জায়গা জোগাড় করে কৃষিকাজে মনোযোগ দিলেও অনভিজ্ঞতার কারণে কিংবা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে আজ অনেকেই ক্ষেত মজুর ও দিন মজুরে পরিণত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাদের এই পরিণতির জন্য গ্রাম্য সুদখোর মহাজনরাও অন্যতম দায়ী। অশিক্ষিত ও গরীব কৃষকদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চড়া সুদের টাকা দিতে দিতে এক সময়ে তাদের কৃষিযোগ্য জমি বেচতে বাধ্য করে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত জমিই মহাজনদের হস্তগত হয়ে যায়। ঐ সমস্ত কৃষকরা আজকাল বন থেকে বাঁশ, ছন, লাকড়ি যোগাড় করে সাংসারিক খরচ যোগানই তাদের একমাত্র সম্বল। আবার সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চল বেড়ে যাওয়ার ফলে এবং বাঁশ, ছন, গাছ, লাকড়ির দুপ্রাপ্যতা বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে তীর অর্থনৈতিক সংকটে ওদের দিন কাটে।

তবে বর্তমানে সরকার পঞ্চয়তের মাধ্যমে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে খোরাকি ঋণসহ বিভিন্ন ঋণ দিয়ে জুমিয়া ও উপজাতি দীনমজুরদের স্বনির্ভর করার চেষ্টা করছেন। এছাড়া স্বনির্ভর দল রেগা কাজ – এই বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

খাদ্য আহরণ :

প্রাচীন কালে মগ জনগোষ্ঠীরা তাদের খাদ্য প্রাচুর্য বনাঞ্চল-পার্বত্য ভূমি থেকে আহরণ করতে পারত বলে জানা যায়। আদিম কৃষি চর্চার সূচনা সেকালে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে হয়েছিল। কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাদ্য আহরণের পরিবর্তে এবং তার বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে জুম চাষের সূচনা। জুম কৃষির ফসলের দ্বারাই সেকালের উক্ত আদিবাসীদের খাদ্য আহরণ সমস্যা থেকে অব্যাহতি পায়নি, যা কিছু জুম ফসলের আমদানী হত তা সারাবছরের জন্য তা সংরক্ষণ যোগ্য নয়। তাই তরি তরকারি প্রয়োজন হলে আবার বনভূমি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। শাক সবজি, ফল মূল ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী জুমে উৎপাদন করলেও তা সীমিত সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। তাই বাকি সময়ে আবার খাদ্য আহরণ ছাড়া উক্ত গোষ্ঠীদের বিকল্প ব্যবস্থা ঐ সময়ে ছিল না। সাধারণত বনের শাক সবজি, ফলমূল মগ আদিবাসীরা আনুষঙ্গিক খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ করত। যেমন নাহাং বা ওয়াদুউ (বাঁশের কুড়ুল), প্রীং (কচু), গাইংকদউ (ঢেকিশাক), তঃ পীং (বন্য সিম), সউ (বন্য আলু), সপাং ছো (গাছের ওল), কাইফা ছো (মাটির ওল), ক্রীং এগ্যোয়াই (বেতের অগ্রভাগ), প্যারে (মধু), সঃসী উসী (নানান ধরনের বন্যফল) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শিকারের মধ্যে — গাঃ (মাছ), হাংসাঃ (মাংস) উল্লেখযোগ্য। কাজের অবসরে আশেপাশে যা কিছু সংগ্রহ করত তাই খাদ্যের আনুষঙ্গিক তরিতরকারির খাদ্য মিটিয়ে নিত।

শিকার :

মগ জনগোষ্ঠীরা প্রাচীন কালে তারা তাদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যৌথভাবে নিয়মিত শিকারে বেরোতেন এবং শিকারে প্রাপ্ত মাংস সবাই সমানভাবে ভাগ করে নিতেন। মগেরা শুধু মাংস আহরণের জন্য শিকার করেন না। অরণ্যে ঘেরা বসতিতে বন্য হাতি, বাঘ,

শিয়াল, বনবিড়াল ইত্যাদি পশুরা বিভিন্নভাবে অত্যাচার ও ক্ষতিসাধন করে থাকে। তাদের গৃহপালিত পশু যেমন হাঁস, মোরগ, শূকর, ছাগল, গরু ইত্যাদিদেরকে সুযোগ পেলেই বন্য পশুরা ধরে নিয়ে মেরে খায়। আবার জুম ক্ষেতে বন্য পশু-পাখিরা বিভিন্নভাবে ক্ষতিসাধন করে। এই সব অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্যও মগেরা শিকার করে থাকেন।

মগ শিকারের অন্যতম অস্ত্র হল লোহার তৈরি লাহুইং (বল্লম) এবং বাঁশের তৈরি ওয়াচফ্যা। চার-পাঁচটি বাঁশের একদিকে চোখা করে - ওয়াচফ্যা লাহুইং তৈরি করা হয়। কোন শিকার সামনে পড়লে লাহুইং বা ওয়াচফ্যা ছুড়ে মারা হয় এবং লক্ষ্য ঠিক মত হলে শিকারের শরীর তা শক্তভাবে বিদ্ধ হয়ে শিকার ধরা পড়ে। এছাড়া হ্লিঃ (তীর-ধনুক) ও তারা ব্যবহার করতেন। তাদের শিকার বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়।

দু-একজন দক্ষ শিকারীর অধীনে গ্রামবাসীরা একত্রে শিকারে বের হয়ে কোন বনাঞ্চলকে তারা শিকারের জায়গা হিসাবে বেছে নেন। কোন হিংস্র জন্তু জানোয়ার দ্বারা রাত্রে বসতি এবং গবাদিশালায় হানা দিয়ে পালিত পশু নিয়ে যায় এবং অনেক সময় মানুষের উপর হানা দিলে তা মানুষের মৃত্যুর কারণও হয়ে থাকে। বিশেষ করে তখন সমগ্র জন উদ্যোগে হিংস্রজন্তুকে ধরবার জন্যই শিকারে নেমে পড়েন। দক্ষ শিকারীরা বনের একদিকে অস্ত্রাদি নিয়ে শিকারের অপেক্ষায় প্রস্তুত থাকেন। অপর দিকে বাকিরা হেঁই হেঁই করে শিকার তাড়াতে থাকেন। শিকারীদের চিৎকারে সেই বনাঞ্চলে অবশিষ্ট পশুরা ভয় পেয়ে নিজেকে বাঁচাবার জন্য মুক্তাঞ্চলের দিকে দৌড়তে থাকলে দক্ষ শিকারীদের খপ্পরে পড়ে। অনেক সময় শিকার ফসকে গেলে আবার দল বেঁধে কারের পেছনে পেছনে দৌড়তে থাকে শিকার হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত। এইভাবে তাড়া চলতে থাকে। কোন কোন সময় শিকারের খাদ্যাশ্বেষণের নির্দিষ্ট জায়গায় অনতিদূরে কয়েকজন শিকারী চুপচাপ বসে থাকে এবং শিকার আয়ত্তের ভেতরে এলে অস্ত্র ছুড়ে মারে।

ফাঁদ :

মগ জনজাতিরা বনের পদ্ধতিতে ফাঁদ পেতে থাকেন। পদ্ধতি অনুসারে উল্লেখযোগ্য ফাঁদগুলির নাম হল - খোউথং, কইংথং ছে থং ইত্যাদি।

কইংথংরে :

এই ফাঁদ প্রথমে মাটিতে প্রয়োজন মত গভীর গর্ত করা হয়। তারপর সেই গর্তকে আবার গাছের ছোট ডাল, পাতা ইত্যাদি দিয়ে এমনভাবে ঢেকে রাখবে যাতে জায়গাটি আগের মত স্বাভাবিক ধারণা করা যায়। সবশেষে গর্তের উপর সোজাসুজি এক টুকরা মাংস ঝুলিয়ে রাখা হয়। কোন পশু ঝোলানা মাংসের টুকরাটাকে খেতে গেলেই গর্তের ভিতরে পড়ে যায় এবং অনায়াসেই সেই পশু শিকারীর হস্তগত হয়।

ছেঃ থংরে :

পাখিদের জন্য এই ছেঃ থং ফাঁদটি পাতা হয়। ছেলেরা গর্জন, বটগাছ ইত্যাদি বিভিন্ন গাছের কসগুলি নিয়ে বড় একটি বাঁশের চোঙায় কসগুলি ভরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর প্রায় দুই হাত লম্বা আঙুল প্রমাণ বাঁশের কাঠি নিয়ে মিশ্রিত গাছের কস ভর্তি চোঙার ভিতরে ভরিয়ে

দেওয়া হয়। এমনি ১৫-২০ টি বাঁশের কাঠিকে চোঙার মধ্যে ভরিয়া ভালকরে নেড়েচেড়ে নিতে হবে যাতে সমস্ত কাঠির গায়ে গাছের কসগুলি লেগে যায়। তারপর যেসব গাছের ডালে তাদের আকাজ্জিত পাখিরা বসে সেই সব ডালের মধ্যে কসলাগানো কাঠগুলিকে একটি একটি আলাদা করে সাজিয়ে রাখা হবে। পাখিরা ঐ কাঠটির উপরে বসলে পায়ে ও পাখনায় কসযুক্ত আঠা লেগে আর উপরে উঠতে পারবে না। তখন অনায়াসে পাখিটিকে ধরা হয়।

মাছ শিকার :

মাছ শিকার মগ সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, খাদ্য আহরণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। প্রাচীন কাল থেকেই মগরা শুকনো মাছ বা শুটকির দ্বারা মাছের বিকল্প হিসাবে মিটিয়ে নিত। নদী, নালা, বার্না, ছড়া, খাল, বিল অঞ্চলে মাছ শিকার করত। বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছ শিকার করে থাকে। এই সব শিকারের পদ্ধতিগুলি নীচে বর্ণনা দেওয়া হল।

ডো-থংরে :

প্রায় ১২ ফুট লম্বা এবং ১৮ ফুট পরিধি বেতের বোনা এবং এর একদিকে আবদ্ধ এবং অপর দিকে সংকীর্ণ পথে খোলা রাখা একটি গোলাকৃত 'ডু' বা ডোলা। এই ডোঃ (ডোলা)র যেকোনো খোলা এটা অনেকটা টিপ আকারে নীচে ধারালো চ্যাপ্টাকৃতি সংকীর্ণ প্রবেশাদির পথ এবং এই সরু পথে নিম্নমুখী বেতের ঢোকানো কাঁটা আড়াআড়িভাবে সাজানো থাকতে মাছ সহসা ঐ ডোলাতে (ডু) প্রবেশ করতে পারলেও বাইরে বেরিয়ে আসার সময় উক্ত কাঁটার ঝাঁকে হোঁচট খেয়ে মাছ বাইরের পথ বেছে নিতে পারে না। ছোট ছোট ছড়া, বার্না বা সমতল জলাশয়ে এই সব ডোলা (ডু) পেতে রাখা হয়। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা 'ডু' বা ডোলা বসিয়ে রেখে পর দিন ভোরবেলায় তুলে নিয়ে মাছ বের করে নেওয়া হয়।

অইং বংগে :

অইংবংগে অর্থাৎ জল সিচে মাছ ধরা অন্যান্য উপজাতিদের মত মগদেরও এই পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতিতে সামগ্রিকভাবে মাছ ধরা আদিবাসী সমাজে খুবই জনপ্রিয়।

এই পদ্ধতিতে মাছ ধরার আগে প্রয়োজনে একাধিক বাঁধ দিতে হয়। যাতে নূতন জলের সংযোজন না ঘটে। বিশেষ করে এই উক্ত জায়গায় জল শুকিয়ে ফেলার জন্য বাঁধের উপর দিয়ে জল সেচে বাইরে ফেলে, জল শুকিয়ে গেলে সহজভাবে উক্ত স্থানে মাছ ধরে নিতে পারে। সাধারণত মাছ ভরা জলাশয়, নদী, ছড়া, ডোবা, নালা, খাল, বিলস্থানেই এই প্রণালীতে মাছ ধরা হয়ে থাকে।

ছীংলা ঙাংফাইংরে :

বিশেষ কোন বনজ গাছের শিকড়টিকে চূর্ণ করে আবদ্ধ জলাশয়ে ছড়িয়ে জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে জলে ফেলে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই উক্ত জলাশয়ের মাছ আধমরা হয়ে উপরে ভেসে ওঠে। তখন বিনা পরিশ্রমেই মাছ ধরে নিতে পারে। কিন্তু শ্রোতজলে এই বিষক্রিয়াকরণ ফলপ্রসূ হয় না। তাই নদী কিংবা ছড়ায় উজান ও নিম্নে বাঁধ দিয়ে জল আবদ্ধ করে তারপর ঐ বিষ প্রতিক্রিয়াকরণ প্রণালী কার্যকর হতে পারে।

ক্যাংদউলা-গ্রাঃ থংরে :

বিশেষ করে আঁশ ছাড়া অন্য মাছই এইসব ক্যাংদউ (বাঁশের চুঙ্গী)তে শীতকালে ঢুকে থাকে। এই চোঙা তৈরি করার প্রণালী হচ্ছে যেমন একটি কাঁচা বাঁশ কেটে এক মুখে একটি ঢাকনা বা বদ্ধ রেখে অপর মুখ খোলা রাখতে হয়। যাতে মাছ তোলার সময় নিচের দিকে জলের সঙ্গে মাছ পড়ে না যায়। আবার ঐ জল ভরা চোঙাকে উর্ধ্বমুখী করে তুলে আনার সময় চোঙার জল যাতে সরে নীচে পড়ে যায় তার জন্য ঢাকনার কাছে সাধারণ একটি ছিদ্র তৈরি করা থাকে। যেখানে মাছ ভরা ও আঁশ ছাড়া মাছ থাকার সম্ভাবনা বেশি, সেই সব পুরানো খাল, বিল, ডোবা ও পুকুরে এই ধরনের ক্যাংদউ বা চোঙা অনেক পরিমাণে ফেলে রাখা হলে তাতে প্রচুর পরিমাণে সিং, মাগুর, কুইচ্যা, বেত্রংগী মাছ, বাইল্যা, বাইম, কাঁকড়া, ইচা, চিংড়ি ইত্যাদি মাছ সহজ উপায়ে ধরা যায়।

ছীংখোং খাইতে :

এই পদ্ধতিতে মাছ ধরার প্রকল্প সাধারণত অনধিক গভীর জল স্রোতবান ছড়া এবং খালেই এই ফাঁদে ঢেলে সাজানো হয়। ধাংগ্রা অর্থাৎ বাড়াই তৈরি করার প্রণালী হচ্ছে যেমন জলের গভীরতা অনুসারে লম্বালম্বি এবং জলের উপর ৫ ফুট অবশিষ্ট রেখে, প্রয়োজনে ছোট ছোট বাঁশের খুঁটি জলের নীচে মাটিতে গেড়ে বসিয়ে দিতে হয় এবং ছড়া বা খালের এপার ওপার সমান্তরালভাবে পরপর ৩ ফুট দূরত্বে দুটি সারিবদ্ধ করা হত। জলের নীচের মাটি স্পর্শ করে লাফিলা বেতের বোনা 'ধাংগ্রা' নামে লম্বা চওড়া উর্ধ্বমুখী খুঁটি জড়িয়ে ঠেসে বেঁধে দেওয়া হয় এবং যাতে নীচের মাটি ভেদ করে কোন মাছ নিম্ন অববাহিকায় অবতরণ করতে না পারে। তারপর খ্রাঃ এর বেড় অনুযায়ী ঐ ঠেকানো ধাংগ্রার বা চামচিটির গায়ে বেশ কয়েকটি ছিদ্র করে খ্রাঃ (বাঁশের তৈরি লম্বা আকৃতি বিশেষ) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। উপর থেকে বেয়ে এসে মাছ যখন ধাংগ্রাঃ (চামচিতে)তে হোঁচট খাবে এবং নীচে উপরে ছিদ্র খুঁজে না পেয়ে সহসা ডুবা খ্রাঃ পাতা ছিদ্র পথে প্রবেশ করে নেবে এবং মাছ কোন মতেই আর বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে না। আমার ছোট বেলায় দক্ষিণ ত্রিপুরায় বর্তমানে শান্তিরবাজার মহকুমায় অবস্থিত পিলাক নদীতে আমার জ্যাঠামশায়কে এই পদ্ধতিতে মাছ ধরতে দেখেছিলাম।

ছোংগ্রাউ (চাঁই) :

ছোটখাট জলাশয়ে এই ছোংগ্রাউ বসিয়ে মাছ ধরা হয়। এই ফাঁদে একমাত্র গোড়া মাছ পাওয়া যায়। এছাড়াও যাউসে (বাঁশ বেত দিয়ে তৈরি ত্রিকোণ আকৃতি বিশেষ) দিয়ে মগ আদিবাসী মহিলারা দলে দলে জলাশয়ে মাছ ধরে থাকেন। কখনো দা দিয়ে চলন্ত বড় বড় মাছকে শিকার করে, কখনো কাঁটা যুক্ত বর্ষা মেরে মাছ শিকার করে এই রূপ বিভিন্ন পদ্ধতিতে মগেরা মাছ শিকার করে থাকেন।

ফলমূল এবং শাকসব্জী আহরণ :

মাছ ও পশু শিকারের পাশাপাশি ফলমূল শাকসব্জী আহরণ করা মগদের খাদ্য আহরণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রাচীন কাল থেকেই তারা এই ফলমূল অন্বেষণকে দৈনন্দিন

চোপড় রাখার জন্য পরইং পাখ্যো ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় (ঢাকনা সহ খাড়া বা বুড়ি), বীজধান রাখার জন্য পৌ ও ওয়াইন (ঢোল জাতীয়) জায়গায় রাখা হয়। চাল রাখার জন্য ছাইদৌং বানানো হয়। ধান মাপার জন্য বানানো হয় অহ্রীতৌং। চাল মাপার জন্য বানানো হয় সংখ্রাং। তুষ ঝাড়বার জন্য বাঁশ দিয়ে তৈরি করে ফোয়ী খাং (চালুনি), বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী রাখবার জন্য তৈরি করে খরাং। ভাতের থাল তুলে খাবার জন্য তৈরি করা হয় পোয়ীজাং। ফুল, তুলা ও পূজার সামগ্রী নেওয়ার জন্য বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয় পাইংখরাং। মাছ ধরবার যন্ত্র হিসাবে যাউসে খউখ্যা, পোউ, খরা, হ্রোথ্রু, জাইংফ্রা, পংলং ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। আরও চাল ঝাড়বার জন্য চাইংগো (কোলা), ধান শুকানোর জন্য ফেয়া, রোদ ও বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য মাকলা ও খমউ। মগেরা তাদের প্রয়োজনে আরও অনেককিছু বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী তৈরি করে। বেশির ভাগ পুরুষেরা বাঁশ ও বেতের জিনিস বয়ন করতে অভ্যস্ত। তবে অনেক মহিলা পুরুষের সমান বয়ন শিল্পে পারদর্শী। পুরুষের বাঁশ ও বেত দিয়ে এইরূপ বুড়ি, টুকরী, পাটি, ধাড়ী, ঢোল, কুলা, ডালা, সাজি, চালনি, ডোলা ইত্যাদি বুনে অর্থ উপার্জন করে।

বিবিধ হস্তশিল্প :

বেতের বয়নাদির হস্তশিল্পের মধ্যে আরও কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাতের শিল্প উৎসব অনুষ্ঠানে খেলার ছলে, ঘর সাজাবার জন্য তৈরি করে থাকেন। তার মধ্যে পাদীসা আপাং (কল্লতরু), ছিঃ মীং থং (হাজার প্রদীপ দানী), পাইংথং (হাজার ফুল দানী), থমাংথং (হাজার ভাতের প্যাগোডা), পারসে (বেতের তৈরি রাজপ্রাসাদ ছোট আকৃতি) পাদীসা পোয়ে অর্থাৎ কল্লতরু উৎসবে তৈরি করে দান করা হয়। বেতের তৈরি ফুল ও ফুলগাছ - লাউকঃ চুরি, নাদং (কানের দুল), পাখি, বানর, ঘোড়া, হাতি খাড়াংসে (ছোট অকারে বুড়ি) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কাঠ শিল্প :

মগ আদিবাসীদের অনেক রূপকথায় কাঠ নির্মিত দ্রব্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অনেকের মতে বস্ত্রশিল্প সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই কাঠের নির্মিত দ্রব্যাদি উদ্ভব হয় বলে মত পোষণ করেন। তার উদাহরণ যেমন হচ্ছে সূতা কাটার যন্ত্র চরখী বা চরকা। তাই কাঠের কাজ কিংবা বেতের কাজ উভয় শিল্পের বিবর্তন। সমসাময়িকভাবেই গড়ে উঠেছিল বলে একান্ত ধারণা। কেননা, বেতের বয়নের থলিতে চিরসত্য এবং মানব জাতির অপরিহার্য পানীয় জল আবদ্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। এই জন্য জলের মত তরল পদার্থকে জমিয়ে আবদ্ধ করে রাখতে হলে চাই কাঠের নির্মিত পাত্র বা বাসন। প্রাচীন কালে মগেরা জল রাখবার জন্য বড় বড় আকারে কাঠের নির্মিত পাত্র ব্যবহার করতেন। প্রয়োজনের তাগিদে ছোট বড় বিভিন্ন আকারে থালা, বাটি, গামলা বা দাংগাইং ইত্যাদি নির্মাণ করতো। ধান ও অন্যান্য শস্যাদি ভাঙার জন্যও কাঠের ঢেঁকি তৈরি করে ব্যবহার করা হতো। ঐতিহাসিক তথ্য ও রূপকথার কাহিনির মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রাচীন কাল থেকেই মগ আদিবাসীরা জলপথে যাতায়াতের জন্য কাঠের নৌকা ব্যবহার করতো।

বিভিন্ন কাজে কাঠের ব্যবহার :

উপরি উক্ত যন্ত্রপাতি ছাড়াও বাদ্যযন্ত্র এবং গৃহের অত্যাবশ্যক সরঞ্জাম হিসাবে প্রাচীনকালে

কাঠের ব্যবহার ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাঠের শিল্পে গড়া নীচে কয়েকটি নাম দেওয়া হল।
যেমন :- চণ্ড (চণ্ডপ্রং), বেংলা (বেহালা), চেং (চোল), খরা (কাঠের বাঁশী)।

গৃহের অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মধ্যে হচ্ছে খোওয়াউ ছোঙ্ (মরিচ পিষবার যন্ত্র), বসবার জন্য পাইও (পিড়ী), কাপড় বোনার জন্য রাউমা এবং কৃষি কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাঠের তৈরি একইং (লাঙ্গল), লইডাং (জোয়াল), সপাং খংলঙ ইত্যাদি অনেক কিছু নির্মাণ করা হতো। এছাড়াও চরুট, পাইপ, বুদ্ধমূর্তি, কাঠের ঘণ্টা প্রভৃতির নির্মাণ শৈলীতে নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যের ছাপ বজায় রেখেছে।

তাঁত শিল্প :

প্রাচীন কাল থেকেই মগ আদিবাসী মেয়েরা তাঁত বোনার কাজে অংশগ্রহণ করে থাকতেন। শিশুকাল থেকেই মেয়েদের তাঁত শিক্ষা অবশ্যই কর্তব্য ছিল। তাঁত শিল্পে অজ্ঞ মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার বেলায় মা বাবারা খুবই বিপদের সম্মুখীন হতেন। তাই বাস্তব জীবনের প্রয়োজনেই অতি অল্প বয়স থেকেই ছোট কোমর তাঁত বানিয়ে ছোট মেয়েদের হাতে তুলে দেওয়া হত। বড়দের দেখাদেখি ছোট মেয়েরাও খেলাচ্ছলেই এ শিক্ষায় শিক্ষিত হত। মা বা মাতৃস্থানীয় মহিলারা কাপড় বোনা শিক্ষা দিতেন। তাঁত শিল্পে অধিকাংশ যন্ত্রই বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। জুমে উৎপাদিত কাপাস থেকেই তারা নিজস্ব কায়দায় সূতা প্রস্তুত করতেন। তারপর নিজেদের রুচিমত এই সাদা সূতাকে বনজ ওষুধ দ্বারা লাল, কাল, খয়েরি বা হলুদ রং করে নিতেন। ম্যালুঙ গাছ, আমগাছ, কাঁঠাল গাছ ও তেঁতুল ইত্যাদি গাছের ছাল নিয়ে মিশ্রিত করে জলে সিদ্ধ করে নিলে কস বেরিয়ে খয়েরি রং ধরে। ঐ জলে সাদা সূতা বা কাপড় দিয়ে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করে নিলে সাদা কাপড় কালচে খয়েরী রং ধরে। মগ ভাষা গাছের ছাল দিয়ে রং করাকে বলা হয় সংখউ ছোং। পূর্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই পদ্ধতিতে সংখউ ছোং সাংগ্রাইং অর্থাৎ খয়েরি বা গেরুয়া রং করে নিয়ে কাপড় পরিধান করতেন। কাঁঠাল গাছের ছাল থেকে হলুদ রং তৈরি করা যায়, তার সঙ্গে অন্যান্য গাছের ছাল মিশিয়ে দিলে খয়েরি রং হয়ে যায়।

লাল রঙের জন্য বনভূমি থেকে গাছের মূল কুড়িয়ে নিয়ে তাকে ছোট্টে সূতা এবং খার দিয়ে পাট্রে সিদ্ধ করে নিতে হয়। তার পর কিছুক্ষণ সিদ্ধ হয়ে উঠলে ঐ সূতাকে রৌদ্রে শুকিয়ে নিলেই লাল রং হয়ে যায়।

কালো রঙের বস্ত্র তৈরি করার জন্য জুমে এক জাতীয় কাল গাছ উৎপাদন করতে হয়। এই গাছের পাতা দিয়েই কালো রঙ তৈরি করা হয়। এছাড়া গাবের, বেলের ফল দিয়ে কালো রং তৈরি করা হয়। একাল রঙের মধ্যে সাদা সূতা বা কাপড় ভিজিয়ে রাখলে কালো রঙ ধরে যায়। ছোট বেলায় দেখেছি আমাদের বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধ ভিক্ষু গাছের ছাল থেকে প্রদত্ত রং নিয়ে কাপড়ে রং করে পরিধান করতেন। গাব ও বেলের আঠা মিশ্রিত করে নিজেই কালো রঙের কালি বানিয়ে ভুজ পাতা, তাল পাতায় পুঁথিতে বাঁশের কণ্ঠিত দিয়ে লিখতেন। পরবর্তী সময়ে তিন-চারটি পৃষ্ঠা সাদা কাগজকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে শক্ত একটি পাতা তৈরি করতেন। এই রূপ অনেকগুলি পাতা তৈরি করে লিখে নিজেই প্রাচীন পদ্ধতিতে পুঁথি তৈরি করতেন। এই কালি এত

উন্নত মানের হয় যে তা কোন দিন মুছে যায় না।

এই ভাবে প্রাচীন কালে মগ আদিবাসী রমণীরা প্রকৃতিপ্রদত্ত লতা পাতা শিকড় ও গাছের ছাল দিয়ে বিভিন্ন রকম রঙ তৈরি করে নিত এবং পছন্দমত রঙ দিয়ে কারুকার্য করে কাপড় বোনা হত। তবে আজকাল বাজারে প্রস্তুত করা রঙ-বেরঙের সূতা সহজেই পাওয়া যায় বলে মগ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সব প্রাচীন প্রণালীতে বন্য ঔষধীরঙের সাহায্যে বস্ত্রের রঙ করা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

মগ আদিবাসীদের হাতে বোনা কতকগুলি পোশাকের কথা নিচে উল্লেখ করছি।

থাবিং :

মগ মহিলাদের কোমরে নিম্নাংগের জাতীয় পোষাকের নাম হল থাবিং। থাবিং দুই ধরনের পরিধান করা হয়। থাবিং ওউঃ থাবিংকে ডাবল ভাঁজ করে পাছড়ার মত পরিধান করা হয়। বয়স্ক মহিলারা এই ধরনের পরিধান করে। আবার অনেকে লুঙ্গির মত করে পরিধান করে। এর মধ্যে আবার বিভিন্ন ডিজাইনের থাবিং আছে। যেমন হুং জিরঙ থাবিং - সবুজ, খয়েরি ও লাল দিয়ে চিকন চিকন সমান্তরাল লম্বালম্বী চেক চেক করে বোনা হয়। এই ডিজাইনকে বলা হয় হুং জিরঙ থাবিং। চেটাং পূর্বের ডিজাইনের মত তবে চেকগুলো একটু বড় বড় করে বোনা হয়, এই পদ্ধতির বোনাকে বলা হয় চেটাং থাবিং। গোওয়াখে কোঠা কোঠা করে রং-বেরঙের সূতা দিয়ে বোনা হয়। এই ডিজাইনকে বলা হয় থাবিং গোওয়াখে। এছাড়া বিভিন্ন রকমের নকসা করা ও ছাপানো লুঙ্গি বুনে কম বয়সে মেয়েরা পরিধান করে থাকে। এই ডিজাইনকে মগ ভাষায় বলা হয় লুঙ্গি আপ্রু।

রাং গাইং :

মগ ভাষায় রাং শব্দের অর্থ হলো বুক। গাইং অর্থ আচ্ছাদন বা বন্ধন। রাংগাইং বা বুক বন্ধনী প্রাচীন যুগে অন্যান্য উপজাতি মহিলাদের মতো মগ মহিলাদের মূল পরিধান। নিপুণ কারুকার্যে ভরা বয়ন। সরু এবং লম্বা আকারের বস্ত্র বিশেষ হচ্ছে রাংগাই। যা মগ মেয়েদের একমাত্র বুকের আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রায় ৫১ ফুট এবং প্রস্থ হচ্ছে প্রায় ৮ ফুট। তৎকালীন হাতের বয়নের দ্বারা এই সংকীর্ণ বস্ত্রটিকে সূক্ষ্ম নকশার কাজে সেজে নিত। এই সব নকসার নাম হচ্ছে যেমন লম্বাইপ্রুউ, আহুঁসাহুংহু, খীরাপোওয়াং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ৯ বছর থেকে ১৩ বছর বয়সের ভিতরে প্রতিটি মগ মেয়েকে শুভদিন দেখে বুদ্ধ মন্দিরে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বুক রাংগাই বস্ত্রটি বেঁধে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে মগ ভাষায় বলা হয় রাংতা পোয়ে। সেই রাংতা পোয়ে অনুষ্ঠান করার পরে ঐ মেয়েকে মগ সমাজে যুবতী বলে ঘোষণা করা হয়। তাই প্রয়োজনের তাগিতে প্রতিটি মগ আদিবাসীদের বাড়িতে রাংগাই অবশ্যই বুনে রাখতে হয়।

গবং (পাগড়ী) :

এই গবং অনেকটা রাংগাই এর মত তবে আকারে কিছুটা বড় বিশিষ্ট পাগড়ী বিশেষ। কোন কিছু মাথায় বহনের জন্য এই গবং ব্যবহার করা হয়। আবার জুমে কাজের সময়ও ব্যবহার করে থাকে। সাধারণত এই গবং সাদা রঙের সূতা দিয়েই বোনা হয়। শুধু দুই দিকের পাড়ে রঙিন

সূতা দিয়ে বোনা হয় আর প্রস্থের দুই দিকে রঙিন সূতা দিয়ে নকসা করা বা ফুল তোলা হয়। মগ আদিবাসী পুরুষ ও মহিলা এই গংবং ব্যবহার করে থাকেন।

রোংমা (আঁচল) :

এই রোংমা গবং আকৃতির তবে বিভিন্ন রংঙের হয়ে থাকে। এই রোংমা বা আঁচল সাধারণত মহিলারা ব্যবহার করেন। রোংমার সারা গায়ে অথবা প্রস্থের দিকে সুদৃশ্য কারুকার্যে ভরা থাকে। বেশিরভাগ মেলা, উৎসব অনুষ্ঠানে বা বাইরে বেড়াতে যাবার সময় এই রোংমা আঁচলের মত ব্যবহার করা হয়।

পোছো :

এটি সাধারণত কম্বলবিশিষ্ট মোটা আকারে সূতা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। এর কোন নকসা কাটা থাকে না। অধিকাংশ সাদা রঙের হয়ে থাকে। প্রয়োজনে শুধু সাদা সূতার ফাঁকে ফাঁকে সবুজ, কালো ও লাল রঙের সূতা দিয়ে সমান্তরালভাবে চিকন চিকন চেক তৈরি করা হয়। ঐ বস্ত্রটি বিস্তৃত আকারে বয়ন করা হয়। এর মধ্যে পোছো ও উঃ পোছো এইরূপ ছোট-বড় আকার গঠন করা বয়নকারীর প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে থাকে। বিশেষ করে এই সব বস্ত্র বয়নের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় এবং যখন লেপ, কম্বল বাজারে সহজলভ্য ছিল না তখন এই পোছোঃর সাহায্যে শীতকালের শয়ন মিটিয়ে নিতে হয়।

নব্য মগ গোষ্ঠীরদের কাছে এই সব প্রাচীন বস্ত্র দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার পাশাপাশি বয়নের চর্চার অভাবে উত্তরোত্তর বিস্মৃতির কবলে তলিয়ে যায়।

পোহাঃ লাক্ছো (রুমাল জাতীয়) :

এই বস্ত্রটি আঁচলের চেয়ে ছোট আকৃতি রুমাল জাতীয় হস্ততাঁতের বয়নাদি বস্ত্র। হাত মুখ মোছার জন্য, বালিশের ঢাকনার জন্য এইরূপ গৃহের বহুমুখী ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই বয়ন করা হয়ে থাকে।

কামিজ :

এই সব বস্ত্র নকশা সমেত নিপুণ কলা কৌশলের দ্বারা বয়ন করে নিয়ে তারপর ঐ বস্ত্র দিয়ে পুরুষদের জন্য কামিজ তৈরি করা হত। সাধারণত এই সব বস্ত্র সাদা রঙের তৈরি করা হলেও নকশা কাটার পাড় লাল ও কালো রঙের সূতা দিয়ে সাজানো হয় বা বানানো হয়।

এই সব হাতে বোনা কামিজ ব্যবহার বর্তমান কালে প্রায় বিলুপ্তির পথে। তাদের আদিম বেশভূষা থেকে এড়িয়ে গিয়ে আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদকে একাত্ম করে নিতে লক্ষ্য করা যায়। তাদের নিজস্ব দ্রব্যাদি এবং বস্ত্রাদিসমূহ উত্তরোত্তর হারিয়ে ফেললেও মেয়েদের বেশভূষার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদিঘোঁষা এখনো রয়ে গেছে, তাও আধুনিক ঝাঁচে ব্যবহার করা হয়।

কাঠিং সাংগ্রাইং (কঠিন চীবর) :

মগ সমাজে কাঠিং পোয়ে বা কাঠিন চীবর দান উৎসব সবচেয়ে বড় উৎসব ও পুণ্য কাজ বলে মনে করে। একই দিনে অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কার্পাস থেকে সূতা তুলে নিয়ে বস্ত্র বয়ন করে বৌদ্ধ ভিক্ষুর ব্যবহৃত কাপড় নিয়ম মত সেলাই করতে হবে। তারপর সেই সাংগ্রাই বা

সেলাই করা চীবরকে পরিষ্কার করে ধুয়ে রোদে শুকাতে দিয়ে তার পর ব্যবহারে উপযুক্ত হলে একই দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে শীলধর্ম পালন করে বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দান করা হয়। একই দিনে নিরলস পরিশ্রম করে সূতা তুলে বয়ন করে সেলাই করে ধুয়ে শুকাতে দিয়ে কাপড় বা চীবর দান করা খুবই কঠিন কাজ। তাই এই উৎসবকে বলা হয় কঠিন চীবরদান উৎসব। মগ সমাজে মহিলাারা সম্মিলিতভাবে এই কাজে অংশগ্রহণ করে পুণ্য অর্জন করে।

এছাড়া বৌদ্ধ সম্মাসীদের কোমরে বাঁধার জন্য খাবাইং অর্থাৎ কোমর বন্ধনী বোনা হয়। এই খাবেং ভিন্ন পদ্ধতিতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পাশযুক্ত সুদৃশ্য দড়ির আকারে বুনতে হয়। এছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তিন হাত থেকে শুরু করে ত্রিশ হাত পর্যন্ত লম্বা বিভিন্ন নকশায় কারুকার্যে ভরা বয়নকারীদের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন আকৃতির তাংখোয়াইং অর্থাৎ বিশ্বশান্তির উদ্দেশে শান্তি ও বৌদ্ধ পতাকা বুনে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়। ত্রিশ হাত লম্বা আকৃতির তাংখোয়েং বোনার সময় মগ মেয়েরা সম্মিলিতভাবে বয়ন করে থাকে।

এই সব পদ্ধতিতে বোনা বর্তমান শতাব্দীর আগেই ধীরে ধীরে হারিয়ে গেলেও প্রত্যন্ত মগ অধ্যায়িত অঞ্চলে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাদের পুরাতন ঐতিহ্যকে কিছুনা কিছু এখনও সংরক্ষণ করে রেখেছে। তবে ইদানীং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে জুম চাষের বিস্তীর্ণ জায়গা নেই বলে তুলার উৎপাদনও তেমন নেই বললেই চলে। তাই বর্তমানে তাদেরকে সূতা সংগ্রহের জন্য বাজার মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। আবার বাজার থেকে সূতা সংগ্রহের সাথে টাকার সম্ভাব্য জড়িত বলে বর্তমান কঠিন বাস্তবের সাথে সংগ্রামে হেরে গিয়ে অনেকে ধীরে ধীরে নিজস্ব জীবন গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে।

ধর্মীয় ও সামাজিক লোকজ উৎসব

মগ জনগোষ্ঠীরা অন্যান্য জাতিদের পাশাপাশি বসবাস করে এলেও তাদের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলো অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। মগ জনগোষ্ঠীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের উদযাপিত ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে কাছুং লারে (বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ জয়ন্তী), ওয়াছোলাব্রে (আষাঢ়ী পূর্ণিমা), ওয়াগাই লারে বা ওয়া (আশ্বিন পূর্ণিমা), তাইন্থুংবু লারে (কার্তিক পূর্ণিমা), মাঘী পূর্ণিমা, কাথিন্ পোয়ে (কঠিন চিবরদান উৎসব), সাংগ্রাইং (চৈত্র সংক্রান্তি) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সব উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পাইংথং (হাজার ফুল), ছিমিংথং (হাজার প্রদীপ) থমাংথং (হাজার অন্ন দ্বারা নির্মিত প্যাগোডা), মিংলোঙ বা গংথাংছিমিং পোয়ে (আকাশ প্রদীপ উৎসব) ইত্যাদি।

তাছাড়া লোকজ উৎসব ও সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে ছোয়েংদংগ্রীলং পোয়ে (মহা অন্নদান উৎসব), এয়ংরিং লংপোয়ে (বোধিবৃক্ষে জল ঢালা অনুষ্ঠান), রথা ঙাং পোয়ে (রথটানা উৎসব), শ্যাংপ্রোং পোয়ে (শ্রমণ বা প্রব্রজ্য গ্রহণ অনুষ্ঠান), মঙ্গলাছং বা আত্বাহ পোয়ে (বিবাহ অনুষ্ঠান), মেদেতং পোয়ে (শিশুর জন্মোৎসব), ইংসং তাক পোয়ে (নব গৃহযাত্রা), কক্সং চাপোয়ে (নবান্ন উৎসব), পইংজারা বা পুংনা পোয়ে (খাজনা আদায়ের মেলা), লাপাইং ছোয়ী পোয়ে (যুবক নির্বাচন অনুষ্ঠান), রাংতাং পোয়ে (যুবতী নির্বাচন অনুষ্ঠান), আস্মীহ কম্মোহ (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিশেষ কয়েকটি উৎসব সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

কাছোং লারে (বৈশাখী পূর্ণিমা বুদ্ধ জয়ন্তী) :

এই মাসে পূর্ণিমা তিথিতে মহামতি বুদ্ধের জীবনে মহান তিনটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। যেমন মহামতি বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ এই পূর্ণিমা দিনে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণও এই বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে সংঘটিত হয়েছিল। তাই এই কাছোংলারে অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে মহাবোধি গাছতলায় “এয়ংরেলং পোয়ে” (বোধিবৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালা উৎসব) পালন করা হয়। বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান চন্দন ও সুগন্ধিযুক্ত পবিত্র জল, ফুল, প্রদীপ, ধূপ ইত্যাদি দ্বারা বুদ্ধপূজা করা হয়। সকলে পবিত্র সুগন্ধি যুক্ত জল, ঘটে ভরিয়ে এনে তার সঙ্গে আশ্রপল্লব ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে এনে সারিবদ্ধভাবে গানের সুরে সুরে মুখরিত সকলের দেহ মন নির্মল, পবিত্র ও শান্তির কামনায় স্তোত্রপাঠ করতে করতে বোধিবৃক্ষে পবিত্র জল ঢালা হয়। এই বোধিবৃক্ষের তলে সাধনা করে গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তাই সকল বৌদ্ধদের কাছে এই বোধিবৃক্ষ পবিত্র ও পূজনীয় বৃক্ষ। প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের কথা স্মরণ করে “এয়ংরেলং পোয়ে” বা

জল ঢালা উৎসব পালন করা হয়। এই পূর্ণিমা তিথিতে ‘পাদীসাপোয়ে’ (কল্পতরু উৎসব) অনুষ্ঠিত হয়। বাঁশ ও রঙিন কাগজ দিয়ে সুদৃশ্য কল্পমন্দির (পাসাই) তৈরি করে সেখানে বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করা হয়। সেই কল্পমন্দিরের চারদিকে কল্পতরু (পাদীসা) তৈরি করা হয়। ঐ পাদীসা বা কল্পতরুতে কাপড়, বই, খাতা, কলম, টাকা ইত্যাদি যে যার সাধ্যমত বিভিন্ন জিনিস বুলিয়ে দেওয়া হয়। এই সাজানো পাদীসাকে নিয়ে পাদীসাইং অর্থাৎ পাদীসা গান করতে করতে চেষ্টা, মং সাঁইজোয়ী ইত্যাদি নাদাযন্ত্র বাজিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো হয়। পাদীসা দর্শনে লোকজন এগিয়ে যায় ও সাধ্যমত দ্রব্য সামগ্রী বুলিয়ে পূজা করা হয়। যেসব জিনিস কল্পতরুতে বুলিয়ে পূজা করা হয়, পরজন্মে এসব মরবার অধিকারী হয় বা লাভ করে বলে মগ বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিত হয়ে বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী দান ও পূজা করা হয়। মন্দিরে শীল গ্রহণ, উপাসনা ও ধর্মালোচনা করা হয় বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা। কোন কোন মহামুনি মন্দিরে বুদ্ধ পূর্ণিমার মেলা বসে।

ওয়াছোলাব্রে (আষাঢ়ী পূর্ণিমা) :

এই ওয়াছোলাব্রে উৎসবটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এই পূর্ণিমা দিনেই রাজকুমার সিদ্ধার্থ মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য গৃহত্যাগ করেন এবং এই পূর্ণিমা তিথিতেই ধর্মচক্র প্রবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। এই দিন থেকে আশ্বিন পূর্ণিমা পর্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বর্ষাব্রত পালন করে থাকেন। ওয়াছোলাব্রে (আষাঢ়ী পূর্ণিমা) থেকে ওয়াগ্যাই লাব্রে অর্থাৎ আশ্বিন পূর্ণিমা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে মগ আদিবাসীরা গৃহযাত্রা, বিবাহ ও কোন মাদলিক অনুষ্ঠান করা হয় না। যদি কেউ এই নিয়ম ভঙ্গ করে এই সময়ের মধ্যে বিবাহ করা হয়, সমাজে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কিংবা প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে প্রবেশ করতে হয়। ওয়াছোলাব্রে দিনে সবাই মিলিতভাবে বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্চনা করে। মূপ, প্রদীপ, পিঠা, পায়েস, মিষ্টি, ফুল, ফল, ছোয়াইং (অন্নভোগ) ইত্যাদি দ্বারা বুদ্ধপূজা করা হয়। ঐ দিন ডাবের জল, চন্দন ইত্যাদি সুগন্ধি জল দ্বারা বুদ্ধমূর্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্নান করানো হয়। পঞ্চশীল ও অষ্টশীলাদি গ্রহণউপাসনা বৌদ্ধ পুরোহিত দ্বারা ধর্মালোচনা করা হয়। আগন্ত লোকদের বা অতিথিদেরকে বিম্বীর ভাত, পিঠা, পায়েস ইত্যাদি দ্বারা সেবা করা হয়। পশু, পাখি, হাঁস, মোরগের আহারের জন্য শস্যদানা ধান ইত্যাদি উঠানে, অন্যান্য বাড়িদের উঠানে দিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

ওয়া উৎসব ওয়া বা ওয়াগ্যলাব্রে (আশ্বিন পূর্ণিমা) :

মগ সম্প্রদায়ের উদ্‌যাপিত ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় উৎসব হচ্ছে ‘ওয়া’ উৎসব। মগ জনগোষ্ঠীদের মধ্যে বছরের সপ্তম মাস ওয়াগ্যোয়ে লাব্রে বা আশ্বিন পূর্ণিমা তিথিতেই এই ওয়া উৎসব পালিত হয়। ‘ওয়াগ্যোয়ে’ - এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ত্রৈমাসিক বর্ষা ঋতুর পরিসমাপ্তি বা শেষ অধিষ্ঠান। এই শুভ দিনে বৌদ্ধরা সকল বিবাদ ভুলে গিয়ে একে আনন্দের সন্ধ্যাযণ জানায় এবং মনের সমস্ত সংকীর্ণতা পরিহার করে অহিংস মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মহামিলনের গান গায়। এই উৎসবের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যথা :-

(ক) সমগ্র বৌদ্ধ জাতির আলোক উৎসব।

(খ) ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষা ব্রতের শেষ অধিষ্ঠান।

(গ) মহা কঠীন পোয়ে বা কঠীন চীবরদান উৎসব বা অর্থাৎ ভিক্ষুদের বস্ত্র প্রদান করা অনুষ্ঠান।

আলোক উৎসব :

‘ওয়া’ উৎসবের দিনে আতশবাজি ফুটিয়ে গ্রামে হেঁহে রৈরৈ সাজ সাজ রবে তোলপাড় করে মাতিয়ে তোলে। কিশোর কিশোরী থেকে শুরু করে বৃদ্ধবনিতা সকলেই মিলিতভাবে ক্যাং বা বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে ফুল, পিঠা, পায়ের, বিনী ভাত, ছোয়াইং (অন্নভোগ), ধূপ, প্রদীপ ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী দান ও পূজা করে। বাদ্য যন্ত্র সহকারে চন্দন, ডাবের জল, সুগন্ধি পবিত্র জল মিশিয়ে বুদ্ধমূর্তিকে সন্মিলিতভাবে স্নান করানো হয়। ফোংগ্রী (বৌদ্ধ ভিক্ষু)দেরকেও বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ও ছোয়েং (অন্নদান) করা হয়। বাড়িতে আগত অতিথিদেরকেও প্রাণ ভরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এসব পবিত্র দিনগুলোতে পশু পাখি হাঁস মোরগদের জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে উঠানে শস্যদানা, ধান ছিটিয়ে দেওয়া হয়। যাতে তারাও শান্তিতে পেট ভরে খেতে পায়। এই পবিত্র তিথিতে এই সব পুণ্য কাজ মগ অধ্যুষিত এলাকায় এখনও প্রচলন আছে। ক্যাং (বৌদ্ধ মন্দির), সীং (সীমাঘর) জেদী (প্যাগোডা) মন্দিরে নির্দিষ্ট বোধিবৃক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রদীপ ধূপ জ্বালিয়ে পূজা আরাধনা হয়। কোন কোন স্থানে তিন দিন ব্যাপী এলাকাসমূহে আলোক উৎসব পালিত হয়। পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। একদা মহামতি বুদ্ধ ধর্মীয় আবাস তাবতিংশ স্বর্গ ভ্রমণ করেন এবং তথায় তিনমাস ব্যাপী বর্ষাব্রত যাপন করেন। মাতা মায়াদেবীর কল্যাণের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটকের শেষাংশে অভি ধর্ম ব্যাখ্যা করেন। এর মাধ্যমে মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। তাই এই সব দিনে মাতা- পিতা গুরুজনদের প্রতিও ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান সমাপনের পর “ওয়াগ্যোয়ে” উদ্‌যাপনের প্রথম দিবসের রাতে মহামতি বুদ্ধ পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সাক্ষাশ্য নগরে অবতরণ করেন। তিনি পূর্বাহেই সেখানে আগমনের সংবাদ প্রেরণ করেন। সাক্ষাশ্য নগরে অধিবাসীরা মহান শিক্ষা গুরু বুদ্ধকে উষ্ণ সম্বর্ধনা এবং আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে সমগ্র নগরকে বিচিত্র রঙিন আলোক মালায় সজ্জিত করে। প্রায় আড়াই হাজার পূর্ব থেকে এই দিনটি আলোক উৎসব হিসাবে সূচিত হয়ে আসছে।

ভিক্ষুদের বর্ষাব্রতের শেষ দিন :

অর্থাৎ ‘ওয়া’ উপবাসব্রত সমাপন উপলক্ষ্যে সংঘ সদস্য বা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পবিত্র ধর্মীয় সমাবেশ। অনুষ্ঠানে বিনয় সম্মত নীতিমালা বা ত্রিপিটকের বুদ্ধ মুখ নিঃসৃত বাণী আবৃত্তি করা হয়। এই অনুষ্ঠানে একজন প্রবীণ বৌদ্ধ ভিক্ষু বা গুরুর সম্মুখে সবাই নিজেসব সংঘের নিকট উৎসর্গ করে থাকেন। এই ধর্মীয় সমাবেশে অনুশোচনা করা, প্রচলিত রীতিতে চীবর বস্ত্র প্রদান, দৈহিক ভংগিমায় আত্মনিবেদন এবং এই উপলক্ষ্যে তিন বার পালি ভাষায় ধর্মীয় স্তবক পাঠ করা

হয়। উপবাসব্রত সমাপন উপলক্ষ্যে প্রবারনা কর্মে, সংঘের প্রত্যেক সদস্যের উপস্থিতি অপরিহার্য। এই কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের পর তাঁরা বহির্বিশ্বে ভ্রমণে যেতে পারেন। ঐ সময়ে বৌদ্ধ মন্দিরে নেতৃস্থানীয় ধর্মযাজক বা গুরুজন উদপেশ বাণী ও বিশ্ব শান্তি মৈত্রী ও পরিত্রাণ বাণী পাঠ করেন এছাড়াও বুদ্ধপূজা, পিণ্ডদান, শীলপালন, ধর্মসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত দিনে রঙ-বেরঙের কাগজ দিয়ে তৈরি মিংলুং বা গংখাংছিমীং (আকাশ প্রদীপ) আকাশে ওড়ানো হয়। 'ওয়া' উৎসব (আশ্বিন পূর্ণিমা) দিনে মগ অধ্যুষিত এলাকায় চারদিকে সন্ধ্যাবেলা থেকেই আকাশ প্রদীপ আকাশে ভাসতে দেখা যায়। সেই সাথে আতশ বাজি ফুটতে থাকে চারদিকে হৈহৈ রৈরৈ জয়ধ্বনি শোনা যায়। আকাশ প্রদীপ ওড়ানোর কারণ হলো বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে গৃহত্যাগ করে অনোমা নদী তীরে যখন পৌঁছিলেন, তখন অসি দিয়ে আপন চুল কেটে ফেলেন এবং ছেদিত চুল গুচ্ছ উপরে ছুড়ে দেন। তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বের কর্তিত চুল মাটিতে পড়তে না দিয়ে শূন্য হতে তুলে নিয়ে ত্রয়োস্ত্রিংশ স্বর্গে ঐ চুল সংরক্ষিত করে একটি চৈত্য প্রতিষ্ঠা করেন। ওটি চুলামণি চৈত্য নামে অভিহিত। মর্ত্যের লোকেরা এখনও সেই চুলামণি চৈত্যের উদ্দেশ্যে আকাশ প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধার্থ অর্পণ করেন। প্রবারনা পূর্ণিমার সময় আকাশ প্রদীপ ওড়ানো সেই চুলামণি চৈত্যের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

'ওয়া' কিংবা 'ওয়াগ্যলারে' (আশ্বিন পূর্ণিমা) দিনটিতে আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় হলো, ত্রিপুরার অধিকাংশ মগ সম্প্রদায়ের বাড়িতে দেবদেবী ও নবগ্রহ পূজা দেওয়া হয়। জুমে কিংবা জমিতে মাচা তৈরি করে আবংমা পূজা বা লক্ষ্মী পূজা দেওয়া হয়। উপগোদেবের (জলদেব) উদ্দেশ্যে নদীর ধারে কিংবা খালে মাচা তৈরি করে পূজা দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও বাঁশ ও রঙিন কাগজ দিয়ে কল্পমন্দির তৈরি করে জাঁকজমকপূর্ণভাবে জলে ভাসানো হয়।

মহাকাথিংপোয়ে (দানোত্তম কঠিন চীবর দান) :

দানোত্তম কঠিন চীবরদান উৎসব হচ্ছে সংঘ সদস্যদের বস্ত্র প্রদানের অনুষ্ঠান। কাথিং সাংগ্রাইং কঠিন চীবর বলার কারণ হলো - এই সাংগ্রাই বা চীবরটিকে এক দিনের মধ্যে কার্পাস থেকে সুতা টেনে নিয়ে কাপড় বুনতে হয়, সেই বোনা কাপড়ের টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে সেলাই করে নিয়ে, গেরুয়া রঙ করে নিতে হয়। সেই চীবরটিকে মহা সমারোহে সম্মিলিতভাবে ভিক্ষু প্রধানের কাছে দান করা হয়। অনেক কষ্ট ও ধৈর্য সহকারে একদিনের মধ্যে সুতা টেনে কাপড় বুনবে জোড়া লাগিয়ে রঙ করে নিয়ে ভিক্ষুর ব্যবহারে উপযোগী চীবর তৈরি করতে হয় বলে এই চীবরকে কঠিন চীবর বলা হয়।

ভিক্ষুদের বর্ষাব্রতের শেষ অধিষ্ঠান বা শেষ হবার পর ভক্তরা বৌদ্ধ বিহারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই পর্ব 'ওয়া' কিংবা 'ওয়াগাইলারে' (আশ্বিন পূর্ণিমা)-এর পরদিন হতে তাই ছংবো লারে (কার্তিক পূর্ণিমা) এই ত্রিশ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই ত্রিশ দিনের মধ্যে যেকোন দিন কঠিন চীবর দান উৎসব অনুষ্ঠান হতে পারে।

মগ সম্প্রদায়ের লোকজন "কাথিংপোয়ে" উৎসবে ত্রিশ হাত লম্বা শ্বেত শোভা শান্তির পতাকা উত্তোলন করা হয়। রঙিন কাগজ ও বাঁশ বেত দিয়ে পারসাই (সুসজ্জিত প্রাসাদ) পাডেসা

(কল্পতরু) তৈরি করে থাকে। বিদ্যা, ধন, টাকা ইত্যাদি ঐশ্বর্য লাভের আশায় কল্পতরুতে আগত লোকজনেরা বই, খাতা, কলম, কাপড়, টাকা ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী বুলিয়ে দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ইন্দ্ররাজ ও চতুর্পাল দেবরাজের বেশে পাহারা দেবার জন্য লোক নিয়োগ করা হয়।

পূর্ব দিক থেকে ধৃতরাষ্ট্র দেবরাজ, দক্ষিণ দিক থেকে বিরুলক দেবরাজ, পশ্চিম দিক থেকে বিরূপাক্ষ দেবরাজ, উত্তর দিক থেকে কুবের দেবরাজ-সহ চতুর্লোকপাল দেবতাগণ নিরাপত্তা ও সুখ রক্ষার জন্য পাহারা দিয়ে থাকেন। কঠিন চীবর দান উৎসবের দিন তারবোয়ে (পূজার অর্ঘ্য), পাডেসা (কল্পতরু), অষ্ট পরিক খার অর্থাৎ দোয়াজিক (সংঘটি), প্রকাজিক (উত্তরাসংঘ), অন্তর্ধান বা পরনের চীবর, সাবোয়ী ওঃ (পিডপাত্র), সাংথোং (ক্ষুর) এঃ (সূচ), খ্রীঃ (সূতা), খাবেং (কটিবন্ধনী), রীজই (জল ছাকনি) নিয়ে ধর্মীয় শোভাযাত্রা সহকারে বৌদ্ধ মন্দিরে বা নির্দিষ্ট কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে যাওয়া হয়। এইভাবে এই অনুষ্ঠানে স্যাংপ্রোহ পোয়ে (শ্রমগ্রহণ অনুষ্ঠান), পাইজাং খাইং পোয়ে (প্রবজ্যা গ্রহণ অনুষ্ঠান) জাঁকজমকপূর্ণভাবে হয়ে থাকে। শোভা যাত্রার অগ্রভাগে একদল যুবক কল্পতরু বয়ে নিয়ে যায়। কোথাও আবার বিভিন্ন দানের সামগ্রীর সঙ্গে মূলিবোয়া ক্রাক্স্যা, থিঃ, তাংখোয়েং, ছাতা, পতাকা, ফুল-সমেত সুসজ্জিত তারবোয়ী অর্থাৎ পূজা অর্ঘ্য মাথায় তুলে নিয়ে যায়। মাতাপিতা ও আত্মীয় স্বজনরা ফুল, তারবোয়ে, কল্পতরু, চীবর, পরিকখারা ইত্যাদি বয়ে নিয়ে থাকেন। যারা শ্রমণ কিংবা প্রবজ্যা গ্রহণ (বৌদ্ধ ভিক্ষু) করবেন তারা মুণ্ডিত মস্তকে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষুদের গ্রহণীয় বস্ত্র অষ্টপরীক্ষার সঙ্গে নিয়ে সারিবদ্ধভাবে মন্দিরে যাওয়া হয়। শোভাযাত্রার সময় মগদের প্রচলিত গান ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে অনুষ্ঠানকে জাঁকজমক পূর্ণ করে ও প্রাণবন্ত করে তোলে। এখানে আকর্ষণীয় আরেকটি বিষয় হলো - পাডেসা বা কল্পতরুকে ঘিরে যুবক যুবতীরা পাডেসা ইঃ নামক প্রচলিত গান গেয়ে প্রতিযোগিতামূলক দলে দলে নৃত্য করে। তারপর ঐ ধর্মীয় মিছিলটি অনুষ্ঠানের মণ্ডপে প্রবেশ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণকে প্রণাম জানিয়ে শীল গ্রহণ ও প্রার্থনা করে।

মন্ত্র পাঠের পরেই শুরু হয় চীবরদান, ধর্মীয় বিষয় শ্রবণ, এবং উৎসর্গীকরণ। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন এসে, চীবর ও বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী দান করে। এই অনুষ্ঠানে দূর দূরান্ত থেকে ভিক্ষুদেরও সমাগম হয়। এইভাবে ওয়াগ্য লাত্রে (আশ্বিন পূর্ণিমা) থেকে তাইংছংবু বোলাত্রে (কার্তিক পূর্ণিমা) পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। যেমন : কাথিং পোয়ে (কঠিন চীবরদান উৎসব), ছিমিংথং (হাজার প্রদীপ), পাইংথং (হাজার ফুল), থমাংথং (অন্নদান), বা অন্ন দ্বারা নির্মিত জেদীপূজা, পাদীসা (কল্পতরু), স্যসং সীং (৮০ হাজার বেষ্টিত সীমাঘর), ওয়ংকপা সীং (বহু চক্র) ইত্যাদি উৎসব পালিত হয়ে থাকে। অনেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত সারামাস ব্যাপী তাইংছংবো ছিমিং নামক প্রদীপ জ্বালিয়ে বাঁশের ডগায় বেঁধে অনেক উঁচুতে বুলিয়ে রাখে। তাই ছংবো লাত্রে দিনেও আনুষ্ঠানিকভাবে আকাশ প্রদীপ উড়ানো হয়। এই আলোক সাজানোর অর্থ হলো গৌতম বুদ্ধের চুল সংরক্ষিত স্বর্গের বা দেবরাজের 'চুলামণি' চেতাকে পূজা করা।

পৃথিবীর সবজাতিই নিজ নিজ বর্ষপঞ্জির শেষে নতুন বৎসরের প্রারম্ভে নববর্ষ বা বর্ষবরণ উৎসব পালন করে থাকে। মগ আদিবাসীরাও নিজেদের প্রথায় এই ধরনের বর্ষবরণ উৎসব পালন করে থাকেন। এই উৎসবকে মগ ভাষায় বলা হয় সাংগ্ৰাইং সাংক্ৰাইং থেকেই সাংগ্ৰাইং শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। যার আভিধানিক অর্থ হলো চৈত্র সংক্ৰান্তি। সাংগ্ৰাইং এক এক বছর এক রূপে বা এক এক ভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করে। যেমন তার একটা বর্ণনা দেওয়া হল : তালাং গুনিং গ্রোমাং (রবিগ্রহ রাজা)। তিনি গরুড় পক্ষীতে চড়ে মঙ্গলবার (১৪ই এপ্রিল) রাত ৫ ঘটিকায় ৫৬মিঃ ৫৪ সেকেন্ডে একহাতে বল্লম অন্য হাতে কাঁচি ধরা অবস্থায় উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ পূর্ব কোণে প্রবেশ করে ছিল।

ছারাগ্রী উবাস্যাং-এর লেখা “লকাহীতা গাইং বীরা ক্যাং” নামক গ্রন্থে তিনটি সাংগ্ৰাইং-এর নাম উল্লেখ করা আছে। যেমন- (১) বাসো সাংগ্ৰাই, (২) আয়ামা সাংগ্ৰাই, (৩) সামাইংতা সাংগ্ৰাই।

(১) বাসো সাংগ্ৰাই :- দাঁড়ানো অবস্থা থেকে হেঁটে পৃথিবীতে প্রবেশ করলে তাকে বাসো সাংগ্ৰাইং বলা হয়। এই রূপে সাংগ্ৰাইং পৃথিবীতে প্রবেশ করলে পৃথিবী শস্যশ্যামলায় ভরে উঠে শান্তি লাভ করে।

(২) আয়ামা সাংগ্ৰাইং :- ঘুমানো অবস্থা থেকে উঠে পৃথিবীতে অবতরণ করলে সেই সাংগ্ৰাইংকে বলা হয় আয়ামা সাংগ্ৰাইং। আয়ামা সাংগ্ৰাইং পৃথিবীতে অবতরণ করলে ঐ বছর “সাঃ গাঃ তিরীছাইং সীঃ আইং” অর্থাৎ স্থলের প্রাণী ও জলের মাছ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে মৃত্যু ও ক্ষতি হবে। তবে মনুষ্যজীব শান্তি লাভ করবে।

(৩) সামাইংতা সাংগ্ৰাইং :- দুটো হাত বিপরীত কনিকে জড়িয়ে ধরে পৃথিবীতে প্রবেশ করলে তার নাম হবে সামাইংতা সাংগ্ৰাইং। সাংগ্ৰাইং এই অবস্থায় পৃথিবীতে প্রবেশ করলে ঐ বছর দেশের জনগণের অভাব অনটন থাকবে না - শান্তি প্রাপ্ত হবে। প্রাণীরাও (পশুপাখিরাও) শান্তি পাবে। এখানে উল্লেখ্য, ব্যাপার এই যে, সাংগ্ৰাইংকে ‘ভানু’ রাজা বলে ধরা হয়েছে। ভানু শব্দের অর্থ হলো রবি বা সূর্য। সাংগ্ৰাইং বছর আবার ১২ ধরনের ভাগ আছে। যেমন জিয়াহু, উয়িসাংখা হুং, জাইথা হুং, আসাহু হুং, সাওয়ানা হুং, চুং হুং, এসাংয়ুজা হুং, ক্রেটিকা হুং, মিগাসী হুং, ফোং হুং, মাক্গাং হুং, ফাল্চুনি হুং। সাংগ্ৰাইং এর আগমনী সংবাদ প্রকাশিত হয় অগ্রিমভাবে “সাংগ্ৰাইংজাং” এর দ্বারা। সাংগ্ৰাইংজাং হলো মগ আদিবাসীদের বছরের নক্ষত্রের অবস্থান ও এর মঙ্গল-অমঙ্গলের রাশির প্রভাব বিষয়ক ভবিষ্যৎ বাণী। কারণ সাংগ্ৰাইংজাং-এর আলোকেই চাষাবাস, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, উন্নতি-অবনতি, পরিস্থিতি-পরিবেশকে আগাম বোঝার সুযোগ হয়। শুভ-অশুভ দিন, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করা হয় সাংগ্ৰাইং জাং এর মাধ্যমে। মগ জাতিদের বৌদ্ধধর্মীয় শীলাদি পালন ও উপবাস যাপন লাহোহু (কৃষ্ণপক্ষ), লাগোয়ে (অমাবস্যা), লাংছাইং (শুক্লপক্ষ), লাবে (পূর্ণিমা) এই রূপ অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের দুই অষ্টমী তিথিতে প্রতিপালিত হয়।

চান্দ মাসের নামানুসারেই মাসের নাম করা হয়েছে। যেমন -

কছুংলা, নাইয়ুঙলা, ওয়াছোলা, ওয়াখংলা, তংসলাঙলা, ওয়াগ্যালা, তাইংছঙ্‌বোলাঃ, নাইতলা, প্রাংসোলা, তবোথেংলা, তবংলা, তাইংখোঙলা। সৌরমণ্ডলের গ্রহপুঞ্জের অবস্থান্তরকে কেন্দ্র করেই তিনটি ঋতু ও সাতটি কেতু দিবসের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন - (১) মোঃ রাশি (বর্ষাকাল), (২) নীং রাশি (গ্রীষ্মকাল), (৩) ছংগু রাশি (শীতকাল)। সপ্ত দিবসের নাম গুলি হল :- তলাঙুনিং (রবি), তলাঙলা (সোম), আঙগা (মঙ্গল), বুধু (বুধ), ত্রাঙ্গাপতি (বৃহস্পতি), শুত্রা (শুক্র), চনিং (শনি)। তিনটি ঋতুচক্র, সাতটি দিবস এবং বারটি চান্দমাসের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে মগ জাতিদের বর্ষপঞ্জি তথা অাইংমা শতাব্দী গংজাঃ সাক্রই। বর্ষচক্র প্রতিবারেই সাংগ্রাইং আবির্ভূত হয় আর তিরোহিত হয়। মগ জাতিদের একটি উপাখ্যান সাংগ্রাই উৎসবের পেছনে একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে।

একবার শিবের দেহরক্ষী - রক্ষিণীরা তাঁর স্ত্রী পার্বতীর কথায় কান দেয়নি। তাই পার্বতী অভিমান বা রাগ করে, তাঁর গায়ের প্রসাধনীর মাল মশলা দিয়ে গণেশকে সৃষ্টি করে এবং নিজের দেহরক্ষী নিযুক্ত করে। প্রাচীন গ্রন্থে (মগ ভাষায় লিখিত) গণেশের বিভিন্ন নাম উল্লেখ আছে। যেমন - মহাপীনাইং, মহাবীশ্বে ইত্যাদি। একদিন পার্বতীর দেহরক্ষী ও শিবের দেহরক্ষীদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে প্রথমে শিবের দেহরক্ষীরা হেরে যায়। এর ফলে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে গণেশের মুণ্ড ছেদন করে। তা জানতে পেরে পার্বতী কালী মূর্তি ধারণ করে আরম্ভ করে ধ্বংস যজ্ঞ। এতে দেবতার শংকিত হয়ে পড়ে এবং ইন্দ্রের মধ্যস্থতায় এই মহাকাণ্ডের সমাপ্তি ঘটে। এই মধ্যস্থতার ফলশ্রুতি হিসেবে ইন্দ্র একটি হাতির মাথা কেটে গণেশের গায়ে সংস্থাপন করে জীবিত করে আর গণেশের কেটে যাওয়া পূর্বের মস্তক স্বর্গে নিয়ে যায়। হাতিটি নাকি পশ্চিম দিকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিল তাই মাথা কেটে নিতে সম্ভব হয়েছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এখনও মগ জাতিদের মধ্যে পশ্চিম দিকে মাথা রেখে ঘুমানো রীতি নেই। গণেশের কাটা মুণ্ডটি স্বর্গের সাতজন দেবী পালাক্রমে একমাস পর পর ধরে রাখতো। “লকা হীতা গাইংবীরা ক্যাং” নামক মগ ভাষায় লেখা গ্রন্থে গণেশের মস্তক বহনকারী দেবীদের নাম উল্লেখ আছে।

যথা :- নাইন্দা, কন্যা, খাইংসী, গরাসা, মহরকা, রাসাকা, প্রকাদেওয়া। এই সাতজন দেবী পালাক্রমে নির্দিষ্ট ৩০ দিন করে বহন করে রাখতো। এই মস্তক থেকে নাকি প্রচুর পরিমাণে পচা গলা রক্ত সব সময় পড়ত। সারা বছর এই পচা রক্ত জমিয়ে রেখে বছরের শেষ দিনে মর্ত্যে ফেলে দিত। কোন বছর জলে ফেলে দিত আবার কোন বছরে স্থলে বা হিমালয়ে ফেলে দিত। এর ফলে মর্ত্যালোকে অপবিত্র বা দূষিত হয়। সেই বছরে দূষিত রক্ত জলে ফেলে দেয় সেই বছর জল দূষিত হয় ও জলের জীবক্ষতি হয়। আবার স্থলে পড়লে জীবজন্তু, ধান, শস্য ইত্যাদির ক্ষতি হয়। তাই ঐ দিনে স্বর্গের ইন্দ্র শর্ত অনুসারে সদল বলে দেবদেবীদের নিয়ে মর্ত্যের মানব-মানবীদের সাথে মিলে মিশে ধোয়া মোছার কাজে সহযোগিতা করে।

অতএব, এই দিনে যেমন সকলে পরিশুদ্ধ পবিত্র হয়। ঠিক তেমনি স্বর্গবাসী এবং মর্ত্যবাসীদের মধ্যে মিলন ঘটে। সেই বছর এই পচা রক্ত স্থলে ফেলে দিত সেই বারে সাংগ্রাই-এর

প্রথম দিনে স্থলের শাক্ সবজি উদ্ভিদ ইত্যাদি তোলা হয় না, যদি সেই রক্ত জলে ফেলে দেয় সেই দিন খাবারের জল নদী বা ঝরনা ইত্যাদির জল নেওয়া হয় না। আগের দিন ব্যবস্থা করে রাখা হত। মগ জাতিদের প্রবাদ আছে-আগা প্রেগাহ সাংগ্রাইং ক্যাং আফীমা থারোঃ কাঃ। অর্থাৎ আকাশ থেকে সাংগ্রাইং নেমে এলো বড়মা নেচে উঠলো।

যাই হোক, সাংগ্রাই যে খুশির উৎসব এতে কোন সন্দেহ নেই। মগ সমাজে সাংগ্রাই উৎসব বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই উৎসব তিনদিন পালিত হয়। প্রথম দিন — পাইংছোয়াই বা সাংগ্রাই রাক। দ্বিতীয় দিন — সাংগ্রাইং আক্যা। তৃতীয় দিন — সাংগ্রাইং আপ্যাইন বা আতাদা।

প্রথমে প্রাক সাংগ্রাইং সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

সাংগ্রাই আগমনের কয়েকদিন আগে থেকেই সাংগ্রাই-এর প্রভাব মগ জাতিদের পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে বিছানাপত্র, কাপড় চোপড়, ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য ব্যস্ততার ধুম পড়ে যায়। নূতন ঘর তৈরি বা পুরানো ঘর মেরামত করা, ধর্ম-কর্ম করার খরচ মিটানোর জন্য যে বাড়তি খরচ হবে, তার জন্য বাড়তি আয়ের চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগে যায়। সাংগ্রাই-এর দু'দিন আগে পাড়ার যুবতীরা দলে দলে কলসী নিয়ে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে মন্দিরের অভ্যন্তর ধৌত করে এবং মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা প্রভৃতি মহানন্দে কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এটা প্রাকসাংগ্রাইং-এর সামাজিক কার্যকলাপ। সাংগ্রাই আগমনের পূর্বাভাস মগ শিশু - কিশোর দেবদ্বারাও ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। গাঁয়ের নীরবতা নিস্তব্ধতাকে ভেঙে ঐতিহ্যবাহী খোনীয়াং দং খেলায়, রীঃ দংকা (চুঙায় জল ভরিয়ে তৈরি করা) আতশ বাজি ফুটিয়ে হৈ হৈ রৈ রৈ সাজসাজ তোলপার করে তোলে। ঐ সমস্ত পরিবেশ পরিস্থিতিকে জড়িয়ে সগৌরবে শুভ সাংগ্রাই-এর আবির্ভাব হয়ে থাকে মগ সমাজের জীবনে।

সাংগ্রাই-এর প্রথম দিন পাইং ছোয়ে :

মগ সমাজে সাংগ্রাইং-এর প্রথম দিনকে পাইং ছোয়ে বলা হয়। পাইংছোয়ে-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ফুল তোলা। অন্ধকার কাকভোর থেকে কিশোর কিশোরীদের হৈ চৈ করে ফুল তোলা শুরু হয়ে যায়। মগ জাতিদের বিশ্বাস, যে যত কষ্ট সহ্য করে ফুল জোগাড় করে পূজা দেবে সে তত বেশি পুণ্য অর্জন করতে পারবে। বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধিফুল সংগ্রহ করে বুদ্ধপূজার পাত্রে সাজিয়ে নিয়ে ভোর বেলা থেকে এই দিন মন্দিরে গিয়ে এই ফুল দিয়ে বুদ্ধমূর্তির বেদীতে সাজিয়ে দিয়ে পূজা করত। কেউ কেউ ত্রাংএগাস্যে তাথং (লীছোয়া = এক ধরনের দুর্লভ ফুল। শোনা যায় এই ফুল ত্রিশ বছর পরে একবার ফোটে। এক হাজারটি নীল শাপলা) ত্রাংখলং তাথং পদ্ম ফুল হাজারটি বা লীছোয়া তাথং ইত্যাদি হাজারটি ছোট ছোট ফুল দিয়ে বুদ্ধপূজা করা হত।

তাছাড়া প্রত্যেকের বাড়িতে পারিবারিক ফরাজাং (বুদ্ধের বেদী)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত ফরা (বুদ্ধ)কে ফুল, ফল, ছোয়াইং অন্নভোগ ইত্যাদি দিয়ে পূজা করা হত। এই পাইং ছোয়ে দিবসে প্রাতঃকালে কোন কোন প্রবীণগণ অষ্টশীল গ্রহণ করে উপবাস যাপনের জন্য বৌদ্ধ বিহারে সদাংসুংচেরাই ধর্মালয়ে মূল সাংগ্রাই-এর তিন দিনের জন্য বিছানাপত্রসহ অবস্থান গ্রহণ করে

থাকে।

এই দিনে ধর্মীয় কর্মসূচীর মধ্যে আছে — নবীনগণের পঞ্চশীল গ্রহণ, কোন কোন প্রবীণ পঞ্চশীল ছাড়া অষ্টশীলও গ্রহণ করে থাকেন। শীল গ্রহণের মধ্যে আছে—প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যাভিচার, মিথ্যাচার, নেশাগ্রহণ থেকে বিরত থাকা। যারা অষ্টশীল গ্রহণ করে তারা আরও তিনশীল পালন করতে হয় বৈকালিক ভোজন পরিত্যাগ, উচ্চাসন ও মহাসনে উপবেশন ও শয়ন পরিত্যাগ, নাচ গান উপভোগ, সুগন্ধ ধারণ, মালা ইত্যাদি পরিত্যাগ করা।

ঐদিনের কর্মসূচীর তালিকা নিম্নরূপ :

(১) ভোরে আরম্ভ আরোঙ ছোয়াই (অন্নদান) বা বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী দান; (২) ফুল, ধূপ, প্রদীপ ও আহার সামগ্রী নিয়ে বুদ্ধপূজা; (৩) প্রদীপ পূজা; (৪) শীলাদি গ্রহণ পালন; (৫) বৌদ্ধ সম্মাসী বা ভিক্ষু দ্বারা ধর্মদেশনা প্রদান ও শ্রবণ; (৬) মধ্যাহ্নে ছোয়াইং (অন্নভোগ) দেওয়া সকাল ১২টার পূর্বে ভোজন সম্পাদন; (৭) বৈকালিক ডাবের জল সুগন্ধি যুক্ত চন্দনের জল দিয়ে বুদ্ধম্নান, তারপর ভিক্ষুদেরকে স্নান করানো ও প্রবীণদেরকেও সাংগ্রাইং-এর জল ঢেলে স্নান করানো হয়। তারপর যুবক যুবতীরা জল ছোড়াছুড়ি করে জল খেলায় মত্ত হয়, বুদ্ধপূজা, প্রদীপ পূজা, ধর্মদেশনা প্রদান, (৮) সন্ধ্যাকালীন বুদ্ধবন্ধনা ও প্রার্থনা, ধ্যান, (৯) রাত্রিকালীন বিশ্রাম ও নিদ্রা।

সাংগ্রাইং-এর দ্বিতীয় দিবস - সাংগ্রাইং আক্যা :-

(অবরোহণ) :- সাংগ্রাইং দ্বিতীয় দিনে পূর্বের দিনের মতো পূজা ও কার্যকলাপ চলতে থাকে। সাংগ্রাইং পরব চলাকালে মগ জাতিদের ঘরে ঘরে গুরুজনদের প্রতি ভক্তি, খাবার দেওয়া বা প্রবীণ পূজা করা হয়। ভক্ত দায়ক দায়িকাগণ সম্মিলিতভাবে পাদে সা বাং (কল্পতরু)কে সাজিয়ে তোলে। তাতে যে যার সাধ্যমত টাকা, কাপড়, বই, কলম ইত্যাদি ঝোলানো হয়। তরবোয়ে (পূজার্য্য সম্প্রদান পাত্র) কলা, নারিকেল, রঙিন কাগজ দিয়ে ছাতা, মূলিবোয়া ত্রাস্যা (পতাকা) দিয়ে সাজিয়ে পান সুপারী, মোমবাতি, সাবান, ফলমূল ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী বুদ্ধমন্দিরে সম্প্রদান করা ও পূজা ও প্রার্থনা করা হয়। মগ জাতিদের ঐ পবিত্র দিনে পাড়ায় পাড়ায় বৌদ্ধ মন্দিরের পার্শ্ব থেকে আকাশ প্রদীপ ওড়ানো হয়। আতশ বাজি ফুটিয়ে ঢোল বাজিয়ে মহা ধুমধাম করে আকাশ প্রদীপ উড়াতে থাকে — মনে হয় যেন অজস্র তারা উড়ছে। ঐ সময় সে এক পরম দৃশ্য ফুটে ওঠে আকাশে।

সাংগ্রাইং-এর তৃতীয় দিবস-সাংগ্রাইং আপ্যাং-তাকখ্যাং (আরোহণ) বা আতাদা :-

ঐদিন ভোরে পিঠা, পোয়েজা বিম্বী ভাত (কংগ্যাং বং) যা গোউ (মিষ্টান্ন) ইত্যাদি তৈরি করে মন্দিরে দান করা হয়। আতাদা দিনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য খাবার হলো ফাসুওয়াং হাং (বিভিন্ন প্রকার শাক সবজি শস্যাদানা মাছ ইত্যাদি মিশিয়ে রান্না করা হয়)। গ্রামে প্রত্যেক বাড়ি থেকে এই ফাসুওয়াং তরকারী আদান প্রদান করা হয় বা খাবার বিনিময় হয়। সন্ধ্যা সময় বুদ্ধ বন্দনা করার পর রাতে সকল মানুষ যখন গ্রামে প্রবেশ করে তখন গ্রামের মানুষ সম্মিলিত ভাবে ফুল, বিম্বী ধানের খই, গুড়, কলা, প্রভৃতি পঞ্চমৃত দিয়ে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, গঙ্গা, বসুন্ধরা, গ্রাম রক্ষাকারিনী ইত্যাদি দেবদেবীকে পূজা করা হয়। সাংগ্রাইং দিনে কোন কোন বাড়িতে লক্ষ্মী দেবী ও নবগ্রহ পূজা

করা হয়। ওয়াগাবো (জলদেব)কে পূজা করা হয়।

সামাজিক অন্যান্য অনুষ্ঠান :

মগ সমাজে সাংগ্রাই উৎসব চলাকালে ধর্মীয় নানা প্রকার অনুষ্ঠান চলার পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে বিবিধ সামাজিক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর মধ্যে আছে—রিলঙ পোয়ে, (জলখেলা উৎসব), চাঃ সক পোয়ে, (পানাহার), কজা পোয়ে (ক্রীড়ানুষ্ঠান), জাইতকাপোয়ে (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান) প্রভৃতি।

১। রিলঙ পোয়ে (জল খেলা উৎসব) :

রিলঙ পোয়ে যুবক যুবতীদের জন্য একটি সামাজিক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। দুপুরবেলা গ্রামে প্রত্যেক যুবতীরা সুগন্ধিযুক্ত চন্দনের জল ও ডাবের জল মন্দিরে নিয়ে আসে বুদ্ধকে স্নান করানোর জন্য। স্নানের সময় পাড়ার যুবক শ্রেণীরা মন্দিরের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মুখর করে তোলেন, সেই বাদ্যযন্ত্রগুলিকে মেজে ঘষে পরিষ্কার করা হয়।

একটা গোল টেবিলের মধ্যে বুদ্ধমূর্তিগুলিকে সাজিয়ে রাখা হয়। তারপর লাইন করে একজনের পর আরেকজন বুদ্ধের মূর্তির মাথায় সুগন্ধি জল ঢালতে থাকে। স্নান হয়ে গেলে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে আসনে পুনরায় সাজিয়ে রাখা হয়। তারপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে সাংগ্রাই—এর জল ঢেলে স্নান করানো হয়। গ্রামের প্রবীণদেরকেও জল ঢেলে স্নান করানো হয়। গুরুজনদেরকে সবাই একজনের পর অন্যজন লাইন করে মাথায় সাংগ্রাই জল ঢেলে দেয়। সর্বশেষে তরল তরলীরা একে অপরকে জল নিক্ষেপ করে হাসি-ঠাট্টা তামাসার মধ্য দিয়ে জল খেলায় মেতে ওঠে। সাংগ্রাই, এর জল খেলা মানেই সমস্ত মলিনতা ধুয়ে মুছে পবিত্রতা দান করা। জল সিক্ত করে একে অপরদের দেহ মনের মনোমালিন্য অশুদ্ধি সব দূর করে পবিত্র করা। বাংলাদেশে এ জলোৎসব গুরুত্ব দিয়ে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করা হয়। রিলঙ পোয়ে (জলখেলা) অনুষ্ঠান বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের মনে খুবই আনন্দ, আবেগ, শিহরন, আলোড়ন সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় হল মগ যুব সমাজের নির্মল আনন্দ ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।

সাংগ্রাইং উৎসবে খাওয়া দাওয়া :

সাংগ্রাইং উৎসব উপলক্ষ্যে গ্রামে প্রতিটি বাড়িতে নানা রকম পিঠা তৈরি করার ধুম পড়ে যায়। মগজাতিদের পিঠার নাম : মুংছিগ্য বা ছিল্থং মোং, ছাইসবং, ছাইংক্রোমোংবা য়াগোহ্, মুরেখ্যো বা পইংজরা, গ্যাংমুং, ফাঙ্কাইমোং, ক্যাংদৌ মোং, কঙ্যাবং, ছেংঃ ক্রেংঃ ইত্যাদি। ভোর রাতেই পিঠা তৈরী সমাপন করে প্রথমে মন্দিরে ভিক্ষু শ্রমণদেরকে প্রদান করে। তারপর আগত অতিথিদেরকে বিতরণ করা হয়। গ্রামে মুরকিবদের বাড়িতেও পাঠানো হয়। সেইদিন নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে কিশোর কিশোরী ও তরুণেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে পিঠা পায়েস ইত্যাদি খায় ও আনন্দ উপভোগ করে। সাংগ্রাইং দিনে মগ সম্প্রদায়রা পশু-পাখি, হাঁস-মোরগের উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে গ্রামবাসীরা পূজা করতো। সমস্ত গ্রামের মানুষকে যেন সুখে শান্তিতে রক্ষা করে রাখে সেই কামনা করতো। এই পূজা করার সময় গ্রামের চারদিকে বাঁশ দিয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। যাতে পূজা করার পরে এরাতে বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে আর ভিতর

থেকেও কোন ব্যক্তি গ্রামের বাইরে যেতে পারবে না। ভোর হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ম সকলকে মেনে চলতে হয়। মগ জাতিদের বিশ্বাস অনুসারে বিভিন্ন দেবদেবীর নাম নীচে উল্লেখ করা হল।

ক) পরাক্রমী দেবীর নাম :

- ১। সাগর-মহাসাগর নিয়ন্ত্রকদেবীর নাম : মেনিমেখলা দেবী।
- ২। নদ-নদী নিয়ন্ত্রকদেবীর নাম : খ্যাংশ্যাঙমা দেবী।
- ৩। পাড়ার রক্ষক দেবীর নাম : রোওয়াশ্যাংমা দেবী।

খ) মহাদেবরাজ চারজনের নাম :

- ১। দাইথারাথাঃ নাইমাংগ্রী।
- ২। কুওয়েরা নাইমাংগ্রী।
- ৩। উইরো পাক্খা নাইমাংগ্রী।
- ৪। উইরো লাক্খা নাইমাংগ্রী।

গ) শক্তিশালী অন্যান্য দেবতার নাম :

- ১। ব্রাইমা, সগ্রাঃ;
- ২। গুমবাইয়াক্ষা নাগাঃ;
- ৩। গাইন্দাপ্প কিম্বারানাগাঃ;
- ৪। জাইশ্বো দিওয়া;
- ৫। আগাসাচো;
- ৬। ভূম্মাচী;
- ৭। রোক্ষাছোঃ;
- ৮। উইসুনা;
- ৯। চাইন্দা পারমী সোওয়া;
- ১০। পইধধশিক্ষা;
- ১১। তঃঅচং;
- ১২। তঃচং;
- ১৩। রক্ষানাই ইত্যাদি।

সাংগ্রাইং অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী আতাদা দিন কিংবা প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই দেবদেবীদের সম্মিলিতভাবে পূজা করে থাকেন। কোন বারে এই পূজা হবে তা রোওয়া সূগ্রী বা গ্রামের প্রধান গ্রামবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হয়। নির্ধারিত দিনে মন্দিরে বাদ্য বাজনা বাজানোর সাথে সাথে গ্রামবাসীরা প্রত্যেক গৃহ থেকে একজন করে পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে গ্রামের প্রধানের সাথে একত্রিত হয়ে রক্তপাত ব্যতীত দেবদেবীর পূজার কাজ সম্পাদন করে থাকে।

এছাড়া বিভিন্ন রোগ ও বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য সম্ভবী (সত্যনারায়ণ), ছিনিং (শনি), ইংনাই, (গৃহদেবতা), চ্যাংমাংলে, বঃদঃ, লইংদাহ ইত্যাদি পূজা প্রচলিত হয়ে আসছে।

সমাজের বিত্তবান সম্পদশালীগণ ও বৃদ্ধজনের হিতার্থে ও সুখের জন্য দান কর্ম মহৎ কর্ম

সম্পাদন করতে দেখা যায়। এই সব মহৎ কর্মের মধ্যে যেমন—জনগণের সুবিধার জন্য পুকুর খনন করে দেওয়া, জলাধারসহ রিংফোংচাং (পাছশালা) নির্মাণ করে দেওয়া হয়, পথিকের বিশ্রাম ও জল পানের জন্য চেরাইং (আশ্রয়স্থান), খেয়া নদী পারাপারের জন্য ফেরিঘাট ইত্যাদি নির্মাণ করে জনসাধারণের সেবা করা হতো।

স্যাংপ্রোপোয়ে (শ্রমণ গ্রহণ অনুষ্ঠান) :

মগ সমাজে ছেলে সন্তানদেরকে অত্যন্ত একবার হলেও বিয়ের আগে বুদ্ধ মন্দিরে কমপক্ষে সাতদিন হলেও বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রধান থেকে দীক্ষা নিয়ে শ্রমণ গ্রহণ কিংবা প্রবজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুরূপে মন্দিরে বিধি নিয়ম পালন করে মন্দিরে থাকতে হয়। সাত দিন পরে ‘স্যাংপ্রো পোয়ে’ উৎসবের মাধ্যমে বাড়িতে লৌকিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। স্যাংপ্রোঃ পোয়ে অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে অন্নদান, বিভিন্নদ্রব্য সামগ্রীদান ও গ্রামের লোকজনদেরকে ছোয়াইং (অন্নদান) করা হয়।

আসীহকংস্খোঃ

(শবদাহ বা অস্ত্যোষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠান) : মগ সমাজের মৃত্যুর পরে আসীহকংস্খোঃ বা শবদাহ অনুষ্ঠানটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন রঙিন কাগজ দিয়ে সুদৃশ্য মন্দিরের মত আলং (কাঠের বাত্ম) তৈরি করা হয়। সেই আলং বা বাত্মের ভিতরে মৃতদেহকে ঢুকিয়ে শ্মশানে নিয়ে যায়। যতক্ষণ মৃতদেহ বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতের পাশে বসে সাসীজাঃ বা সাঃখাইং নামক বুদ্ধের জীবনী পাঠ করা হয়। সারা দিন রাত একটা অদ্ভুত ছন্দে চেঃ বা ঢোল বাজানো হয় যা মৃত্যুর বার্তা বাহক হিসাবে কাজ করে। ঐবাজনা শুনলে লোকে জানতে পারে যে ঐবাড়িতে কেউ মারা গেছে এবং দাহ করা বা শবদাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করে। তখন শ্মশানে প্রচুর লোকের সমাগম হয়। মৃত ব্যক্তির প্রিয় খাবার রান্না করে মেয়েরা আত্মীয় স্বজনরা শেষবারের মত খোমজাঃ তেঃরেঃ অর্থাৎ খাবার দিয়ে পূজা করতো। মাথার উপরের দিকে ধূপ জ্বালিয়ে রাখা হত। দূরদূরান্ত থেকে আগত লোকজন চাল সঙ্গে নিয়ে আসে এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। বিম্বী ধানের খই ছিটিয়ে মৃত ব্যক্তিকে শেষবারের মত প্রণাম জানানো হতো। যারা মৃত ব্যক্তির চেয়ে বয়সে বড় তারাও শেষ বারের মতো আশীর্বাদ করেন। মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির কামনায় বুদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা সূত্রপাঠ করানো হতো। কোন পুরুষ বা নারী যৌবনে এবং বয়স্ক হলেও বিয়ে হয়নি এমন ব্যক্তির কেউ মারা গেলে চিতার মধ্যে শবদেহের সঙ্গে লম্বালম্বি কলাগাছের গুড়ি কেটে এঁটে দিয়ে উক্ত শবদেহকে দাহ করা হতো।

বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বারা মন্ত্রপাঠ করে চিতার চতুর্দিকে সূতা পেঁচিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই সূতা ধরে এক সঙ্গে মন্ত্র পাঠ করে। চিতার পাশে অস্থায়ী পুকুর (ছোট) খনন করে সেখানে কাঁচা হলুদ কেটে দেওয়া হয়। চিতার উপরে সাজানো মৃতের বন্দি বাত্মটাকে তুলে দেওয়া হত। চিতার চতুর্দিকে প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে শ্মশানে শেষবারের মত পূজা করা হয়। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করে অগ্নি সংযোগ করা হতো। অস্ত্যোষ্টি ক্রিয়ার পর দিন পাখিরা ওঠার আগে খুব ভোরে শ্মশানে গিয়ে চিতার ভস্ম কুড়িয়ে (প্রাঃসিংরে) পরিষ্কার করা হয় এবং খোমজাঃ নামক খাবার ঐ শ্মশানে দেওয়া হয়। এইরূপ অস্ত্যোষ্টি ক্রিয়া অনুষ্ঠানে কোথাও কোথাও ‘নাইংছোয়েসো আকা’-নামক

এক ধরনের পাখিরূপী নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। আজকাল অবশ্য এইসব নৃত্য প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে।

এই মৃত ব্যক্তির সৎকারের কাজে যারা অংশ নিয়েছে তারা একে একে স্নান করে স্ব- স্ব গৃহে প্রবেশ করে। ঐ সময় প্রতিটি মগদের গৃহ দরজার পাশে কান্ধাই রজাং নামক কাঁচা হলুদ কেটে দিয়ে জলসহ চোঙার ভিতরে বা কোন পাত্রে দিয়ে রেখে দিতে হয়। আর একটি পাত্রে তুষ ভরিয়ে তার উপর আগুন দিয়ে রাখা হয়। মৃত ব্যক্তির বাড়ি থেকে বা শ্মশান থেকে ফিরে এলে প্রথমে স্নান করে কাঁচা হলুদের জল গায়ে ছিটিয়ে তারপর তুষের আগুনের ধোঁয়া গায়ে লাগিয়ে শুদ্ধ করে তারপর গৃহে প্রবেশ করতে হয়।

মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন ও পরিবারবর্গ সাতদিন যাবত বুদ্ধ মন্দিরে ছোয়াইং বা অন্নদান করে এবং ঐ সময় নিয়ম নীতি ও মেনে চলতে হয়। মৃত ব্যক্তির ছেলে নতুবা অন্য কোন ছেলেকে নিয়ে হলেও অর্থাৎ যারা নিঃসন্তান খোনঃ রাক্ 'সাইমনি' অর্থাৎ সাতদিনের জন্য মন্দিরে গিয়ে দীক্ষা নিয়ে শ্রমণ হয়ে থাকতে হয়। সাতদিন পরে খোনরাক্ ছোয়ে বা শ্রাদ্ধং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুর পোশাক ছেড়ে সমাজে জীবন যাপন করে থাকে। এখানে একটা বিষয়ে উল্লেখ থাকে যে, শিশুর মৃত্যু হলেও বা কেউ আত্মহত্যা করলে এরূপ মৃতদের ক্ষেত্রে অগ্নি সংযোগ করা হয় না। মাটিতে কবর দেওয়া হয়।

দোঙতঃ পোয়ে :

মগ সমাজে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ধর্মীয় গুরু পরলোক গমন করলে তাঁকে ডোঙতঃ পোয়ে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাহ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি বা গুরুকে অনেক মাসধরে বনজ ঔষধি দ্বারা মমির মত করে বায়ুশূন্য বাস্তুর ভিতরে রাখা হয়। রোজ সেখানে ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করা হয়। সুদৃশ্য 'তলা' তৈরি করে সেখানে মৃতদেহকে রাখা হয়। একটু বাতাসও যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেইভাবে ব্যবস্থা করে নিতে হয়। তারপর নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে 'দোঙতঃ পোয়ে' অনুষ্ঠানের দিনে সুন্দর মন্দিররূপী তলাকে নিয়ে তালে তালে ছন্দে ছন্দে বিভিন্ন ভঙ্গিতে গান গেয়ে নৃত্য করে। এই নৃত্য সহিং আকা নামে বিখ্যাত। তলাকে নিয়ে নৃত্য করে বলে অনেকে তলাঃ আকাও বলে থাকে। কারুকার্য করা সুন্দর রথে মৃতদেহকে রেখে দুইপ্রান্তে দুই দল লোক রথ টানতে থাকে। যে- প্রান্তে রথ চলে যাবে সেই প্রান্তের দল জয়ী বলে ধরা হবে। তারপর সুদৃশ্য কাঠের বাস্ত্র বন্দি শবদেহকে নির্দিষ্ট শ্মশানে নিয়ে মাচার উপরে পাঁচটি স্তরে সাজানো শুকনো কাঠ ও চন্দনের উপর তুলে দেওয়া হয়। মৃতদেহকে সরাসরি কাছে গিয়ে অগ্নি সংযোগ করা হয় না। প্রায় ত্রিশ হাত দূর থেকে শক্তিশালি আতশবাজি দ্বারা মৃতদেহকে পোড়ানো হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম হলো 'দোঙতঃ পোয়ে'। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই অনুষ্ঠানে এসে পুণ্যভাগ অর্জন করে।

এইরূপ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের উৎসব মগ সমাজে আজও প্রচলিত হয়ে আসছে। নানা সমস্যার আবর্তে মগ জনগোষ্ঠীদের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব সব কিছু দিনের পর দিন ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও চৈতন্যের

সাজানে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তবুও মগ সমাজে সীমিত পরিসরে প্রতিপালিত হয় বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান।

প্রকৃতির এই নিয়ম রীতি-নীতি আচার- আচরণে মগ সমাজে প্রতি বছর নূতন বছর এলেই বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে প্রার্থনা থাকে — অনাগত দিনগুলো মঙ্গলময় হোক, ফুলে ফলে ভরে উঠুক শস্যক্ষেত, পরিমিত হাওয়া বৃষ্টি জল বর্ষিত হোক, প্রবাহিত হোক এদেশের মাটিতে। শান্তিকামী মগ জনজাতিরা, পৃথিবীতে সকল প্রাণী সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকুক — এই প্রার্থনা করে থাকে।

দেবদেবীর পূজা-পার্বণ

মগ জনগোষ্ঠীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও অধিকাংশ মানুষ দেবদেবীদের পূজা করে থাকেন। মগ সমাজে বৈদ্য (ওঝা) কর্তৃক ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্রে দেবদেবীকে পূজা দেওয়ার রীতি এখনও প্রচলিত হয়ে আছে। মগ গোষ্ঠীদের পূজা-পার্বণ সাধারণত অকারনে আয়োজন হয়ে ওঠেনা, তার পিছনে কিছু না কিছু উপলক্ষ্য থাকেই। এই উপলক্ষ্য পরিবার বা বসতির রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের অব্যাহতি পাওয়ার জন্য দেবদেবীকে পূজা করা হয়। এই সব পূজা করার ধারা দুই ধরনের হতে পারে। একটি হচ্ছে বংশ পরম্পরা বা পারিবারিক নিয়ম মেনে পূজা করা। অপরটি হচ্ছে মানসীপূর্বক পূজা-পার্বণ।

কোন পরিবারে পূর্ব বংশের লোকেরা যেসব দেবতা ও দেবীকে পূজা করে এসেছে, ঐ পরিবারে বংশের নিয়ম রক্ষা করার জন্য এসব পূজা-পার্বণ করা হয়ে থাকে। পারিবারিক প্রচলিত পূজার মধ্যে যেমন— ইংনেহ পীংরে (গৃহ দেবতা পূজা), খ্যাংস্যাংমা (নদীর দেবী পূজা), সত্ভুবী (সত্য নারায়ণ পূজা), ছিনীং প্রোংরে (শনি পূজা), গ্রোংপূজরে (গ্রহ পূজা), আরংমা পীংরে (ধান্যদেবী) পূজা, ককসংচাপোয়ে (নবান্ন উৎসব) এইসব দেবদেবীর পূজা ইত্যাদি।

ইংনেহ পীংরে (গৃহ দেবতা পূজা) :

এই ইংনেহ পূজা করবার জন্য ৭/৯ টি মোরগ, চাল ও চালবাটা, মদ, বিনী ধানের খই, একখণ্ড রুই, সূতা ও বাঁশের চোঙ্গা, কলাপাতা, জল ইত্যাদি প্রয়োজন হয়।

প্রণালী :

পূজার প্রারম্ভে উক্ত বাসভবনের উঠানে কিংবা তম্যাংজইং (মাচার কিনারা) উঁচু করে নতুন বাঁশ দিয়ে 'নেহ্চাং' বা মাচাং তৈরি করে নিতে হয়। তারপর কাঁচা বাঁশ দিয়ে পাতলা করে খুঁটি গেড়ে বসানো হলে উক্ত বাঁশের মাথা চিড়ে চূর্ণ করে ফুলের ছাঁচ তৈরি করে নিতে হয়। তারপর খুঁটি বসানো প্রত্যেকটি ফাঁকে ফাঁকে ধনুক আকারের ন্যায় মুড়ে দুই মাথা বাঁশের খুঁটির মুখে গেঁড়ে বসানো হয়। এই কাজ সাধারণত নরম বেতের দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

নেহ্চাং বা মাচার এক পাশে জলপূর্ণ কাঁচা বাঁশের চুঙ্গি দাঁড় করিয়ে খাড়াভাবে রাখা হয়ে থাকে। নেহ্চাং বা পুরোহিত দ্বারা পূজার কাজ শুরু হয়। নেহ্চাং বা ওঝা বিনী ধানের খই, আতপচাল, চাল বাটা, রুই ইত্যাদি সামগ্রী নিয়ে কলাপাতার মধ্যে সাজিয়ে নেওয়া হয়। পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে গৃহদেবতার মঙ্গল-উদ্দেশ্যে মোরগ বলি দিয়ে পূজার কাজ শুরু করে। মোরগ বলি দেওয়ার পর আস্ত মোরগ রান্না করে গৃহদেবতাকে উপাসনা করে রান্না করা মোরগটিকে উৎসর্গ করা হয়। এই পূজার সময় নেহ্চাং চাল ঝাড়ার কুলার পিঠে কাঠি দিয় বাজাতে বাজাতে তালে

তালে গান গেয়ে নৃত্য করে। খই, চাল ছিটিয়ে দিয়ে পূজার কাজ সম্পন্ন করে। গ্রামের লোকজনদেরকে নিমন্ত্রণ করে সেই মোরগের মাংস দিয়ে ভোজন করানো হয়।

খ্যাংস্যাংমা (জলদেবী) পূজা :

প্রাচীন কাল থেকেই মগ জনজাতিরা সম্মিলিতভাবে জাঁকজমকপূর্ণভাবে নদীর ধারে 'খ্যাংস্যাংমা'কে পূজা দিয়ে থাকে।

প্রণালী :- বিশেষ কোন নদীর ঘাটে লোকালয় থেকে একটু দূরে খ্যাংস্যাং মাকে পূজা করবার জন্য নির্দিষ্ট একটা স্থান নির্ণয় করা হতো। প্রতি বছর ঐ স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক বাড়ি থেকে পুরুষেরা যে যার সাধ্যমত এক কিলোগ্রাম চাল ও হাঁস মোরগ, কবুতর, পাঁঠা, মহিষের মধ্যে যেকোন একটি জীবজন্তু নিয়ে পূজা দেওয়ার জন্য আসত। এলাকার সর্দার বা জমিদার এক জোড়া পাঁঠা ও অন্যান্য বাকি দ্রব্যসামগ্রীগুলো নিয়ে পূজার আয়োজন করা হতো। উল্লেখ্য থাকে যে, এই পূজা শুধু পুরুষেরাই করে থাকে। ঐঘাটে পূজার জন্য দক্ষ নেহুং বা ওঝাকে আনা হত। খুব ঘটা করে প্রত্যেক বাড়ি থেকে আনা হাঁস, মোরগগুলি নিয়ে জোড়া পাঁঠা বলি দিয়ে পূজার কাজ সম্পন্ন করা হতো। কোথাও তিনদিন যাবত পূজা চলতে থাকে।

ঐ পূজায় নেহুংরা (পুরোহিতরা) তার আলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে খঙ্গ হাতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করে। যেখানে পূজা করা হয়েছে সেই ঘাটে বলি দেওয়া পাঁঠা, মোরগ, হাঁসগুলিকে কেটে রান্না করে এলাকার সমস্ত মানুষ মিলিতভাবে ভোজন করে। ভোজন পর্ব শেষ হলে সব কিছু ধুয়ে মুছে স্নান করে তারপর বাড়িতে যেতে হয়। মগ অধ্যুষিত প্রত্যেক অঞ্চলে ঐ ধরনের সম্মিলিতভাবে পূজা করবার জন্য নদীর ধারে নির্দিষ্ট স্থান বা ঘাট নির্ধারণ করা থাকে। তবে অধিকাংশ স্থানে লোকালয় থেকে কিছু দূরে ঐ সব পূজার আয়োজন করা হতো।

শান্তির বাজার মহকুমায় জেলাই বাড়ি থেকে কলসি যাবার পথে মুহুরী নদীর ঘাটে আমার দাদু (মাতামহ) শ্রীযুক্ত সুজাউ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ঐ ধরনের খ্যাংস্যাংমা পূজা করা হতো। তবে তিনি শেষ বয়সে ঐ পূজাতে বলি দেওয়ার প্রথা ছাড়িয়ে বা তুলে দিয়েছিলেন। অতীতে বৈদ্যনামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও পুরোহিত দ্বারা ফুল, ফল, খই, গুড় ইত্যাদি দিয়ে পূজা করে জল দেবীর কাছে ক্ষমা চেয়ে পশুবলি প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বয়োবৃদ্ধাদের থেকে শোনা যায়—অমরপুর মহকুমায় গোমতী নদীর তীরে দেবতামুড়া বা ছবিমুড়ার পাহাড়ে প্রাচীন কালে মগ রাজা ধুমধাম করে নদী পূজা করতেন। ঐ পূজাতে অধিকাংশ ধাবইং বা ধামাইংরাই যোগদান করতেন। যারা দাং কিং বা তলোয়ার ধারণ করতো তাদেরকে মগ ভাষায় ধামাই বা ধাবই বলা হতো। সাধারণত পুরোহিতশ্রেণী, মন্ত্রী, যোদ্ধাদেরকে বলা হয় ধামাই বা ধাবই। শোনা যায় পূজা চলাকালীন পুরোহিত মন্ত্র বলে দা বা খড়্গ নদীতে রেখে স্রোত বন্ধ করে দিতেন। পূজা শেষ হলে আবার নদীর বন্ধ থেকে দা তুলে নিলে পুনরায় স্রোত নীচে বয়ে যেত। পুরোহিত নিজেই দাং কিংবা খড়্গ ধারণ করতেন তাই পুরোহিতকেও ধাবইং বা ধামাইং বলা হতো। পুরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা 'ত্রিপুরার রাজমালা' ৪১-৪২ পৃঃ এই কথা উল্লেখ আছে—

রাঙ্গামাটি দেশেতে যেলিকা রাজা ছিল।

সহস্র দশেক সৈন্য তাহার আছিল।।

ধামাই জাতি পুরোহিত আছিল তাহার।

অভক্ষণা খায়ে তারা সুভক্ষ্য ব্যভার।।

বৎসরে বৎসরে তারা নদী পূজা করে।

স্রোত যে শুভ্রিয়া রাখে গোমতী নদীরে।

স্রোত বন্ধ রাখে তারা পূজা যতক্ষণ।

পূজা সাঙ্গে পুনরায় স্রোতের বহন।।

এখানে ধামাই জাতি শব্দটি ‘ধাবইং’ শব্দ থেকেই পরিবর্তিত শব্দ। আজকাল এই ধরনের সকল পরিবারের পুরুষেরা সম্মিলিতভাবে নদী পূজা করে না। তবে পারিবারিক প্রথাগত নিয়ম পালনার্থে বছরে একবার হলেও কোন কোন পরিবার পাঁচা বলি দিয়ে নদী পূজা বা খ্যংস্যাংমা পূজা করে থাকে। কলেরা, বসন্ত মহামারী ইত্যাদি রোগ থেকে মুক্তি লাভের জন্য মগেরা এইসব পূজা করে থাকে। প্রাচীন কালে মগেরা রোগমুক্তি লাভের জন্য চড়ক পূজাও করতো বলে শোনা যায়।

সত্ত্ববী (সত্যনারায়ণ পূজা) :

বিভিন্ন ধরনের রোগ ও আপদ-বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য মগ জনগোষ্ঠীরা সত্ত্ববী পূজা দিয়ে থাকে। প্রাচীন কালে সম্মিলিতভাবে নদীর ধারে এই সত্ত্ববী পূজা দেওয়া হতো। তবে আজকাল নিজ নিজ বাড়ীর উঠানে বছরে একবার পূজার আয়োজন করা হয়। প্রণালী— পাঁচ পোওয়া চালের গুঁড়া, পাঁচ পোওয়া গুড়, পাঁচ পোওয়া দুধ, পঁচিশটি পাকনা কলা, পঁচিশটিকরে পান ও সুপারি, পাঁচসিকে পয়সা, নারিকেল, আখ, ফলমূল, ফুল, প্রদীপ, ধূপ ইত্যাদি দিয়ে সত্ত্ববী দেওয়া বা পূজা করা হতো। পূজার সময় সত্ত্ববী সউফো লই লই বলে প্রসাদ খাওয়ার জন্য লোকজনকে আহ্বান করতো। ঐ ডাক শুনে ছেলে মেয়েরা সত্ত্ববী খাওয়ার জন্য ছুটে আসত। এই সত্ত্ববী পূজার আয়োজন শুধু পুরুষেরাই করতে পারে।

গ্রহপূজা (গ্রোঃপূজা) :

মগ সমাজে পরিবারের শান্তি ও বিপদমুক্তির জন্য নয়টি গ্রহকে উদ্দেশ্য করে পূজা করে থাকে।

বাঁশ ও সাদা কাপড় দিয়ে একটি ঘরের আকৃতি তৈরি করা হয়। তারপর সেই ঘরের মধ্যে নয়টি কলাপাতাকে ছিঁড়ে নয়টি থালা আকৃতি তৈরি করা হয় সেই থালায় ফুল, বিনী ধানের খই, গুড়, কলা, ঘি, মধু ইত্যাদি আহারা ছিংবা (দশ রকমের বা দশামৃত) দিয়ে নয়টি বাঁশের চোঙার মধ্যে জল ভরিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। তারপর প্রদীপ, ধূপ জ্বালিয়ে বৈদ্য বা পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপাঠ করে গ্রহ পূজা করা হয়। পূজা সমাপন হলে পরিবারের সকল সদস্যকে বৈদ্যদ্বারা মন্ত্র পাঠ করে (গংছীংরে) মাথায় জল ঢেলে দিয়ে শুদ্ধ করে দেওয়া হয় ও বিপদ মুক্ত করা হয়।

এছাড়াও কোন কোনও মগ পরিবারের মধ্যে ওয়া, ওয়াগই লাবে, সাংগ্রাইং এই তিন দিন

পূজা তিথিতেও গ্রহ পূজা করা হয়ে থাকে। কারোর কোন গ্রহদোষ থাকলেও সেই দোষ কাটানোর জন্য শাস্তি লাভের জন্যও মগ সমাজে গ্রহপূজা দেওয়ার রেওয়াজ আছে।

মানসী পূজা :

লইংদাউ পীরে— শিশুরা পাতলা পায়খানা ও বমি করলে এই লইংদাউ পূজা করা হয়।

প্রণালী — এক হাত পরিমাণ দুই টুকরা বাঁশ দিয়ে ভেলার মত তৈরি করা হয়। নদীর ধারে একটি নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করে পাইংফো নামক চিকন গাছের আগাটিকে সেখানে পুঁতে দেওয়া হয়। বাঁশের ভেলার উপর কলাপাতার একটা সুন্দর টুকরা কেটে বিছিয়ে দেওয়া হয়। সেই পাতার উপর এক মুঠো চাল সাজিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে একটি মোরগ বলি দেওয়া হয় এবং মোরগের রক্ত চালের উপর দিয়ে শিশুর রোগ মুক্ত ও সুস্থ হওয়ার জন্য কামনা করে লইংদাউ পূজা করা হয়।

চুমাংলেঃ পূজা :

চুমাংলেকে অনেকে সুগীনেমা নামে ডাকে। শিশুদের জ্বর হলে, অতিরিক্ত কাঁদলে, আচমকা বা হঠাৎ ভয় পেলে অনেকে চুমাংলে পূজা দেবার জন্য মানস করে একটি মোরগ রাখে। পূজার সময় বাঁশের বেত দিয়ে চালনের মত দুইটি টুকরা বোনা হয়। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে পাঁচটি খুঁটি তৈরি করা হয়। দুইটি স্তরে ঘর আকৃতি তৈরি করা হয়। নিচের স্তরে কলাপাতা বিছিয়ে সেই পাতায় বিম্বী ধানের খই, চালের গুঁড়া ও চাউল দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। ঘরের ভিতরে যেখানে চাউল রাখা হত সেই ভাণ্ডারের কাছে এই পূজার আয়োজন করা হয়। সেই সজ্জিত পূজার পাত্রে বা পাতার মধ্যে মানস করে রাখা মোরগটিকে বলি দিয়ে ও তার রক্ত দিয়ে পূজা করা হয়। রোগী শিশুটির আরোগ্য কামনা করে পূজার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

ভদঃপীরে (ভদঃপূজা) :

জংগলে বিপদ বা রাস্তা খুঁজে না পেলে, গৃহপালিত পশু বা কোন জিনিস হারিয়ে গেলে ফিরে পাওয়ার জন্য ভদঃ পূজা দেবে বলে মানসী করা হয়।

সন্ধ্যাবেলায় একটি মোরগ, একটি কলাপাতা, একমুঠো চাউল ও আগুনের মশাল নিয়ে নির্জন জায়গায় পরিষ্কার করে সেখানে পাতা বিছিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে চাউল দিয়ে সাজানো হয়। তারপর মোরগটিকে বলি দিয়ে রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এক টুকরো মাংস আগুনে পুড়িয়ে চাউলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে পূজার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

ঠিক সেই রকম নিয়মে জোড়া কবুতর, জোড়া ডিম দিয়ে নদীতে পূজা করা হয়।

মাদ্রা পূজার (মাদ্রা নামক পেঙ্গীকে পূজা) :

কোন শিশু ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর ভীষণ অসুস্থ হয়ে পরে। মায়ের বুকের দুধ খেতে পায় না। তখন শিশুকে সুস্থ করে তোলার জন্য মাদ্রা নেমাকে পূজা দেওয়া হয়। মাদ্রা নেমার ৭ বোন, কোন শিশুর প্রতি তাদের নজর পড়লে শিশু বা মায়ের শরীর খারাপ হয়।

প্রণালী :

একটি কালো মুরগি, সাতটি বোনের জন্য সাত খিলি পান, বাঁশবেতের তৈরি খোউ

খোওয়াউ বা থালা জাতীয় জিনিসের ভিতরে ফল, খই, গুড়, কলা ইত্যাদি দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। এই পূজা শিশু যেই ঘরে থাকে সেই ঘরে চালের উপরে মাদ্রা নেমার ৭টি বোনের উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়। পূজার ছলে পুরোহিত মাদ্রা বোনেদেরকে পান খাওয়ায়, হাসি-ঠাট্টা তামাশা করে। মাদ্রা নেমার নামে পূজা দিয়ে একটি মুরগি ছেড়ে দেওয়া হয়।

আহাংউঃ ক্রীড়ে (ভাত ছিটিয়ে দেওয়া) :

নিবীমা, নগ্যামা নামে পেঙ্গী যারা নির্জন জলাশয়ের ধারে, পুরানো নির্জন গাছের গোড়ায় বসবাস করে। কোন ব্যক্তি এসব অঞ্চলে গেলে তাদের কুনজর পড়লে বিচী প্যাঁচড়া, ক্ষত ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। তখন একটি পাতার মধ্যে বাসী ভাত নিয়ে তাতে ছাই ও হলুদ মিশিয়ে দেওয়া হয়। ঐ হলুদ ও ছাই মাখা ভাত সেই নির্জন জলাশয়ে গিয়ে নিবীমা, নগ্যামাঃ নাম ধরে ডেকে খাবার ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

বছরের প্রথম দিকে আতাদা দিন থেকে একটা শুভদিন ঠিক করে সমস্ত গ্রামবাসীরা যে যার গ্রামে সম্মিলিত ভাবে দেব দেবীদের উদ্দেশ্যে পূজা করে থাকেন। পূজিত দেবীদের মধ্যে যেমন— ব্রহ্মা, শিব্রা (ইন্দ্রদেব), ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের জন্য বাঁশ ও বেত দিয়ে সুদৃশ্য কারুকার্য করা মাচার মত উচ্চাসন তৈরি করে পূজা করা হতো। অন্যান্য দেবী ও দেবতার জন্যও নদীর ধারে সঠিক জায়গা নির্ণয় করে পূজা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হতো। অন্যান্য দেবদেবীদের মধ্যে যেমন—আগা সাচো (আকাশ দেবতা), ভুমাচীঃ (ভূমিদেবী), খ্যাংস্যাংমা (নদীর দেবী), রোওয়া শ্যাঙমা (গ্রাম রক্ষাকারী দেবী), রোকখাছো (ভূতপ্রেত), তঃ অচংক (বনদেবী), তংঅচংক (পর্বত দেব), বৃক্ষদেব (রক্ষানেহ) প্রভৃতি দেবদেবীর উদ্দেশ্যে কলাপাতার অগ্রভাবে কলা, গুড়, বিল্লী ধানের খই, ফুল ও প্রদীপ দিয়ে আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখা হতো। সেই দিন গভীর রাতে সম্মিলিতভাবে দেবদেবীদের পূজা করা হয়। মগ ভাষায় এই পূজাকে পউচোঃ পূজরে ও বলা হয়। সেই রাতে গ্রামের ভিতরের মানুষ বাইরে যেতে পারে না। আবার পূজা দেওয়ার পরে বাইরে থাকা মানুষও গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। সারা বছর সমস্ত রকমের বিপদ আপদ ও রোগ থেকে মুক্ত পেয়ে শান্তি লাভের জন্য মগ জনজাতিরা এই সব পূজা করে থাকেন।

মগ জনগোষ্ঠীরা প্রচলিত লোককাহিনি অনুযায়ী তাঁরা উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মূর্তিকে তাঁদের দেবী বলে দাবী করে থাকেন। তাঁদের লোকপুরাণে আছে যে, ত্রিপুরার রাজা তাঁদের দেবী 'মগধেশ্বরীকে' চট্টগ্রামের সদরঘাট অঞ্চল থেকে চুরি করে এনে উদয়পুরে স্থাপন করেছেন।

স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ধন্য মানিক্য রসাস্তমর্দনকে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে ত্রিপুরাসুন্দরীকে ত্রিপুরায় নিয়ে এসে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠার জন্য নির্মিত মন্দিরে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিপুর বংশাবলীতেও এ-বিষয়ে একটি স্পষ্ট তথ্য দেওয়া আছে।

‘রাধাকৃষ্ণ স্থাপিবারে মঠ আরঙ্গিল।

চট্টেশ্বরী দেবী আসি স্বপ্ন দেখাইল।।

এ মঠে আমাকে রাজা কর? স্থাপন।

নতুবা অব্যাহতি তোমার নাহি কদাচন।।

এই মঠে যদি আমা স্থাপন না কর।

তবে জান রাজা তোমার নাহিক নিস্তার।।

চট্টগ্রামে সদর ঘাটে এক বৃক্ষমূলে।

পূজয়ে আমারে সদা মগ সকলে।।

সেইস্থান হতে শীঘ্র আনহ আমায়।’

(ত্রিপুর বংশাবলী)

এখানে ত্রিপুরেশ্বরী যে মগ পূজিতা দেবী সে- বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মগ জনগোষ্ঠীদের থেকে শোনা লোককাহিনির সঙ্গেও এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এছাড়া ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মূর্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে ত্রিপুরার প্রত্নতত্ত্ব গবেষক প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি দেবীর যে আঙ্গিক বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দেবীকে মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের মতো চোখ ছোটো, নাক চ্যাপ্টা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে আরণ্যক মূর্তি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও দাবী করেছেন যে, ত্রিপুরাসুন্দরী তন্ত্রশাস্ত্রে মূর্তিতত্ত্ব অনুযায়ী নয়।

অশোকানন্দ রায় বর্ধন- এর লেখা ‘মগজাতি ও দক্ষিণ ত্রিপুরার জন- সংস্কৃতিতে তার প্রভাব’ নামক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, মগদের দেবী মগধেশ্বরীর প্রভাব মগদের সান্নিধ্যে বসবাসকারী বাঙালি জনগণের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। ‘মগধেশ্বরী’ নামে অলৌকিক দেবী যে সন্নিহিত অঞ্চলে পূজিত হতেন গ্রামাঞ্চলে পূজিত হতেন তারও কিছু লুপ্তপ্রায় প্রমাণ পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এবং তৎসন্নিহিত দক্ষিণ ত্রিপুরার কিছু কিছু গ্রামাঞ্চলে ‘মগধেশ্বরী’র নামে এক ধরনের অভিচারিক পূজা করে থাকেন। স্থানীয় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী কাউকে ভূতপ্রেত ইত্যাদিতে আশ্রয় করলে, দীর্ঘ চিকিৎসাতেও তার রোগমুক্তি না ঘটলে এই ধরনের অভিচার ক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করা হতো। গ্রামের শেষ প্রান্তে খোলা মাঠের মধ্যে ‘স্যাব খলা’ নামে একটা পূজার স্থান থাকতো। ‘স্যাবা’ শব্দটি সেবা শব্দের বিকৃতি রূপ। পূজার স্থানকে এ অঞ্চলে ‘খলা’ বলা হয়। এই স্যাবাখলাতে রোগীর আরোগ্য কামনায় মানত করে অন্নবাজন রান্না করে কলা পাতার আগায় সাজিয়ে মগধেশ্বরী বা লৌকিক নাম ‘মগিনীর ডালি’ দেওয়া হতো। মগধেশ্বরী বা মগিনী দেবীর পূজা ডালির সঙ্গে দেওয়া হতো রক্তজবা ফুল। শকুন জাতীয় কোন পাখি এসে খাবার খেয়ে গেলে রোগীর রোগমুক্তি ঘটে বলে এখানকার লোকের বিশ্বাস।

সাব্রম মহকুমা অঞ্চলের বর্ধিষু গ্রাম ছোটখিলের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ফেনী নদীর চর এলাকায় এখনো ‘স্যাবাখলা’ নামে একটি স্থান চিহ্নিত আছে। তবে এখন আর এরকম অভিচার ক্রিয়ার নিদর্শন মেলে না। পঁচিশ বছর আগে পর্যন্ত তার চল ছিল। এছাড়া যেখানে বা যে- গ্রামে স্যাবাখলা নেই সেই স্থলে তে- মাথা রাস্তার মাঝখানে গভীর রাতে এই মগিনীর ডালি সাজানোর রেওয়াজ রয়েছে। স্যাবাখলা মগ ভাষার শব্দ, বিস্তারিত প্রাস্তর বা মাঠকে খলা বলা হয়।

এছাড়া গ্রাম ওঝা বৈদ্যদের মধ্যে মগিনী চালা বলে এক ধরনের কৃষ্ণ ইন্দ্রজালের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের ব্রাত্য মন্ত্রাচারে এ ধরনের একটি ছড়ার সন্ধান পাওয়া গেছে।

“মগিনীর চালা”

রোসান ১ শরে ২ বত্র ৩ নোনা হানি ৪ সেখানে জর্ম ৫ হৈল পাগলা মগিনী বাবা তোর
মগ রাজা মা তোর বেলারানি শুনরে মগিনী তোর জর্মের কাহিনী শনি মঙ্গলবারে তোর রজসনা
ও হৈল ভাইউবে দেখিলো বলি কাপড় তুলিলি আরে মগিনী অসুকার ৮ অঙ্গ ছাড়িয়া অসুকার
উপর কতান ৯ কর - দোয়াই ১০ মহাদেবের ১১ (৩বার)

(তথ্যসূত্র : নারায়ণ দে, বর্তমান নিবাস : বিজয়নগর, সার্বম দং ত্রিপুরা)।

শব্দার্থ — (১) রোসাঙ (২) শহরে (৩) বহে (৪) পানি (৫) জন্ম (৬) রজস্বলা (ঋতুময়ী)
(৭) ভাঙুরে (৮) রোগীণীর নাম ব্যবহার হবে (৯) বাহন (১০) দোহাই (১১) মহাদেবের।

ছড়াটি বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, মগিনীর জন্ম রোসাঙ শহরে। এই মগিনীর পিতা
হিসাবে মগ রাজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে মগিনীর ডালি বা মগধেশ্বরী বলতে আরাকানে অবস্থিত দোওয়াইতফং রাজার
মরে যাওয়া প্রিয় পত্নি ‘মায়োউনেমা’ কেই বলা হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

ত্রিপুরা থেকে বিতারিত হওয়ার পরও আরাকানি মগরা তাদের ফেলে আসা ধনরত্ন খোঁজ
নেওয়ার জন্য বারবার ত্রিপুরাতে এসেছিল। তখনকার দিনে সোনা-রূপা-ধন ইত্যাদি বহন করে
পদব্রজে দূর-দূরান্তে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তাদের পূর্ব পুরুষেরা তাদের গচ্ছিত ধনগুলোকে
নির্দিষ্ট জায়গায় চিহ্নিত করে মাটিতে পুঁতে রেখে গেছেন। কোথায় তাদের ধন লুক্কায়িত আছে
পুঁথিতে লিখে গেছেন। মগ ভাষায় এই পুঁথিকে বলা হত ‘সইচা জং’। যদের হাতে এই পুঁথি
পড়েছিল তারাই বার বার পূর্বপুরুষের ধনের সন্ধানে ত্রিপুরাতে এসেছিল। তাদের হারানো প্রিয়
জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হলো উদয়পুরে অবস্থিত ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্তিটি। এই
মূর্তিকে আরাকানীরা “সইমা” বলতেন। অর্থাৎ সই ক্যাবং।

দিনকাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের বিশ্বাস ও ব্যবস্থাপনারও পরিবর্তন হয়ে যায়।
ফলে লোক আধারিত কু-সংস্কারের উপর ভিত্তি করে রোগ শোক নিরাময়ের প্রচেষ্টা আজকাল
অনেকখানি কমে গেছে। তাছাড়া অধিকাংশ মগেরা নিজের আরোগ্যালাভের জন্য বিনিময়ে অন্য
প্রাণীকে বলি দেওয়া বা হত্যা করে পূজা দেওয়া পছন্দ করতেন না। এবং অধিকাংশ মগেরা
আরোগ্যালাভের জন্য বছরে একবার হলেও মাছ, শামুক, মোরগ ইত্যাদি বাজার থেকে কিনে
নিয়ে নদীতে, ও মোরগ বা কবুতরকে খোলা জায়গায় বা মন্দিরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

শুভতিথি ও পার্বণ :

প্রাচীনকাল থেকেই মগ জনগোষ্ঠীদের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তিথি
অনুসারে পূজা-পার্বণ সম্পন্ন করতে হয়। তার মধ্যে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ,
উল্লেখযোগ্য তিথি হিসাবে মনে নেওয়া হত। সাধারণত কোন রোগীর আরোগ্যালাভের জন্য
দেবদেবীকে পূজা করলে কৃষ্ণপক্ষ কিংবা অমাবস্যার দিনে পূজা করা হয়। তাহলে যেকোন
জটিল রোগ থেকে মুক্তিপ্রাপ্তি বা আরোগ্য লাভ হয় বলে মগদের বিশ্বাস। তবে যেকোন শুভ
কাজ বা পূজা শুক্লপক্ষ থেকে পূর্ণিমার দিনেই পূজা করা হয়ে থাকে। সাধারণত পূর্ণিমার দিনে

কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে তা আধ্যাত্মিকভাবে পুণ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। লোকাচার, উৎসব অনুষ্ঠান, পূর্ণিমায় ধার্য করতে পারলে শুভ বলে বিশ্বাস করা সেকালের একটা প্রথা ছিল। অমাবস্যার দিনে কোন ব্যক্তি মারা গেলে একই দিনের মধ্যে অর্থাৎ পরবর্তী মাস আসার আগে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে দিতে হয়। সেই দিনে মৃত্যুকে অশুভ লক্ষণ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়।

মগ জাতিরা দেবদেবীদের পূজার সময় যেমন গৃহপূজা, গ্রহপূজা, সত্ত্ববী পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা, ছিনিং পূজা (শনি পূজা) ইত্যাদি বিভিন্ন পূজার দিন সাধারণত শনি ও মঙ্গল বারে করে থাকে। এই দিনগুলোতে যেকোন শুভকাজ করলে সাফল্য লাভ করা হয় বলে মগদের বিশ্বাস। এছাড়া বিবাহ ও অন্যান্য বড় ধরনের শুভকাজে মগদের বৈদ্য দ্বারা দিন-ক্ষণ ঠিক করে কাজ করা হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই মগ জনজাতিরা তিথি-পার্বণ নিয়ম নীতি মেনে চলে আসছে। যেমন— বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বুদ্ধের জন্মদিন, বুদ্ধত্ব লাভের দিন ও নির্বাণ লাভের দিন— তাই ঐদিনে সমস্ত মগরা জাঁকজমকপূর্ণভাবে পূজা পার্বণ উৎসব পালন করে থাকে। আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিনে সিদ্ধার্থ (বুদ্ধ) মাতৃগর্ভে সন্ধিক্ষণের দিন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের বর্ষাবাস ও ব্রত পালনের শুরু করার দিন, তাই ঐ পুণ্য তিথিতে ওয়াছো লারে দিনে সম্মিলিতভাবে মন্দিরে বুদ্ধস্নানও পূজা ইত্যাদি করা হয়। ওয়াগ্য লারে অর্থাৎ আশ্বিন পূর্ণিমা দিনে বুদ্ধ ভিক্ষুদের ব্রত পালন ও বর্ষাবাসের শেষ অধিষ্ঠান। তাই ঐদিনেও খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সবাই বুদ্ধপূজা, উৎসব পালন করে থাকে। অনেকেই আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে শুরু করে আশ্বিন পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস যাবৎ নিরামিষ খেয়ে ব্রত পালন করে থাকেন। আবার কেউ কার্তিক মাসেও ব্রত পালন করে থাকেন। কার্তিক পুরোমাস বৌদ্ধদের বিভিন্ন ধরনের উৎসব। যেমন কঠিন চীবরদান উৎসব, হাজার প্রদীপ (ছিমিংথং) উৎসব, পাইংথং (হাজার পুষ্প) উৎসব, থমাংথং (অন্ন) উৎসব ইত্যাদি পালন করে থাকেন। এই সময় বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে অনেকেই বনবাসে গিয়ে ব্রত পালন করে থাকেন। বছরের শেষে সাংগ্রাইং (চৈত্র সংক্রান্তি) তিথিতেও খুব আড়ম্বরপূর্ণভাবে বুদ্ধকে স্নান, পূজা ও বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করে থাকে। এছাড়া অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শুক্লপক্ষের অষ্টমী, কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী মাসে এই চারদিন পূজা অর্চনা ও ব্রত পালন করে থাকে। কিছু কিছু তিথিতে আবার শুভ কাজ করা নিষিদ্ধ বলে ধরা হয়ে থাকে। যেমন আষাঢ় পূর্ণিমা থেকে আশ্বিন পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস “ওয়া” চলাকালীন মগ সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন শুভকাজ করে না। যেমন বিবাহ, গৃহযাত্রা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি শুভকর্ম করা নিষিদ্ধ।

ভাদ্র মাসে প্রথম সন্তান জন্ম হলে, অশুভ বলে ধরা হয়। ভাদ্র মাসে অমাবস্যার তিথিতে জন্ম হলে আরও বেশি অশুভ বলে ধরা হয়। সেই ক্ষেত্রে ঐ সন্তানকে মা-সহ বাঁশের ভেলায় চড়িয়ে নদীতে সাতটি ঘাট পর্যন্ত ভাসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর প্রায়শ্চিত্ত ও শুদ্ধ করে ঘরে তোলা হয়। ঘরে পালিত হাঁস, মোরগ, গরু, কুকুর ইত্যাদির ঘরে প্রথম বাচ্চা ভাদ্র মাসে ফোটাতে বা জন্ম হলে সেই বাচ্চাগুলোকে নদী পার করে অন্যত্র পাঠানো হয় অথবা মন্দিরে দান করা হয়।

তবে আজকাল এমন কঠোর নিয়ম সবাই মেনে চলে না। তবে বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে শুদ্ধিকরণ-

কাজ সম্পন্ন করা হয়।

এছাড়াও মগ জাতিদের প্রতি মাসে সমগ্রাণ্ড, পাস্‌দাউ, মুসুয়ী দোওয়াং রাপোউ এই চারটি তিথিতে চাষ বাদ যাত্রা, কাপড় বোনা যাত্রা, গৃহযাত্রা, বিবাহ, ইত্যাদি শুভযাত্রা বা কাজ করা যায় না। ঐদিনগুলোতে যাত্রা করলে কোন কাজে সফলতা আসে না বলে মগদের বিশ্বাস।

তবে তারা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে এই নিয়ম জানে না এবং মেনে চলতেও চায় না।

“পূর্ব লক্ষণ ও ইঙ্গিত বিশ্বাস” :

মগ গোষ্ঠীদের মধ্যে পূর্ব লক্ষণ ও ইঙ্গিত ও তার প্রতিফলন নির্ণয় করা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বহন করে এসেছে। তার মধ্যে, মানুষের অলঙ্ঘনীয় রীতি-নীতি হিসাবে কোন কোন পূর্ব লক্ষণ মেনে চলা প্রচলিত ছিল। আবার কোন অলীক সঙ্কেত বলে, ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করে তোলে। এইসব পূর্ব লক্ষণ ইঙ্গিতের ফলপ্রসূ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর মগ বুদ্ধিজীবীরা প্রাচীন কাল থেকেই গ্রন্থ লিখে গেছেন। ঐ গ্রন্থ “মহাদিথোং পাডাজং” নামে বিখ্যাত।

তখন থেকেই তারা ঐ রীতিনীতিকে সুদীর্ঘ যুগ ধরে লালন-পালন করে এসেছে। তার কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত পূর্ব লক্ষণ ও ইঙ্গিত বিষয়ে কিছুটা নীচে উল্লেখ করা হল। যেমন —

যাত্রাকালীন পূর্ব লক্ষণ :

যাত্রাকালে কোন নারীর চুল ছাড়া অবস্থা দেখলে অশুভ বলে ধরা হয়। খালি কলসি সামনে পড়ে থাকতে দেখলে গন্তব্য স্থলে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসতে হয়। জলপূর্ণ কলসি দেখলে যাত্রা ভাল হয়। জল ভরতে যাওয়া অবস্থা দেখলে শুভ সংকেত। যাত্রার কালে গৃহ থেকে বের হবার সময় আঘাত পেলে অশুভ সঙ্কেত বলে ধরে নেওয়া হয়। তখন পুনরায় গৃহে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ পরে, পুনরায় যাত্রা শুরু করতে হয়।

বন্যপশু গ্রামে প্রবেশ ও ডাকের পূর্ব লক্ষণ :

ম্যাউহুং (বন্য লাজুক বানর) গ্রামে ঢুকলে অশুভ লক্ষণ অর্থাৎ ঐ গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বন্যহরিণ গ্রামে প্রবেশ করলেও গ্রামের লোকদের প্রচণ্ড ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই ক্ষেত্রে হরিণকে না মেরে সাদরে বনে পাঠিয়ে দিলেই দুঃখ থেকে মুক্তি ও শুভপ্রাপ্তি ঘটে। খেওয়া (খাঁক শিয়াল) যদি গ্রামের আশেপাশে এসে বিকটভাবে ডাক মারে তা হলে এটা উক্ত গ্রামবাসীর পক্ষে চরম অশুভ লক্ষণ। তার প্রতিফলন হল, গ্রামে মহামারী হওয়া বা ঐ গ্রামে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা ক্ষতি হওয়ার অশুভ পূর্ব সংকেত। পোঁচ ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লে অশুভ লক্ষণ— কারোর মৃত্যু হতে পারে।

কাক ডাকার সংকেত :

পশ্চিম দিক থেকে এসে উত্তর দিকে কাঁচা ডালে বসে ডাকলে, অন্য লোকের বাড়িতে খাওয়ার বা ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ পাওয়া যায়। আবার শুকনো ডালে বসে ডাকলে আত্মীয়ের নিমন্ত্রণ পাওয়া যায়।

পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে বসে ডাকলে শুভ সংবাদ পাওয়া যায়। উত্তর দিক থেকে পূর্ব দিকে এসে আঃ আঃ করে ডাকলে কারোর ক্ষতির সংবাদ শোনা যায়। দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে কাকের আওয়া ওয়া আওয়া ওয়া ডাক শুনলে অতিসত্ত্বর খারাপ খবর আসে। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ থেকে আ আ আ করে ডাকলে অতিথি আগমন হয়। পশ্চিম দিক থেকে কাকেরা দল বেঁধে কা কা কা করে ডাকলে তিন দিনের মধ্যে কারোর অকস্মাৎ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর আসে।

উত্তর-পশ্চিম কোণায় কাক ডাকলে শত্রু আগমনের বার্তা বলে ধরা হয়। অর্থাৎ শত্রু আসে।

টিকটিকির ডাক সঙ্কেতঃ

উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে টিকটিকির ডাক শুনলে অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে টিকটিকি ডাক দিলে গৃহস্থের কারোর রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

কোন ব্যক্তির শরীরের নীচে টিকটিকি ডাক দিলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

মুরগির ডিম পাড়া ও তার ইঙ্গিতঃ

গৃহপালিত যেকোন মুরগি প্রথমবার ডিম পাড়ার সময় ৭টি, ৯টি, ১০টি কিংবা ১১টি ডিম পাড়লে ভাল লক্ষণ অর্থাৎ গৃহস্থের উন্নতি হবে। এর বেশি ডিম পাড়লে ক্ষতি হওয়ার লক্ষণ থাকে। তখন সেই মুরগিটিকে মন্দিরে কিংবা নদীর ওপারে ছেড়ে দেওয়া হয়। বড় আকারে ডিম পাড়লে— সেটা অশুভ লক্ষণ। সেই ক্ষেত্রে গৃহে সকল ব্যক্তির মুরগির উপর মাথা রেখে মঙ্গল ঘট থে ক মাথায় জল ঢেলে অশুভগুলি ধুয়ে ফেলতে হয়। তারপর সেই মুরগিকে মন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত ছোট আকৃতি ডিম পাড়লেও অশুভ লক্ষণ বলে ধরা হয়। তখন পূর্বের নিয়মে সকলে মাথা ধুয়ে নিয়ে ডিম-সহ মুরগিকে মন্দিরে দান করা হয়।

ঘুঘু পাখির ডাকঃ

রোদদুরে দ্বিপ্রহরে ডালে বসে কাতরভাবে ঘুঘু পাখি ডাক দিলে অশুভ বার্তার সংকেত বলে ধরা হয়। এই সময় কারোর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

স্বপ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিতঃ

প্রাচীনকালে জুম চাষের জন্য জংগল কাটবার দিনে ঐ পাহাড়কে পূজা করে ভাল ফল পাবে, না খারাপ হবে— তা স্বপ্নে দেখাবার জন্য আবেদন করা হয়। অনেকে ঐ জায়গায় কিছু মাটি বাঁশের চোঙায় ভরে বাড়িতে নিয়ে আসে। রাত্রে ঘুমাবার সময় বালিশের নীচে চোঙাটি রেখে ঘুমায়। স্বপ্নে যদি বৃষ্টি বর্ষণ দেখে তা হলে ফসল পাবার সংকেত। আগুন স্বপ্ন দেখলে অশুভ লক্ষণ। স্বপ্নে ধান দেখলে কেউ তাকে বদনাম করছে ও ঝগড়া বিবাদ বাধার সংকেত বলে ধরা হয়। নদীতে প্লাবন দেখা দিলে সেই নদীতে যদি সাঁতার কেটে পার হওয়া যায়, তাহলে কৃতকর্মের সফলতার লক্ষণ। পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারলেও সেই স্বপ্ন অতি শুভ লক্ষণ। স্বপ্নে অধিক পরিমাণে মাছ পেলে, গাছের মাশরুম পেলে তা হলে অর্থপ্রাপ্তির লক্ষণ। আবার পুরানো মৃত ব্যক্তির সাথে স্বপ্নে সাক্ষাৎ দৃষ্ট হলে, প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে বলে ধরা হয়।

দৈহিক ইঙ্গিত বা সংকেত বিচার :

চক্ষুনাচা : ডানদিকে চোখের উপরের অংশ নাচলে ভাল ভোজন লাভের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। আবার নীচের অংশ নাচলে ভোজন দেখা পেলেও খাওয়ার সুযোগ পায় না ও অশুভ সংকেত বলে ধরা হয়। চোখের বাম দিকে উপরের অংশ নাচলে শুভ সংকেত অর্থপ্রাপ্তি ও প্রিয়জনের সাক্ষাৎ মিলে।

মুখ বা ঠোঁট নাচা : ডান পাশে ঠোঁট নাচলে বা নড়লে অশুভ সংকেত। এদিনে তার দুঃখ আছে বা কারো সঙ্গে বগড়া বিবাদও হতে পারে। বাম পাশে ঠোঁট নাচলে শুভ সংকেত, সেদিন শান্তিলাভ ও হাসির সুযোগ পাবে।

বাহুনাচা : ডান দিকে কনুইএর কাছাকাছি নাচলে কারোর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। ডান দিকে বাহুর নীচের অংশ নাচলে আপনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। এগুলি পুরোপুরি অশুভ সংকেত বলে ধরা হয়।

“তন্ত্রমন্ত্র” :

প্রাচীনকাল থেকেই মগ জনজাতিরা তন্ত্রমন্ত্রকে বিশ্বাস করে থাকেন। যেমন— শিশুরা জ্বর উঠলে, রাত জেগে অধিক পরিমাণে কাঁদলে, হঠাৎ ভয় পেয়ে চমকে ওঠলে ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের জন্য গ্রামের বৈদ্য দ্বারা ঝাড় ফুঁক বা মন্ত্র পাঠ করে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করা হয়।

বয়স্কদের ক্ষেত্রেও জ্বর, মাথাব্যথা, পেটের ব্যথা, হাত পা কামড় দিলে বা ব্যথা পেলে এইসব রোগীদেরকে ঝাড়ফুঁক করে রোগ সারানোর জন্য চেষ্টা করা হতো। কোথাও হাত বা পা চমকে গেলে সেই স্থানে তেল লাগিয়ে মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে মালিশ করে দেওয়া হতো। শরীরের ছোটখাট কোন অংশ কাটা গেলে অনেক সময় রক্ত বারি বন্ধ হয় না, তখন এ ক্ষত জয়গায় ঝাড়ফুঁক করে রক্ত পড়া বন্ধ করে দিত। মন্ত্র দ্বারা জলপড়া, তেলপড়া দিয়ে চিকিৎসা করার পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। অনেকে বড় জনের প্রিয় ভাজন হওয়ার জন্য, কারোর প্রেম, ভালবাসা পাওয়ার জন্য মন জয় করার জন্য ঔষধি দ্বারা ও তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করা হত।

মগ ভাষায় এই প্রয়োগ পদ্ধতিকে বলা হয় “ম্যাখ্যি ছাং রে”।

চিহ্নিঃ দেঃ (ডাইন) :

গ্রামে হঠাৎ কেউ মারা গেলে কেউ আবার অস্বাভাবিক আচরণ করলে মগদের ওঝা বা বৈদ্যরা ঔষধি শিকড় দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে কার জন্য এই রোগ হল বা কে ভর করেছে তার নাম রোগীর কাছ থেকে আদায় করা হতো। যেই লোকটির জন্য এই রোগ হচ্ছে এ লোকটিকে চিহ্নিঃ দেহ (ডাইন) বলে চিহ্নিত করতো। তাদের ধারণা চিহ্নিদেহ তার পালিত ভূত পাগলের মত আচরণ করছে। তাই গ্রামের লোকজন সবাই মিলিতভাবে চিহ্নিদেহ নামক লোকটিকে মারধোর করে গ্রামছাড়া করে দেওয়া হত। তারা নিজেদের বাঁচবার জন্য বিভিন্ন কাজের সহযোগিতার জন্য চিহ্নিঃ নামক ভূত পালন করে থাকে। শোনা যায় প্রাচীনকালে মন্ত্র দ্বারা ভূত, প্রেত এমনকি বন্যপশুকেও বশ করে নিত। তবে বর্তমানে চিহ্নিদেহ (ডাইন) প্রথা অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আরও একটি ব্যাপারে উল্লেখ করা যায় যে, অধিকাংশ মগ জাতিরা পাপ কর্ম থেকে

বিরত থাকেন। মন্ত্র দ্বারা বা যেকোন ভাবে কারোর ক্ষতি করতে তারা দ্বিধা বোধ করেন।

আজকাল সমাজ বিবর্তনের ফলে অনেক কিছু বর্জন, অনেক কিছু আবার গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই এইসব লক্ষণ ইঙ্গিত বিশ্বাস কোনটি আদি আবার কোনটি পরে উৎপন্ন হয়েছে, তা নিয়ে বহু বিতর্কের বিষয়। তবে এটা ঠিক যে, পৌরাণিক ধাঁচের এই সব খুঁটিনাটি বিষয়গুলি মগ ভাষায় লেখাপড়ার অজ্ঞানতার কারণে ও উত্তরোত্তর চর্চার অভাবে আধ্যাত্মিক জীবন থেকে প্রায় নিশিচহ্ন হতে চলেছে।

কিছু কিছু মগ ভাষায় শিক্ষিত ও বৌদ্ধভিক্ষুশ্রেণীরা এইগুলি সংরক্ষণ করে রেখেছেন। মহা দিথোং পাড়া নামক প্রাচীন গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।

উল্লেখিত পূর্বলক্ষণ, দৈহিক ইঙ্গিত, স্বপ্নদোষ বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ের কিছু তথ্যাবলি সাক্রম মহকুমার অন্তর্গত গ্রাম বনকুল নিবাসী বিখ্যাত বৈদ্য (কবিরাজ) ও ঐতিহাসিক মংম মগ (বৈদ্য) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বনজ ঔষধ ও ব্যবহার

আদিমকালে মগ আদিবাসীরা জুমচাষের উদ্দেশ্যে পার্বত্য অঞ্চলের বনে বনে বেশির ভাগ দিন যাপন করতে হয়েছিল। তাই তাদের প্রকৃতি প্রদত্ত বনজ ঔষধ পত্রের ব্যবহার খুবই প্রসারিত ছিল। মন্ত্রতন্ত্র, কবচ প্রয়োগ, লতাপাতার গুণে রোগ নিরাময় হয়। উপজাতীয় জনগণ তা গভীরভাবে বিশ্বাস করে। প্রাচীনকালে মগ সমাজে রোগ নিরাময়ের জন্য যে- ব্যক্তি লতাপাতা, ফুল, মূল, গাছের ছাল ইত্যাদি সংগ্রহ করে যেসব অন্যলোকের চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত বা চিকিৎসা করতেন তাকে মগভাষায় ছিঃসমা বা বৈদ্য বলতেন। তবে ছিঃসমারা শুধু ঔষধ দিয়ে রোগীকে সেবা করা হয়। আর বৈদ্যরা ঔষধ দেওয়া থেকে শুরু করে পূজা অর্চনা, তাবিজও প্রয়োজনে রোগীকে তৈরি করে দেওয়া হয়। বনজ ঔষধের উপর ভিত্তি করে প্রাক্কালে মগ জনজাতির কী কী রোগে কী কী ঔষধ ব্যবহার করা হতো সামগ্রিক মহকুমার অবস্থিত মং মং বৈদ্য থেকে সংগ্রহ করা কয়েকটি রোগের ঔষধ নীচে উল্লেখ করা হল।

বমি, মাথাধরা ও পায়খানা হলে :

একটি পাত্রে পরিষ্কার খাবারের জল পরিমাণ মত নিতে হয়। পরিমাণ মত আতপচাল ভেজে জলভরা পাত্রে দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়। কুল বড়ই গাছের কিছু পরিমাণ ছাল নিয়ে ছেঁচে ঐ জলে দিতে হয়। একটি লোহার দণ্ড আঙুনে লাল করে পুড়ে নিয়ে ঐ ঔষধ ভরা পাত্রে ঢুবিয়ে দেওয়া হয়। ঐ ঔষধ রোগীকে খাওয়ালে আরোগ্য লাভ করে।

শিশুদের জ্বর ও পেটের ব্যথা :

শিউলী গাছের পাতা ছেঁচে, লবণ ও পরিমাণ মত জল মিশিয়ে এক চামচ করে দিনে তিনবার শিশুকে খাওয়ালে রোগ ভাল হয়।

দাঁতের ব্যথা :

ক) মার্সি নামক এক জাতীয় গাছের পাতা, ছাল ও শিকড় নিয়ে লবণ মিশিয়ে সিদ্ধ করে নিয়ে অল্প গরম অবস্থায় মুখে নিয়ে কুলকুলি করে ফেলতে হয়। ঐ ঔষধগুলিকে শুকিয়ে গুঁড়া করে ব্যথার জায়গায় দিয়ে রাখলে দাঁতের ব্যথা ভাল হয়।

খ) হাংফোয়ি : নামক একজাতীয় ছোট গাছ ও লজ্জাবতী শিকড় সুদ্ধ গাছ এক সঙ্গে পরিমাণ মত ঔষধ ও জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হবে। অনেকক্ষণ ফোটাতে জল লাল রঙ ধরবে। সেই ফোটানো জলকে মুখে নিয়ে কুলকুলি কয়েক বার করলে দাঁতের ব্যথার উপশম হয়।

বাত রোগের ব্যথা :

মর্সিপাতা (একজাতীয় বন্য পাতা), পাইঞ্যা পাতা (ছোট আকারে বন্য পাতা),

সাথাপাইএগ্যা, পাইং সুংছার, নাগা পাইএগ্যা, অড়ল পাতা, জাতবুসিঃ (জাইফল) পখ্যাংডেং পিপলজাত বোওয়ং (জয়ফুল/জত্রি) চুমোংছাউ (কাল জিরা), গোরুকোওয়ং (গোল মরিচ), এসব পরিমাণ মত নিয়ে ভাল করে বেটে নিয়ে ছোট ছোট বড়ি আকারে তৈরি করে নিতে হবে। সেই বড়ি ভাত খাওয়ার পর দুটো করে দিনে তিনবার খেতে দিলে বাতের ব্যথা কমে যায় বা ভাল হয়।

হাড়ভাঙা রোগীর ঔষধ :

প্রাচীনকাল থেকেই মগদের বৈদ্যরা ছিস্‌মারা তাদের বনজ লতা পাতা দিয়ে ঔষধ তৈরি করে লাগিয়ে ভাঙা হাড়কে জোড়া দিয়ে রোগীকে সুস্থ করে তোলে। তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মারা যাবার পর সকলে এই ঔষধের নাম বলতে পারে না। তবে দেখে ঔষধী গাছগুলোকে চিনতে পারে। ঔষধের নাম— লতাজাতীয় এক ধরনের নুনযুক্ত গাছ, খমাংগ্রীঃ (বন্য গাছ ও পাতা) ইত্যাদি মিশিয়ে হাড়ভাঙা জায়গায় লাগিয়ে বেঁধে (গ্রেডিংরে) দেওয়া হয়। মিশানো ঔষধগুলিকে পরিমাণ মত জল দিয়ে ভাল করে সিদ্ধ করে আধা কাপ পরিমাণে দিনে তিনবার খাওয়ালে রোগী ভাল হয়ে যায়।

গাছ থেকে পড়ে বা পিটুনি খেয়ে ব্যথা পেলো :

কাউনচাল রান্না করে রোগীকে খাওয়াতে হবে, এবং ব্যথার জায়গায় লাগিয়ে দিলে রোগীর ব্যথা কমে যায়।

গীড়ায় গীড়ায় গেঁটেবাত ব্যথা ও ফুলে যায় :

আতা গাছের পাতা ও কাঁচা হলুদ একসঙ্গে পরিমাণ মত বেঁটে নিয়ে তার সঙ্গে পরিমাণ মতো তাজা গোবর মিশিয়ে ব্যথার জায়গায় লাগিয়ে ৪-৫ ঘণ্টা বেঁধে রাখতে হবে।

দ্বিতীয় প্রণালী : ব্যথার জায়গায় চামড়ার উপর সামান্য হালকা একটু একটু কেটে দিয়ে তার উপর পরিমাণ মত গোলমরিচ, বিটলবণ গুঁড়া করে একটু গরম করে নিয়ে কেটে দেওয়া জায়গায় লাগালে ব্যথা কমে যায়।

সপউ রোগ (ডাইবেটিস) : রোগীর ঔষধ :

ঘন পাপড়ি লাল রঙ ফুলের জবা গাছের পাতা, শিউলি গাছের পাতা, কালজিরে ও লবণ পরিমাণ মত এক কিলোলিটার জলে দিয়ে সিদ্ধ করতে হবে। ঔষধ মিশানো জল চার ভাগের এক ভাগ হলে ঔষধ তৈরি হয়ে গেল। একটি পাত্রে ভরে রাখতে হবে। ঐ ঔষধ ৫ চামচ করে দিনে ৩ বার পান করলে রোগ ভাল হয়।

মোম্বাবী (নিমুনিয়া) রোগ-এর ঔষধ :

অড়ল গাছের পাতা, ছাল ও শিকড়, কালা জিরে, কাঁটা মাইড়া গাছের শিকড় ও জল সবকিছু পরিমাণ মতো নিয়ে এক সঙ্গে মিশিয়ে সিদ্ধ করে নিয়ে আধা কাপ করে দিনে তিনবার পান করলে রোগী ভাল হয়।

চুলকানি বা এলার্জি দাদ ইত্যাদি হলে :

লাউটুঃ খোয়েং (কইচাগাছের ছাল) ও শিউলি পাতা দুটো জিনিসকে ভাল করে বেটে

ছোট ছোট বড়ি আকারে তৈরি করে নিতে হবে। দুটি বড়ি করে দিনে তিনবার খেতে হবে পোয়িছি (লম্বা আকারে পাতা)কে শুকিয়ে গুঁড়া করে এক কাপ গরম জলে চা-এর চামচে পোয়িছিঃ এক চামচ ঔষধের গুঁড়া মিশিয়ে পান করলে (খালি পেটে) চুলকানি ভাল হয়। গুহাদ্বারে চুলকালেও ঐ ঔষধ পান করলে রোগী ভাল হয়ে যায়।

ওয়েফু (শ্বেতস্রাব) রোগীর ঔষধ :

সাদা রঙ ফুলের লজ্জাবতি গাছের শিকড়, সাদা রঙের বড়ই গাছের শিকড়, (জিফু আশ্র) কালাজিরা ও তালের মিশ্রি সব কিছু পরিমাণমত নিয়ে এক কিলোলিটার ভাল জলে সিদ্ধ করে শুকিয়ে তিনভাগের এক ভাগ শুধু ঔষধ মিশ্রিত জল থাকবে ঐ ঔষধ মিশ্রিত জল দিনে তিনবার তিন চামচ করে রোগীকে খেতে দিলে এই রোগ নিরাময় হয়।

গীড়ায় গীড়ায় গেঁটে ব্যথা পেলো :

সাদা রঙের ধুতুরার পাতাফল বেটে তার সঙ্গে তাজা গোবর মিশিয়ে — ব্যথার জায়গার একটু উপরে কেটে দিয়ে ঐ ঔষধ লাগিয়ে ৩ থেকে ৫ ঘণ্টা রাখলে ব্যথা উপশম হয়। প্রয়োজনে ঐ পাতারও স্যাক দেওয়া যায়।

ক্যান্সার রোগীর ঔষধ :

থনা গাছের ছাল, টেঁড়সের বা টেঁড়স গাছের শিকড়, দুটি লঙ মিশিয়ে পরিমাণ মত বেটে নিতে হবে। কালো গাভীর মূত্র নিয়ে ঐ বাটা ঔষধের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে ক্ষতস্থানে লাগালে ভাল হয়। ঐ বাটা ঔষধকে ছোট ছোট বড়ি আকারে তৈরি করে নিয়ে আধাকাপ গো-মূত্র-এর মধ্যে দুটি বড়ি ভাল করে মিশিয়ে দিনে তিন বার ক্যান্সার রোগীকে খাওয়াতে হবে।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদেরকে অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকেও রোগ হলে প্রয়োজনে গো-মূত্র পান করবার জন্য অনুমতি দিয়ে গেছেন।

চোখের রোগ :

নিজের সদ্য প্রস্রাবের জল চোখে দিলে চোখের চুলকানি, চোখফোলা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগের উপশম হয়। শামুক গায়ের জল চোখে দিলেও ফলপ্রসূ হয়।

রোমোয়ীং ঔষধীয় বাষ্প দ্বারা চিকিৎসা :

সূর্যীফ্রক্যে (সুতিকা রোগী) বা অনেকদিনের পুরানো শয্যাশায়ী রোগীকে রোগমুক্ত করার জন্য ঔষধীয় বাষ্প দ্বারা চিকিৎসা করানো হয়। মগ ভাষায় ঔষধের নাম যেমন - কাংস্থোয়েং গাছ (শিকাকায়) নামক গাছের শিকড়, তরংগাছের পাতা, ফালা গাছের পাতা ও শিকড়, চুলাংব্রেং (আপাং) গাছের পাতা, পুলেং গাছের শিকড়, গোল মরিচের গুঁড়া, জাথুবোসী (জাইফল)- এর গুঁড়া, পেখ্যাংডেং (পিপল) লং বা লবঙ্গ ফুল, চমুংগা (পাঁচ রকমের ফোড়ন) ইত্যাদি মিশিয়ে গুঁড়া করে একটি পাত্রে জল দিয়ে ভাল করে সিদ্ধ করে নিতে হবে। পাত্রটির মুখ কলা পাতা দিয়ে ভাল করে ঢেকে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাষ্প বাইরে যেতে না পারে। সিদ্ধ হয়ে গেলে ঢাকা পাত্রটির মাঝখানে একটি ছোট ছিদ্র করা হবে। ঐ ছিদ্রটির উপরে রোগী উপুড় হয়ে বসবে যাতে সরাসরি তার মাথায় ঔষধি বাষ্প লাগে। ঐ সময় রোগীকে উপর থেকে মোটা চাদর দিয়ে ঢেকে

প্রায় এক ঘণ্টার মত রেখে দেওয়া হয়। এইভাবে তিন চার দিনে করলে রোগীর মাথা পাতলা হয়, আরোগ্য লাভ করে।

ঘম্বা রোগের চিকিৎসা :

পাঁঠার মাথা, হাত ও পায়ের অংশ ভাল করে কেটে ধুয়ে—পেঁয়াজ, গোল মরিচের গুঁড়া, কাঁচা হলুদ বাটা, লবণ পরিমাণমতো একটি পাত্রে দিয়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে ভাল করে তেল ছাড়া সিদ্ধ করতে হবে। মাংসগুলি সিদ্ধ হয়ে গেলে ঐ জল রোগীকে আধা কাপ করে দিনে তিনবার ভাত খাওয়ার আগে খেতে হবে। ছাগলের লুম আগুনে পুড়িয়ে গন্ধ শুকতে হবে। এতে ঘম্বা রোগ প্রশান্ত হয়।

আমাশয় রোগীর পথ্য :

পাঁঠার মাথাকে কাঁচা হলুদ বাটা, গোল মরিচের গুঁড়া, লবণ, রসুন, পেঁয়াজ দিয়ে তেল ছাড়া রান্না করে খেতে দিলে আমাশয় রোগ ভাল হয়ে যায়।

মাথাধরা বা ব্যথা হলে ঔষধ :

বেল গাছের পাতা, ছাল, শিকড়, কচি বেলের গুঁড়া, কালোজিরা সব মিশিয়ে গুঁড়া করে ছোট ছোট বড়ি আকারে তৈরি করে রোদে শুকাতে হয়। সেই বড়ি দুটি করে দিনে তিন বার খেতে দিলে রোগী সুস্থ হয়।

নাক দিয়ে রক্ত বেরুলে এই ঔষধ সেবন করলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

বাতের ব্যথার ঔষধি চা :

নোয়ীবথী আরোওয়উ (লতাজাতীয় বটের পাতা), সুংফাইংলা গাছের পাতা, লাচুনোয়ী (লতাজাতীয় গাছ) শিকড়, গুচিহাং (লতাজাতীয় গাছ), গাছের পাতা, তংবেত্রা (বড় আকারে গোলা গোলা) পাতা, জাথবোসী (জাইফল), কখ্যাংডেং (পিপল), জাথবোওয়ং (জত্রি), গারোকোওয়াং (গোল মরিচ) সব কিছু পরিমাণ মতো নিয়ে গুঁড়া করে অর্থাৎ পাতা ও শিকড়ের অংশ দুই ভাগ, তার অর্ধেক বাকি ঔষধ মিশিয়ে গুঁড়া করে রাখতে হবে। এক কিলো লিঃ জলে এমিশ্রিত ঔষধি গুঁড়া তিন চামচ দিয়ে ভাল করে সিদ্ধ করে নিতে হবে। সেই ঔষধি জলকে চায়ের মত দিনে তিন বার খেতে হবে। এতে হজম হয় ও বাতের ব্যথাও উপশম হয়। কমপক্ষে তিন মাস খেলে পুরোপুরি রোগী ভাল হয়ে যায়।

প্রাচীনকাল থেকেই মগ জাতিরা ঔষধি চা পান করে থাকে। উপরিউক্ত ঔষধি চা ছাড়াও ডাংগী নামক একধরনের ছোট গাছের ফলের শুকনো বিচী জোগাড় করে গুঁড়া করে রাখা হত। জল সিদ্ধ করে ডাংগীর বিচির গুঁড়া একটু দিয়ে দিলে লাল রঙ ধরে খেতেও সুস্বাদু হয়। যারা টক খেতে পছন্দ করে, তারা কাংস্হোয়েং (শিকাকায় গাছের কচি পাতা বা শীর্ষক অংশ দিয়ে জল সিদ্ধ করে দুপুর বেলা অনেকে পান করে। এইগুলি পান করলে অলসতা ভাব কেটে যায়।

ছাইবাং মোচা (চুলের কলপ) :

আগ্নিশিতা গাছের শিকড়, ছেইংসী (বহেরা), কজুসী (হরিতকী), রেমি (খোয়ে), রেমিং নামক গাছের ছাল, ম্যউখলং গাছের পাতা, সবগুলি মিশিয়ে ভাল করে বেটে সাদা চুলে ভাল

করে মেখে এক ঘণ্টার মত রেখে দিতে হবে। এক ঘণ্টার পর ধুয়ে ফেললে চুল কালো হয়ে যায়।
চুলপড়াও বন্ধ হয়।

চুল পরিষ্কার করার ঔষধ :

কাংস্থোয়েং সী (তেঁতুলের মত জংগলিফল) সিদ্ধ করে কচলিয়ে মাথার চুলে ভাল করে মেখে জল দিয়ে ধুয়ে দিলে চুল খুসকিমুক্ত সুন্দর রেসমী চুল হয়।

তিল পাতাকে ভাল করে কচলে নিলে লোদ লোদ ফেনা বের হয়। সেই ফেনা দিয়ে মাথার চুলে লাগিয়ে পরিষ্কারভাবে মাথা ধুয়ে নিলে চুল খুব নরম ও সুন্দর হয়। ছলইন্দ্র নামক গাছের শিকড় দিয়ে এই পদ্ধতিতে ধোয়া যায়।

এছাড়া তেঁতুল, আম, চালতা ইত্যাদি সিদ্ধ করে জল দিয়ে মাথা ধুইয়ে নিলে চুল পরিষ্কার হয়।

পেটের ব্যথা ও জ্বালাপোড়া করলে :

য়োছিঃ (এক জাতীয় বনজ বৃক্ষ), ছিঃ কামীং (একজাতীয় লতাগাছ), সম্মাপংজ্জো (সর্ব রোগের মহা ঔষধী গাছ), জাতবুসী (জাইফল), নেংসানিং (লাল চন্দন), নেংসাফু (সাদা চন্দন) সবগুলোকে ভাল করে বেটে আধাকাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে ব্যথা ও জ্বালাপোড়া বন্ধ হয়। প্রয়োজনে এই ঔষধ পেটে ও বুকে মালিশ করা যায়। এই কয়েকটি ঔষধ প্রতিটি মগ পরিবারে অবশ্য সংরক্ষিত থাকে। তবে আজকাল আর এগুলি যত্ন করে রাখে না।

সজারুণ বুন্ বুন্ লেজের শেষ অংশ দিয়ে তাবিজ বানিয়ে শিশুদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া সুস্থ বা রোগমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতেও তাবিজ বানিয়ে রোগীদেরকে দেওয়া হয়। গ্রহদোষ থাকলে কেটে ওঠার জন্য, সুস্থ ও সমৃদ্ধির জন্যও তাবিজ ব্যবহার করা হয়।

আহারের সঙ্গে বনাজী ব্যবহার :

মগ জনগোষ্ঠীর আহার হিসাবে খাদ্য উপযোগী বনজ ঔষধ ব্যবহার করে থাকে। এই সব ঔষধ গাছ ঘরের আঙ্গিনায় বা জুমে অন্যান্য ফসলের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন করে থাকে। আবার অরণ্য ছড়া, জলাশয় থেকেও বিভিন্ন জাতীয় ঔষধি খাবার জোগাড় করে থাকেন। কজস্যে নামক এক জাতীয় চিকন পাতা ও শিকড় জন্ডিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী ঔষধি গাছ। এই গাছের কচিপাতা তরকারি হিসাবেও খাওয়া যায়। রিয়াং খোনিং জলাশয়ে কিংবা ভিজা মাটিতে প্রাপ্য তিজ্জ শাক ডাইবেটিস রোগীর জন্য ভাল ঔষধি শাক। বাতের রোগীর জন্য বদ হজমের ঔষধি শাক। হাংফোয়ীঃ নামক জুমে বা পরিত্যক্ত জায়গায় প্রাপ্য শাক এই শাক বাতের ব্যথায় যেমন উপকারী তেমনি দাঁতের ব্যথাও ভাল হয়। এছাড়া মাংখোওয়া (থানকুনি পাতা), চুউসো (কাঁচা মাইড়া শাক), গাইং রউমা, মহংখোয়েং, গাঁইকদনীং, কোলমাপোং, হরস্যে, বংস্যে, বোংগ্যোয়েং, ফোংগ্যোয়েং ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শাক মিশিয়ে আপ্রাইং সিদ্ধ করে মগ জনজাতিরা খেতে ভালবাসে। থানকুনি পাতা, নিমপাতা একটু করে কাঁচা হলুদ ও একটু গুড় মিশিয়ে রোজ খালি পেটে খেতে দিলে শরীরের চর্মরোগ পেটের ব্যথা বদহজম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কলাগাছ, বিষকচু, পেঁপে, লাউ, শশা, কলা ইত্যাদি গাছ ও ফল অতুলনীয়

ঐষধ— পাশাপাশি দৈনন্দিন ব্যঞ্জনের আহারও বটে।

চোখের রোগীদের জন্য শামুক গায়ের জল খুবই ফলপ্রসূ। শামুক অবৃদ্ধি শিশুদেরকে খাওয়ালে বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। রক্তহীন রোগীদের কুইচা মাছ খাওয়ালে সুস্থ ও রক্ত বৃদ্ধি হয়। এই মাছ যেমন সুস্বাদু তেমনি এর তাজা রক্ত টাক পড়া মাথায় লাগালে চুল গজিয়ে ওঠে জাফেঃ মাছকে কাঁচা হলুদ বাটা, গোল মরিচ, আদা, পেঁয়াজ দিয়ে সিদ্ধ করে খাওয়ালে হাম বা জলবসন্ত রোগ তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।

তাছাড়া অঙ্গের কোন অংশ কাটা গেলে, রক্ত বের হলে আচুনাই (দুরকী) গাছের কচি পাতা, পাইংব্রীঃ (কঁচু)র কচি পাতা থোং (চুন), পুরানো ছনের গুঁড়া, এই গুলিকে ভাল পেষণ করে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয় ও ক্ষতস্থান শুকিয়ে যায়। গায়ে কোন স্থানে আঙনে পোড়া গেলে বা ছোটখাট কাটা গেলে রোওয়ক্যাপাংবঃ (পাথরকুচি) পাতা ছেঁচে এর রস লাগিয়ে দিলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। ফোঁড়া উঠলে মাথার জায়গাটা খোলে দিয়ে ওয়উখীদুং গাছের পাতা লাগিয়ে রাখা হয়। ফোঁড়ার উপরে হাতির দাঁত বা শঙ্খ ঘষে লাগিয়ে দিলে উপকার পাওয়া যায়। আছাড় খেয়ে বা কোথাও পড়ে হাত বা পা মচকে গেলে, কোন হাড়ে ব্যথা পেয়ে ফুলে গেলে কাঁচা হলুদ বেটে অল্প গরম করে ব্যথার জায়গায় লাগিয়ে কাপড় দিয়ে এক রাত বেঁধে রাখতে হবে। এই ভাবে দু-তিন রাত করলে ব্যথা ও ফোলা কমে যায়।

প্রাচীনকালে মগ বৈদ্যরা তরল জাতীয় ঔষধে চুবিয়ে সূচ দিয়ে আঘাত করে ব্যথার জায়গাতে চিকিৎসা করতেন।

সাঁক দিয়ে চিকিৎসা :

বাতের বা হাড়ের ব্যথা রোগীকে আকন্ড গাছের পাতা, ধুরুরার পাতা, বিষ কচুর পাতা আঙনে গরম করে ব্যথার জায়গায় সাঁক দিলে ব্যথা উপশম হয়। আবার বিভিন্ন জাতীয় লতা পাতা শিকড় মিশিয়ে পেষণ করে ঐ ঔষধ কাপড়ে পোঁটলা বেঁধে ফুটন্ত জলের উপর রেখে গরম অবস্থায় রোগীকে সাঁক দিলে রোগীর ব্যথা বেদনা কমে যায়।

তাবিজ বা কবজ দিয়ে চিকিৎসা :

মগ সমাজে কোন কোন রোগ যেমন নোয়াবী, ওয়ীলুউতে (কেঁপে কেঁপে জ্বর বা দাঁত খিছে শরীর বেঁকে ওঠে) এইরূপ শিশুরোগীকে ম্যাউহুং মোয়ী (লজ্জাবতী বানরের লুম) ফ্রোঃ ছুলেঃ দিয়ে তাবিজ বানিয়ে শিশুকে পরালে এই সব রোগ হয় না বলে মগদের বিশ্বাস। ফ্রোঃ ছুলেঃ সজারন লেজের অংশ।

জোয়া পণ্যাডি উৎপাদনে বনাজী :

প্রাচীনকালে মগ জনগোষ্ঠীরা দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করতে হতো বলে তাদের দৈনন্দিন জীবনে তারা প্রকৃতিপ্রদত্ত জিনিস-এর উপর নির্ভর করে চলতে হতো। যেমন, শুকনো লাউকে ভাল করে ধুয়ে নিয়ে সেই লাউতে লবণ, জল বা অন্যান্য জিনিস সংরক্ষণ করে রাখত। গর্জন গাছ, ধূপ ইত্যাদি গাছের কস জমিয়ে নিয়ে রাত্রিবেলায় জ্বালানি প্রদীপ জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হতো। বেড়ন ফলের শুকনো বিটিকে পিষে তেল বের করে নিয়ে প্রদীপ জ্বালাত।

বৌদ্ধভিক্ষু বা বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের পুঁথিতে লেখার জন্য নিজেরা কালি তৈরি করতেন। তখনকার দিনে ভূজপাতা, তাল পাতায় লিখে পুঁথি আকারে বেঁধে রাখা হতো। পরবর্তী সময়ে তিনটি পাতা নিয়ে বেল ও আঠা জাতীয় ফলের আঠা দিয়ে লাগিয়ে একটি মোটা পাতা তৈরি করতেন।

গাউসী (গাব ফলের) রস, বেল ফলের আঠা নিয়ে এক সঙ্গে মিশিয়ে জ্বাল দেওয়া হতো। ঘন হয়ে এলে চকচকে সুন্দর কালো রঙের কালি তৈরি হয়। বাঁশের কণ্ঠ বা পাখির পালক দিয়ে এই কালিতে চুবিয়ে চুবিয়ে ভূজপাতায় তাঁরা লিখতেন। এই কালি সহজে নষ্ট হয়ে যায় না।

বস্ত্রের রঙকরণঃ

প্রাকৃতিক তুলা থেকে তৈরি করা সূতা সব সময় সাদা রঙ হয়ে থাকে। রঙ বেরঙের পোষাক পরিধান করার সচেতনতা তখনও মানুষের মধ্যে প্রবণতা ছিল। তাই সেকালের মানুষ বনাজীর লতাপাতা, গাছের ছাল, শিকড় ইত্যাদি দ্বারা কালো, লাল, সবুজ, খয়েরি রঙ তৈরি করত। প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সখৌছোঃ চীবর পরিধান করতেন। সখৌছোঃ সাংগ্রাইঃ শব্দের অর্থ হলো গাছের ছালের রসে চুবিয়ে রঙ করে নেওয়া কাপড়। আম, তেঁতুল, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের ছাল নিয়ে বড় একটি পাত্রে জল দিয়ে সিদ্ধ করে নিতে হয়। অর্ধেক জল শুকিয়ে গেলে ছালগুলো তুলে নিয়ে ঐজলে সাদা সূতা বা কাপড়গুলো তুলে নিয়ে ঐ জলে সাদা সূতা বা কাপড়কে নিয়ে পুনরায় সিদ্ধ করে নিতে হয়। তখন ঐ কাপড় খয়েরি রঙ ধরে। আমি ছোট বেলায় দেখেছিলাম আমার দাদু সুজেইওঃ চৌধুরীর বৌদ্ধ মন্দিরে ভিক্ষু এই পদ্ধতিতে সাদা কাপড়কে খয়েরি রঙ করে “সখৌছোঃ সাংগ্রাইঃ” পরিধান করতেন। অর্থাৎ গাছের ছালে রঙ করা চীবর পরতেন। প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কালি তৈরি করে তিনি পুঁথি বা গ্রন্থ লিখতেন।

লাল রঙ তোলার জন্য কাঁচা হলুদ বেটে নিয়ে চুনের সঙ্গে মিশিয়ে সাদা কাপড়কে দিয়ে সিদ্ধ করে নিলে লালরঙ ধরে। আবার অমূল গাছের মূল তুলে পিষিয়ে খারের জলে মিশিয়ে বস্ত্র বা বস্ত্র বয়নের জন্য সূতাকে সিদ্ধ করলে লাল রঙ ধরে।

গাউসী (গাবফল), চছইংসী (বয়েড়া), কজুসী (হরিতকী) ইত্যাদি ফল ও কষ মিশিয়ে সিদ্ধ করলে কালো রঙ ধরে। এই ভাবে সূতাকে বিভিন্ন রঙ করে তারপর পছন্দ মতো কারুকার্য বা নকসা তুলে কাপড় বোনা হতো।

মোম তৈরি করাঃ

মধু পোকের বাসা ভেঙে নিয়ে মধুর রস পিষিয়ে বা চিবিয়ে নেওয়ার পর বাকি অংশটিকে চোঙার ভিতরে পুড়ে আগুনে ভাল করে জ্বাল দিলে ঐ পিষানো বাকি অংশ গলে গিয়ে মোম তৈরি হয়ে যায়। ঠান্ডা হয়ে গেলে চোঙটাকে কেটে মোমটাকে বের করে নিতে হয়। বস্ত্র বয়নের সূতাকে মোম দিয়ে ঘষে মজবুত করে নেওয়া হত। কোন পাত্র ছিদ্র হয়ে গেলে এ মোম দিয়ে গরম করে ঠিক করে নেওয়া যায়। সেই মোমকে বাতি আকারে তৈরি করে প্রদীপ জ্বালানো হত।

শিকারের বনাজী ব্যবহারঃ

মগ জাতিরা বন্য ঔষধ প্রয়োগ করে অতি সহজে মাছ ধরতে পারতেন। কোন মাছভরা

আলম জলে ছোট আকারের জন্য উদ্ভিদ বা গাছের মূল পেয়ণ করে জলে গুলিয়ে দিলে আধ ঘণ্টার মধ্যে মাছগুলি নেশাগ্রস্ত হয়ে ভেসে উঠবে, তখন অনায়াসে এই জলের উপর ভাসন্ত মাছগুলিকে ধরে ফেলতে পারে। গর্জন ও বট গাছের কষ চোঙার মধ্যে জমিয়ে নিয়ে সেই আঠা জমানো চোঙার ভিতরে লম্বা লম্বা কাঠি ডুবিয়ে রেখে দিলে এবং এই আঠা লাগানো কাঠি মাঝিয়ে রাখলে পাখিরা এই কাঠির উপর যদি বসে পাখির পায়ে ও পাখনায় আঠা লেগে যায়, আর উড়ে যেতে পারে না, গাছের নীচে পড়ে যায়। তখন পাখিকে অনায়াসে ধরে ফেলতে পারে।

শিক্ষা ও ভাষা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষার সংস্পর্শে এলে মানুষের মনে জড়তা কেটে যায়, নূতন বোধের জন্ম হয়। ভারতবর্ষে অন্যান্য জাতিদের মতো মগ আদিবাসীদের মধ্যেও তাদের ভাষা ও শিক্ষা লাভের জন্য নিজস্ব বর্ণলিপি ও ভাষা বিদ্যমান। মগ জনগোষ্ঠীদের বর্ণমালা বা লিপিকে শ্রাইমা চা বলা হয়। এই বর্ণমালার সঙ্গে মগ বা মারমার একটি নিবিড় যোগসূত্র ও বন্ধনে আবদ্ধ। তাই ভাষা ও শিক্ষা বিষয়ে পর্যালোচনার প্রারম্ভে অধিক কাল মগ জনজাতিরা পদে পদে হিংসাত্মক ও বৈষম্য আচরণে শিকার, দেশ দেশান্তরে যাযাবর জীবন যাপন তার ইতিবৃত্ত নিচে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্তের মাধ্যমে পরিস্ফুটভাবে অবতারণা করে যাবো যে, মগ জনজাতি সম্পর্কে, এরা কারা ?

পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে যে ‘মগ’ শব্দটি বিজাতীয়। কোন অভিধানে মগ শব্দটির অর্থ আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু মারমা বা শ্রাইমা নামক একটি জনগোষ্ঠী বা জাতিসত্তার অস্তিত্ব প্রাচীন কালেও ছিল বলে জানা যায়। আনুমানিক নবম ও দশম শতাব্দীতে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ও তিব্বতী দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীভুক্ত ‘স্রাম্মা’ নামের এক জাতি প্রাচীন ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে উপস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায় (মংক্যশোয়েনু ১৯৯৮)। ‘মারমা’ শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে মূলত ‘মায়াইমা’ শব্দ থেকে (ক্যশৈপ্র ১৯৯৪)। ষষ্ঠ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদী অঞ্চলের লোকেরা বর্মীদের কাছে তলইং নামে পরিচিত ছিল। তাদের রাজ্য ছিল হাইসাওয়াদী (হংসবতী)। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ‘পেগু’। ‘সাহমালা’ (সমল) ও ‘ওয়িমালা’ (বিমল) নামক দু’জন তলইং রাজপুত্র তাদের নেতৃত্বে প্রায় ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে এই পেগু নগর গড়ে তুলেছিল। সে-সময় নৌ-পথে এরাই সর্বপ্রথম ‘শ্রাইমাচা’ বা ‘মারমাজা’ নামক বর্ণমালা বার্মার দক্ষিণ-পূর্বাংশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। ‘যেহেতু মারমা জনগোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষগণ এই প্রাচীন হস্তলিপির মাধ্যমে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে এবং নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এই হস্তাক্ষরের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে নিজ বংশ রক্ষা করে চলেছে, সেই হেতু আজ এরা নিজ গোষ্ঠীসহ অপরাপর জনগোষ্ঠীর কাছে নিজেদেরকে ‘মারমা’ নামে পরিচয় দিয়ে থাকে (মংক্যশোয়েনু ১৯৯৮)।

মূলত এই মারমা জনগোষ্ঠীকে অতীতে কোথাও আরাকানী মগ, কোথাও খ্যাঙসাং, কোথাও জুম্ম পাহাড়ীয়া প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদেরকে ‘মারমা’ নামেই পরিচয় দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর মারমারা বাংলাদেশে সরকারিভাবে ‘মারমা’ জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।

‘মারমাজা’ নামক বর্ণমালা অতীতকালে বা প্রাচীন সেই রূপে ব্যবহৃত হতো — বর্তমান কালের বর্ণের সঙ্গে মিল নেই। অতীতের অর্থাৎ Northern Brahmi Script থেকে গুরু

করে Dannyawadi Brahmi Vesali Script (1st period) Vesali script (2nd period) Lemro script-Mrank-U script পর্যন্ত বর্ণমালাগুলো পরিবর্তন হয়ে এসেছিল। Mrank-U script (15th to 10th Century) সেই বর্ণমালা সংশোধন ও সংযোজন করে ব্যবহৃত হয়েছিল। সেই বর্ণমালার সুন্দরভাবে মায়ানমার দেশে আরাকানী ও মগ জনজাতিদের মধ্যে প্রচলন বা ব্যবহার হয়ে আসছে। বর্ণমালা একই রূপে ব্যবহার হলেও

মগ বা শাইমা বর্ণমালা (উচ্চারণসহ)

က কখী	ခ খাঐখ	ဂ গাঙে	ဃ ঘাঘী	င ঙা
စ চাখুং	ဆ ছালিং	ဇ জাগৈ	ဈ জব্রংছৈ	ည ঞা
ဋ ডসুলাংএাধেক	ဌ ঠাওয়াইংবে	ဍ ডারেংগক	ဎ ডারিয়ক	ဏ ণাঘী
တ টাওয়াইংবু	ထ ঠাছাইঠুং	ဒ ডাউডে	ဓ ডাউখাইক	န নাঙে
ပ পাডক	ဖ ফাওয়াইংঠোক	ဗ বাডধেক	မ বাগুং	မ মা
ယ য়া	ရ রা	လ লা	ဝ ওয়া	ဆ সা
	ဟ হা	ဇ লাঘী	အ আ	

အ। အာ। က္က। ဤ။ ဥ။ ဦ
 အা আ ই ঈ উ ঊ
 ဧ। အဲ। ဩ။ ငွေ့။ အံ။ အား
 এ ঐ ও ঔ এং আঃ

উচ্চারণের দিকে বর্মী দেশের লোকের সঙ্গে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার বাসিন্দা মগ জাতিদের কিছুটা তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। এই মগ জনগোষ্ঠীরা, ঐতিহাসিক কালের বিভিন্ন যুদ্ধ, ভৌগোলিক বিবর্তন, সংঘর্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে— দেশ থেকে দেশান্তরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাযাবরের মতো ঘুরতে ঘুরতে তাদের জীবনে বাঁচার জন্য লড়তে লড়তে এই সব বর্ণমালায় লিপিবদ্ধ পুস্তক বহন ও শিক্ষা গ্রহণ থেকে অনেকেই অনেক দূরে সরে গেছেন। এত সংঘর্ষ-বিপর্যয়ের মধ্যে জীবন কাটালেও কিছু সংখ্যক মগ ভাষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা তাদের হস্তাক্ষরগুলি সংরক্ষণ করে গেছেন ও নতুন করে ভূজপত্রে ও পরবর্তী সময়ে কাগজে লিখে রেখে গেছেন।

তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ও গ্রন্থ থাকলেও ত্রিপুরার মগ জনগোষ্ঠীদের মধ্যে নিজস্ব ভাষায় লেখাপড়া শেখার আগ্রহ তেমন লক্ষ্য করা যায় না। শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ধর্ম বা উপদেশ বিষয়ক আলোচনার জন্য মগ ভাষায় লেখাপড়া শিক্ষাগ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য এখনও কোন কোন বুদ্ধ মন্দিরে মগ ভাষায় লেখাপড়া শেখানো হয়। কিছু সংখ্যক ছেলেরা সামাজিক নিয়ম ও ধর্মীয় আচার আচরণ শিখবার জন্য বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে মগ ভাষায় নিজস্ব লিপিতে লেখাপড়া শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। মগ ভাষায় প্রথম বর্ণমালা শিক্ষার প্রথম পুস্তকের নাম ‘স্বাং-বুকসাং’। এছাড়া আরও তছিং লান (বারমাস্যা), আহীরোয়ে, তাছিনলা, অনৌক রোয়ে, কাপ্যা, গসলা মাংইংমাউ, কাইংফানাডেঙ, রাজওয়ং, সাইংমারাজওয়ং, জাইম্বোদীপা নিংপো ক্যাইন, পাদম্বাদেওয়ী, লগানীতি, কম্মা ওয়াজা, মনুসাইংহিতা, সম্মুহাদা দম্মা সাইত ক্যাইন (Law of interitence) ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন গ্রন্থ বিদ্যমান।

মগজনজাতিদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম। তবে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা সরকারী বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরেজিভাষায় লেখাপড়া করে। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মগেরা বিভিন্ন দপ্তরে সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত আছেন।

ভাষা :

মগজনজাতিরা নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। তবে মগদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে আছে। যেমন, খ্যঙসা, পালাইনসা, কক্‌ডাইনসা, লুঙদুকসা, ফাঙসা, পালাইঙেসা, ক্যউফাসা, রাইনব্রেসা, আওয়াগ্যোয়েনসা ইত্যাদি বিভিন্নগোত্র ও অঞ্চলের মগজনজাতিরা বিভিন্ন সুরে ও উচ্চারণে কথা বলে থাকে। এই ধরনের ভাষা উচ্চারণের বিচিত্রতা বাঙালিদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। মারমা বা মগ ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, কণ্ঠ স্বরধ্বনি অনুসারে ক্যশৈঞ্চ মারমা তাঁর লেখা প্রবন্ধের নাম ‘মারমা নৃ-গোষ্ঠীর সঙ্গীত ও নৃত্য’ এগার প্রকার তারতম্য বা বিভাগ করে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন রেগেসাচঘাং বা খ্যংসাচঘাং, কক্‌দইংসা চঘাং, ওয়াইসা চঘাং, মারোসা চঘাং, ক্যকফাসা চঘাং, ফরাংসা চঘাং, লুংগদুং সা চঘাং, পল্লাইসা চঘাং, অওয়াগ্যোয়াইংসা চঘাং, রামাইনসা চঘাং, বামমা চঘাং ইত্যাদি।

মগরা নিজেদের ভাষায় আত্মীয়তা সম্বোধন করে থাকলেও তাদের কিছু কিছু শব্দ বাংলা শব্দের সঙ্গে মিল আছে। ত্রিপুরী বা ককবরকভাষী অন্যান্য উপজাতিরাও বাংলা শব্দ গ্রহণ করা থেকে মুক্ত নয়।

নীচে বাংলা অর্থসহ ত্রিপুরী ও মগ জাতিদের আত্মীয়তা সম্বন্ধনের তালিকা দেয়া হল—

বাংলা	মগ	ককবরক
প্রপিতামহ	আফী (বাগ্ৰী)	বাকতর
প্রপিতামহী	আফীমা (দগ্ৰী)	মাকতর
পিতামহ	আফোঃ	চুচু বা দাবুড়া বা দাদু
পিতামহী	আবং	নানা বা আচুই
পিতা	আফা, বাবা	ফা বা বা
মাতা	আমিং বা আদঃ	আমা বা মা
জ্যেষ্ঠা	আবাগ্ৰী	আয়ং
জ্যেষ্ঠিমা	আদগ্ৰী বা আমিংগ্ৰী	আয়ংবারই বায়ংবীরই
মামা (মার বড়)	মামোংগ্ৰী	য়ংচীলা বা মামা
মামা(মায়ের ছোট)	মামোংসে	মামা
মামী (মার ছোট)	আরীসে	মামী
মেসো (মার ছোট)	আব্যে	মুউ বা যং
মাসী (মার বড়)	আদগ্ৰী	য়ং বীরয় বা মই
মাসী (মার ছোট)	আয়োওয়ী	মই
কাকা	আব্যে	কাকা
কাকী	আয়ুয়ী	কাকী
পিসা (বাবার বড়)	মামোংগ্ৰী	পিয়া বায়ংচীলা
পিসা (বাবার ছোট)	মামো	পিয়া
পিসী (বাবার বড়)	অরিগ্ৰী	পি বায়ংবীরয়
পিসী (বাবার ছোট)	অরিসে	পি
শশুর	স্বগং/য়থবো	কীরা
শাশুড়ি	স্বগংমা/য়থমা	কীরাডুক
সৎবাবা	ফা আকাং	ফাতয়কাকতর
সৎমা	আমিং আকাং	মাকতর
বড় ভাই	আকোংগ্ৰী	দাদা
ছোট ভাই	ডিসে	কুকুই বা ফায়ুং
বড় বোন	আমেংগ্ৰী	বায়
ছোট বোন	আয়েংগ্ৰমা	হানক
বৌদি (মেয়ের বৌদি)	রউমা	বাচুই
ছেলের বৌদি	মেরীঃ	বাচুই
ছোট ভায়ের স্ত্রী	থ্রেমাসে	উইডুক

জামাইবাবু	খোসেং	কুমুই
দিদির ছোট বোনের জামাই	মেং	ডাই
দাদার ছোট বোনের জামাই	য়উফাসে	ডাই
স্বামী	স্বামীংগং লাং	সাই
স্ত্রী	মিয়া	হিক
গৃহকর্তা	ইংসা	সাই
গৃহকর্তৃ	ইংসমা	হিক
সম্বন্ধী	য়উফাগ্রী	সাই
সম্বন্ধীর স্ত্রী	আমে	বাচুই
শ্যালক	য়উফাসে	পীরাঙ
শ্যালিকা	খ্রেমাসে	পীরাঙজুক
বড় ভায়রা	আকো	কুমুই
ভাসুর	খোউং	ডাই
বড় জা	আমে	বাচুই
ছোট জা	ঙিংমা	বাচুই
দেবর	মে	পীরাঙ
ননদ	রউমাসে	উইজুক
ভ্রাতৃপুত্র	তুউ	বাতিজা
ভাগিনে	বাগিনা	বাগিনা
কন্যা	সমিং	সাজুক
বেহাই	খমাউ	চামাই
বেহাইন	খমাউমা	চামাইজুক
নাতি	স্রীং	সুক
নাতিন	স্রীংমা	সুক
পুতিন	স্রই	পুতিন বা বরা

মগ আদিবাসীদের স্বামী-স্ত্রীরা কখনও কারো নাম উচ্চারণ করেন না। ছেলে বা মেয়ের বাবা বা মা হলে অমুকের বাপ (মিসুংফা) বা অমুকের মা (মিসু অমিং) সম্বোধনে পরস্পর ডাকেন।

বাংলা শব্দের সঙ্গে মগ ভাষা শব্দের কিছু কিছু মিল দেখা যায়। এইরূপ একই রকম নীচে দেওয়া হল।

বাংলা ভাষা

মগ ভাষা

আকাশ

আকাশাচু

ভূমি

ভূমাচি

বেদনা	উয়েদনা
দুঃখ	দুখোওয়া/দুখ্খা
সুখ	সুখোওয়া/সুখ্খা
রূপ	রূপা
দেহ বা কায়া	কায়া/খেংথা
স্বামী	স্বামীগং/লাং
দা	দাঃ
লুঙ্গি	লুঙ্গি
জ্ঞান	জ্ঞানা / জ্ঞেয়েং
বিজ্ঞান	উয়ীজ্ঞানা
তৃষণ	তছা
মিত্র	মিত্তা/মিছেয়ী
জাতি	জাদি
মরণ	মরনা
ব্যাদি	ব্যাদি
রোগ	রোগা
আহার	আহারা
দূত	দূবাস্যেং
শৈশব	আশ্চ্যীংথা
নাক	নবক্ষং/নাক্খ
বাবা	বাবা
মাতা পিতা	মাতা পিতু
মামা	মামা
আবু/শিশু	আবুসে
চেতনা	চেদনা
চাঁদ	চাইন্দা
সূর্য্য	সূরিয়া
গ্রহ	গ্রোহ্

মগভাষায় 'ন' বাচক পদের অগ্রে 'মা' বা 'ম' প্রত্যয় সংযুক্ত শব্দ লক্ষ্য করা যায় যা বরক ভাষায় কেবল পদের অন্তে 'য়া' প্রত্যয় সংযুক্ত হয়ে থাকে।

নীচে কয়েকটি এই প্রকারের অবিভক্তি শব্দ দেওয়া হল। যেমন—

বাংলা ভাষা	বরক ভাষা	মগ ভাষা
যেতে পারব না	থাঙমায়া	মলাহুইং
হাঁটতে পারব না	হিমমায়া	মলাহুইং
উঠতে পারব না	কায়মায়া	মঠাহুইং
খাব না	চাইমায়া	মংচাঃহুইং
ঘুমাব না	থুয়া	মওই
চিনি না	সিনিয়া	মসীঃ
চিনিতে পারি না	সিনি মায়া	মসীঃহুই

মগ ভাষা শিক্ষা

Part - 1

Lesson - 1

পারিবারিক সম্বন্ধ

পিতা -	আফা, ফাখাং, বাবা।
মাতা -	আমিং, মিখাং, আদং।
ভ্রাতা -	মং।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা -	আকোগ্রী, আমংগ্রী।
কনিষ্ঠ ভ্রাতা -	মংস্যে।
জ্যেষ্ঠ ভগ্নী -	অইমাগ্রী, আমিগ্রী।
কনিষ্ঠা ভগিনী -	প্রিগ্যমাস্যে।
জেঠা -	আফাগ্রী, আবাগ্রী।
মেসো -	আব্যে।
কাকা -	আফাস্যে, আব্যে।
মামা -	আখাং, মামোং।
পিসে/মামা -	মামোং।
জ্যেষ্ঠী -	আদংগ্রী, আমিংগ্রী।
মাসী -	আয়োয়ী বা আইওয়ে।
খুড়ী, কাকিমা -	আয়োয়ী, আমিংস্যে।
বড় মাসী -	আমিংগ্রী, আদংগ্রী।
মাসী/পিসি -	আরীঃ।

পুত্র -	সাং, সাংয়ক্যা।
কন্যা -	সামিং।
পৌত্র -	প্রিং, প্রিংয়ক্যা।
প্রৌত্রী -	প্রিংমা।
বংশধর -	অচইং।
স্বামী -	লাং।
ভাসুর -	খোৎসে।
দেবর -	মোয়েং।
ঠাকুরদাদা/পিতামহ/মাতামহ	আফোং।
ঠাকুরমা/পিতামহী/মাতামহী-	আবং, আবংমা।
প্রপিতামহ -	আফীং।
প্রমাতামহী -	আফীংমা।
পূর্বপুরুষগণ -	খোৎচইং।
বন্ধু -	আফাউসাং, খাহংমই।
সখী -	আফাউসাং মিমা।
বিমাতা -	আমিং আকাউ।
শশুর -	য়উখমা আবু।
শাশুড়ি -	য়উখমা আমা।
দ্বীর বড়ভাই -	য়উফাসে।
শালা -	য়উফাসে আগ্রি।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী -	মেরীসে।
দ্বীর জ্যেষ্ঠ ভগ্নী -	মেরীসে।
শালী -	প্রেমাসে।
পুত্রবধূ -	খোন্সা
বৌদি -	রমাসে।
জামাতা -	সমাউসে।
কুটুম্ব -	ম্যো-আচ্ছী।
জাতি -	আম্যো।
শত্রু -	রাইংসু।
চাকর -	আহঙা।
মনিষ -	ইংস্যং।
গুরু -	ছাডাসে।
শিষ্য -	তাবে।

Lesson - 2

শরীরের নানা অংশ

শরীর	কইন্থাং, কায়া।	বাহু	লাউমং।
		হাতের আঙুল	লাউএগ্যং।
মস্তক	আগং।	আঙ্গুলি (পরিমাপে)	লাউচ্ছং।
		পা - আগ্রী, গ্রীফোওয়া	
কপাল	নাফোজা।	পায়ের আঙুল	গ্রীখ্যাং।
		নখ (হাতের)	লাউসে।
চোখ	ম্যাচী, চাঙ্কু।		
নাক	নখং	পিঠ	নউকোং।
		মুষ্টি	লাউছো।
কর্ণ	নাং, নাহ্রোউ।	স্তন	নোংসী
চুল	ছাইংবাং।	কোমর	খাং।
মুখ	খোনাং।	হাঁটু	পছইটু।
মুখমণ্ডল	ম্যান্হা।	চামড়া	আড়ী।
চিবুক	পচং।	অস্থি	আড়ো।
দাঁত	দন্তা, সোয়া।	নাভি	খ্যাউ।
গলা	অলইং।	শিরা	আক্রং।
গাল	পা।	চোখের তারা	ম্যাক্লোং।
ঠোঁট	প্জা।	ভ্রু	ম্যাউরং।
কাঁধ	পাবেখাং।	কনুই	লাক্ছং।
পেট	আওয়াইন্।	বুড়া আঙুল	লাউমা।
বুক	রাউং, রাংফেং।	তজনী	লাউএগ্যং।
		মধ্যমা	লাউলে।
হাত	আলাক্।	অনামিকা	লাউলেং।
কনিষ্ঠা	লাউএগ্যস্যে।		
লোম	আমোয়ীন্।	তল পেট	খ্যজচা।
জিহ্বা	স্যাং।	কোমরের পিছনের অংশ	ক্যছং।
যোনিস্থান -	তাইংছা।	দাঁতের মাড়ি	সোয়াফোং।

মাংস	আসাঃ।	আঁতুড়ী	ওউ।
নক্ত	সোয়ী।	পাকস্থলী	খিউংদং।
উরু	পংরাং।	মেরুদণ্ড	কোংরু।
ত্রোণ্ড	রইন্থোওয়াং।	ঘাড়	লইংছ।
মলদ্বার	খিগ্রং।	কজা	লাকেথাং
হৃদয়	নাইলোং	পায়ের পাতা	ফোওয়া।
যকৃত	আসী।	ফুসফুস	আছেঃ।
চোখের কোণ		ম্যাউখোওয়া।	

Lesson - 3

গৃহের দ্রব্য সামগ্রী

বাড়িঘর	ঈং/ইম্।	উঠান	তলাং।
গোশালা	নোওয়া গড়া	বাগান	ওয়ইং।
পায়খানাঘর	খিচইচাং	দরজা	তোওয়াইখাং।
পুকুর	কাইং।	জানালা	পদাংবউ।
বারান্দা	ব্রানদা, ছোয়ীলাং।	দেওয়াল	থারাইং।
ছাদ	ইংখং।	প্রদীপ	ছিমিং।
তলা	সোয়া লোং।	মোমবাতি	ফয়ংডাইন্ ছিমিং।
চাবি	সোয়াখ্যাং।	অগ্নি	মিং।
বিছানা	ওয়িরা	মাচা	কদাং।
বালিশ	গংউং।	চৌকি	খেং।
চাদর	পোছু।	কেদারা	থইংখেং।
বিছানার চাদর	আখাংস্যা	বাক্স	বাইসোওয়া।
লেপ	রংজা	সিন্দুক	তরা।
মশারি	ত্রাংথং	মাদুর	পাইসো।
শীতলপাটি	সাংফোং	ঝুড়ি	খরাং।
পাখা	য়েং	মাথায় দড়ি	ঝুলিয়ে নেওয়ার ঝুড়ি - পরইং।
তোষক	আখাং	ডোলা (মাছ বা ধানের বীজ রাখার জায়গা)	পোউ কউখ্যাং।

বালিশের ওয়ার	গংউখ্যোউ		
চুপি	কাইংদউ	সাবান	সবোং।
ছন	সেস	ইট	উল্লেখ্য।
আয়না	মত্ৰাং	চুন	থোং
চিরনি	ওয়ফ্রীঃ	পাকশালা	থমাংখ্যারোং।
সলিতা	ছিমীংজা	কুড়াল	পক্ছিং।
জাল	কোওয়েং	কোদাল	পক্‌তোউ।
কেরোসিন তেল	গ্রাছীঃ	লাঙল	লইডাং।
দেশলাই	মত্ৰঃ	বড়শি	ম্যাঃহ্
ছক্কা	ছিপদং	কাঁচি	চাক্রী।
তামাক	চাচ্ছীঃ	ক্ষুর	সাংথোং।
খুঁটি (পালা)	তইং	করাত	হ্রোয়াং।
তক্তা	চেঃপইং	সাবল	তোরাং।
ঝাড়ু	ইংলেহ্	ভোঁতা দা	দোগোওয়ং।
গোলা বা ধানের ঘর	চরডোংইং	সরটা	কোয়াইংসীখোয়ী।
ঘরের সামনে মাচা	তম্যাং	ধানেরলাই (টুকরি)	চবা ডউং।
ধান রাখার ডোল	ওয়াইংপোউ	খড়	কউরোঃ
কোলা	চাইংগো	বর্শা	হ্লাইং।
চালনি	ফোয়ীখাঃ		
১আড়ী ধান মাপার সামগ্রী		আত্ৰীদং।	
১কিলো চাল মাপার টুকরি		সইখ্রাং।	
বাঁশের মাছ ধরার সামগ্রী		য়াউস্সী।	

Lesson - 4

রন্ধন গৃহের দ্রব্য সামগ্রী

রান্না ঘর	থমাং খ্যারোং	পাতিলের ঢাকনা	ফোংফোঅউ।
আগুন	মিং	দুধ	নো।
ধোঁয়া	মুখো	দধি	নোখাইং।
ছাই	প্রা	সর	নোআস্য।
আগুনে ফুঁদেওয়ার চুঙ	প্রইদোং	চিড়া	মোংসাইং।
কড়াই	কড়েঃ	মধু	প্যারে।

জল	রীঃ	ঘটি	বো।
খাদ্যদ্রব্য	চাফোয়ে	জগ	রী ক্রা।
চাউল	ছাইং	মাংস	আসা।
ভাত	থমাং	ডিম	অউঃ।
আতা	গংমুং	ধনিয়া	নাইংনাইংসে, ধংঞা।
মাছ	ঙাঃ	তরকারি	হাঁউ।
মিঠাই	আখো	তেল	ছি।
খালা	লংবাইং	চিনি	সগ্রাহো।
বাটি	খোওয়উ	গুড়	সগা।
গামলা	দাংগাইন্	ডাল	দাই।
পাতিল	উঃ	সরিষা	হড়ই।
তিল	ছাইং	মাটির কলসী	শ্রে ওখা।
পাথর	ক্যউ	পিতলের কলসী	ক্রীওখা।
শিল নুড়া	ক্যউপ্যাইং	হাত ধোয়ার পাত্র	লাকছি তোং।
কলসী	ওখা	গ্লাস	গলউ।
মুটকী	গংজী	লাকড়ি	থাং।
হাতা	য়উমা	বাঁশের লাকড়ি	থাংসা।
চামচ	হাঁউগোং	চুলা	খোলং।
লাচক	থমাং খ্যাসা	নিমন্ত্রণ	পাংরে।

Lesson - 5

পোষাক পরিচ্ছদ

পোশাক	ওয়েছাপোয়ে, ছাংয়াংসে।		
কাপড়	আওয়াই।	গামছা	রোংমাস্যে।
কোট	কোউ।	পকেট	ওয়ী।
মুতি	খয়উ।	পাগড়ী	গংবউং।
কাপড় চোপড়	আওয়ে-আচা।	সার্ট	কামেজ,রাংজি।
চুলা	গোয়াইং।	জুতা	ফানাই।
শিমুল	লাউপাইং।	গহনা	আছাং।
মুতা	থ্রী।	হার	পদ্দী।
আংটি	লাউচোয়ে।	পেন্ট	পংফ্রি।

মালা	আসিং।	বালা	লাউকঃ
ফুল	পাইংবোওয়ং।	কানের দুল	নাসাইং
ছুঁচ	এ।	কানের ফুল	নাবোওয়ং
ছাতা	থীং।	খোঁপার কাঁটা ও ফুল	ছাইবোওয়ং
লুঙ্গি	লুঙ্গিঃ।	খোঁপার কাঁটা	পাইংব্রীং ছাইংগ্যাং
অনন্ত (বাছতে পরে)	দাইং।	খাড়ু	ক খ্যাং।
কোমরের হাড়	খোগ্রো।	নূপুর	ছুলে।
চিরুনি	ওয়ফী।	পাছড়া	থাবিং।
আঁচল	রুংমা।	ব্লাউজ	আঙ্গি।
বুক বন্ধনী	রাংগাইন।	রুমাল	পোহা লাকছু।
রেশমি বুকবন্ধনী	পো-রাগাইং।	রেশমি পাছড়া	পো থাবিং।

Lesson - 6

সাধারণ দ্রব্য সামগ্রী

আকাশ	গউখাং। আগা	নদী	খ্যাং।
সূর্য	নিং/নিরংথ্রী	নদীর তীর	সইনাং।
চন্দ্র	লা/লাবা	নৌকা	হ্লিই।
তারা	ক্রী।	বায়ু	লীই।
নক্ষত্র	নাখাই	শিশির	হ্নাং বউ।
মাঠ	প্রাইং, লেপ্রাং	কুয়াশা	হ্নাং।
বৃষ্টি	মো, মোঃ রোওয়ারে	তামা	ত্মা।
শিল	ক্যউ।	পিতল	ক্রী।
বিদ্যুৎ	স্যে, স্যেঃ প্রাখাং।	টিন	তোয়াইন।
লোহা	সাইং।	বজ্রপাত	মোগ্রো বচা।
রামধনু	সদাংরী।	মুদ্রা	টেংগা আখো।
পাহাড়, পর্বত	তং।	টাকা-পয়সা	মোয়ে-পসা।
আলো	আরং।	ছবি	আরুউ।
অন্ধকার	আমহ্।	পাথরের মূর্তি	ক্যউসরুউ।
শ্রোত	রগ্যউ।	লাঠি	ছক্‌পো, তইংমোয়িং।
বন্যা	চঃ ফ্রাখাং।	বড়শি	হ্ম্যা।
ভূমিকম্প	ঙেয়াং লুখাং।	বেত	নোয়িংফ্রাংচা।

মণি	আম্যাক্।	ফাঁদ	খোউ, খোউথংচা।
মুক্তা	পোলে।	ধ্বজ, নিশান	তাংখোয়েং।
পায়া	পাদম্বা।	মৃদুবায়ু	লি সইকা।
হীরা	চিং।	বাড়বৃষ্টি	মো-লি।
সোনা	হ্রোভয়ি।	ঘূর্ণিবায়ু	লিবোয়ী থারে।
কাপা	মোয়ীং।	গ্রহণ	ক্রেতী।
সীসা	সোয়ে।		
সূর্যগ্রহণ	নিংক্রেতী।	বন্দুক	নাবউ।
চন্দ্রগ্রহণ	লাক্রেতী।	বারুদ	নাবউছী।
জোয়ার	ফ্রাতাক্তে।	তুষ	ফেয়ী।
ভাটা	ফ্রাছোউতে।	ভস্ম	প্রা।
হাতুড়ি	আতুরা।	চরকা	বৈইংগাংচা।
করাত	হ্রোয়া।	অংশ	অফোউ।
দা	দা।	অখাদ্য	মচাফোয়ে।
জাতা	ক্রেয়ীচা।	খাল	আংব্রাং।
জাত	রাঙ্কেইং।	বিল	বোয়ীতো।
যে কাঠ দিয়ে			
বোনা হয়	রাউমা।	বেড়া	হুইন্দা।
যে নাল দিয়ে সুতা			
হোলা হয়	হেং	বন-জঙ্গল	তং।
যে স্বস্ত্র দিয়ে			
সুতাকে গোল			
পাকানো হয়	খিয়্যা।	ধন	ওয়েং।
অনুয়াল	চইদা।	পদচিহ্ন	প্রিরা।
মণুক	হ্রিঃ।	রৌদ্র	নবো।
তীর	হ্রিজো।	জ্যোৎস্না	লাবা পারে।
মনুর্জন	হ্রিগো।	গরুরগাড়ি	নোওয়া রথা।
গাড়ি	রথাং।	পূর্ণিমা	লাব্রে।
রেলগাড়ি	মিং রথা।	অমাবস্যা	লাগোয়ী।
উড়োজাহাজ	ঙাছাংলিয়েং।	শুক্লপক্ষ	লাছাইং।
জাহাজ	সাংফং।	কৃষ্ণপক্ষ	লাছো।

Note : অনেক সাধারণ দ্রব্য সামগ্রীর নাম বাংলা ভাষা ও মগ ভাষা একরূপ। সেই সকল দ্রব্যের নাম অনাবশ্যক বোধে লেখা হয়নি। যেমন - মুলা, টিকেট পোস্ট কার্ড, কমলা ইত্যাদি।

Lesson - 7

জীব-জন্তু

পশু	সুদোওয়া।	ভেড়া	সাংফংছোয়ী।
প্রাণী	আসাউহীচা।	মহিষ	ক্যোয়ী।
মনুষ্য	লু।	হরিণ	খ্যি।
বিড়াল	ত্রং।	সিংহ	ত্রাংসোয়ী।
গাভী	নোমা।	বাঘ	ক্যাং।
যাঁড়	নোথুই।	চিতাবাঘ	ক্যাগ্রো।
গরু	নোওয়াং।	ভালুক	ওয়েং।
কুকুর	খোয়ী	কাঠবিড়াল	সোয়েং।
ঘোড়া	স্রাং।	বেজি বা নেউল	বেজি।
ছাগল	ছোয়ীই।	বাছুর	নোওয়াসো।
ইন্দুর	ক্রোওয়উ।	শিয়াল	মুখোয়ী।
কচ্ছপ	লুই।	ভাদুর	ফাইং।
বানর	ম্যউ।	কুকুরের ছানা	খোয়ীসো।
লজ্জাবতী বানর	ম্যউহুং।	বন্যকুকুর	তং খোয়ী।
শূকর	ওয়ক্।	বন্যজন্তু	তং সুদোওয়া।
গাধা	স্রাংগাদা।	উট	লুউং।
খরগোস	য়োং।	গোসাপ	ফোয়ে
কালেশ্বর	সমাংছেং।	উল্লুক	খিদু খেদা।
সাপ	স্রিং	কুমীর	ময়ং।
শিম্পাঞ্জি	তংলু।	ড্রাগন	নাগা।
হাতি	ছাং	গভর	গ্রাইংছাং।
কস্তুরী	কদু।	বন্যমহিষ	তংক্যোয়ী।
সজারু	ফ্রেং।	জলহস্তী	রিছাং।
বনরুই	জাংখোয়ে।	গিরগিটি	জাংলুই।
জেব্রা	স্রাংক্যাং।	মিথুন	তংনোওয়া।
লেজ	আমুদুং।	শুঁড়	আনন্মাং।
শিং	আগ্রাং।	লোম	আমোয়ীন্।

নোট :- কোন জন্তুর বাচ্চা বোঝাতে পৃথক শব্দ ব্যবহার না করে জন্তুটির নামের পর “সো” (অর্থ বাচ্চা) এই শব্দটি যোগ করলেই হবে।

যেমন - ঘোড়ার — বাচ্চা — শ্রাংসে,
 বিড়ালের বাচ্চা ক্রংসে।
 স্ত্রী — বাঘ — ক্যামা ইত্যাদি।

Lesson - 8

পক্ষী জাতি

পাখি	হঙাউ।	পেঁচা	খংবো।
কাক	কেগাইং।	হুতুম পেঁচা	খংবোগ্রী, তিদুউ।
কবুতর	খং।	শালিক	জিরানীং।
চাতক	চইংরোয়ে।	বুলবুলি	দউচর।
চিল	চোয়াইন, সিং।	হলুদ পাখি	গুহুওয়া।
কোকিল	কংরং।	চডুই	ইংবইচা।
দোয়েল	চিচংপচং।	জলচর পাখি	রিক্রাক্।
ময়ূর	ওদং।	কাঠঠোকরা	খউয়া।
তোতা	ক্যা।	মাছরাঙা	পাইংজান্।
হাঁস	বীং।	ঈগল	চোয়াইংবোগ্রী।
রাজহাঁস	বিঙাইং।	মোটুসী	পাইংচোসে।
পাতিহাঁস	বীসেং।	ধনেশ	অউখ্যাং।
মোরগ	ক্রাক্।	ময়না	মনা, গুহুক্যো।
বাবুই	চাবদং।	সারস	গুহুক্রী।
শকুন	লাংদা।	বনমোরগ	তংক্রাক্।
বাদুড়	লাংলো।	বনমোরগ	তংক্রাক্।
বক	বেয়ইং।	বালিহাঁস	রী বে।
ডাঙ্ক	কুলোগোওয়ক্।	বটকল	উ।
পাখির ঠোট	গুহনোসুই।	পালক	আতং।
পাখির ডিম	গুহুও।	পাখির ছানা	গুহুউসে।
পাখির বাসা	গুহুউসং।	কালো শালিক	ক্যোয়ীজিরাক্।
হিজল (বউ কথা কও)	ওয়ংক্রাক্।	টুনটুনী	হুইংছোয়েসে।
গরুড় পক্ষী	কুলো গুহুং।	চামচিকে	লাংলুক্‌সে।
সাদা টিয়া	ক্যা ফ্রেং।	সবুজ টিয়া	ক্যিঙো।

লোক - সংস্কৃতি

মানব সমাজের জীবন যাত্রার প্রণালী হচ্ছে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে সাধারণত একটি জাতির ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, জীবনবোধ, শিল্পকলা প্রভৃতির সম্মিলিত প্রয়াসকেই বোঝায়। সেই সংস্কৃতি তাদের নিজস্ব ভাবনা, সুদীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফসল। বিজ্ঞজনেরা এই সংস্কৃতির ধারাকে বলেছেন লোক-সংস্কৃতি।

১৮৪৬ খ্রিঃ উইলিয়াম জন থমস এই সংস্কৃতির ধারাকে অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। বাংলায় এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে “লোক-সংস্কৃতি”। তবে এক সময় একে বা জনপ্রিয় পুরাতত্ত্বও বলা হত। পুরাতত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে একটি শিক্ষাগত শৃংখলায় রূপদানের জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াসী রয়েছেন। তাঁদের সে- প্রচেষ্টা সাফল্যও অর্জন করেছে। লোক-সংস্কৃতির প্রকৃতি প্রসঙ্গে লোক-সংস্কৃতিবিদেরা ছয়টি প্রকৃতির কথা বলেছেন। যথা :-

- (১) ঐতিহ্যশ্রয়ী;
- (২) মৌখিক;
- (৩) পাঠভেদ;
- (৪) চক্রম্ননশীলতা বা পর্যটন বৃত্তি;
- (৫) নৈর্ব্যক্তিকতা বা সমষ্টিমনন;
- (৬) সূত্রকৃত।

লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। লোক-সংস্কৃতি ঐতিহ্যগত সৃষ্টির ফসল। লোক সমাজে একে নির্দিষ্ট প্রহণ করে ও পালন করে। লোক-সংস্কৃতি মৌখিক। মুখে মুখে এই সংস্কৃতির পাঠান্তর ঘটে। পাঠান্তরের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে মোটিফগুলির তথ্য মূল পাঠের সন্ধান মেলে। লোক-সংস্কৃতির উপাদানের চক্রম্ননশীলতা বা পর্যটন বৃত্তি এর সজীবতা বৃদ্ধি করে। এই পর্যটন বৃত্তির মাধ্যম হল ব্যবসায়ী বা বণিক, পর্যটন, সৈন্য, গবেষক প্রমুখ। লোক-সংস্কৃতির উপাদান ব্যক্তির সৃজন হলেও সমগ্র সমাজের অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল। তাছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব এখানে আবিস্কার করা কঠিন। লোক-সংস্কৃতি সূত্রকৃত, কেননা এখানে নির্দিষ্ট ছক বা সূত্র অনুসরণ করা হয়।

লোক- সংস্কৃতি গবেষক পণ্ডিতেরা সুদীর্ঘ গবেষণার ফসল হিসেবে লোক উপাদান বিশ্লেষণের কয়েকটি পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছেন। সেগুলো জানবার আবশ্যকতা রয়েছে। সেগুলি হল :-

(ক) ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতি (Historical Geographical Process);

- (খ) টাইপ ও মোটিফ পদ্ধতি (Type & Motif Indenprocess);
- (গ) মনঃসমীক্ষণনির্ভর পদ্ধতি (Psychoanalytical Process);
- (ঘ) রূপতাত্ত্বিক পদ্ধতি (Morphological Process);
- (ঙ) ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি (Dialectical Materialism Analysis);

অধুনা, এইসব উপাদান বিশ্লেষণগত পদ্ধতির সঙ্গে গুরুত্বসহ যুক্ত হয়েছে সমাজ-ভাষা-বিজ্ঞান-পদ্ধতি (Socio-Linguistics)।

এই প্রসঙ্গে ‘Anthropology Today’ সংকলিত গ্রন্থে (সম্পাদনা :- A. L. Kroeber) আমেরিকান লোক-সংস্কৃতিবিদ স্টিথ থমসন (Stith Thomson) তাঁর ‘Advances in American Folklore’ নামক প্রবন্ধে বলেন, “Folklore and Anthropology have always had so intimate and well recognized relationship that it is not possible to draw exact boundaries between them.”

আবার সমাজ ও মানুষ নিয়েই সমাজবিদ্যা ও লোক-সংস্কৃতির মৌলিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তথ্য বিশ্লেষিত হয় এবং গবেষণায় সবচেয়ে বেশি তথ্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজে লাগায়।

প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা সাধারণ মানুষের সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনের ধারাই বয়ে চলেছে লোক-সংস্কৃতি ও লোকশিল্পের মাধ্যমে। প্রকৃতিকে ঘিরেই এদের জীবন আবর্তিত হচ্ছে। তাই লোক-সংস্কৃতি ও লোকশিল্পে ধরা পড়ে প্রকৃতির সুর। লোক-সংস্কৃতির জন্ম আদিবাসীদের শিকারী জীবন ও জুম চাষকে কেন্দ্র করে যখন সভ্যতার আলো এসে পৌঁছায়নি তখন আদিবাসীদের জীবন যাপন ছিল বন্য প্রকৃতির। তারপর এলো কৃষিকেন্দ্রিক জীবন। সৃষ্টি হলো জুম চাষাবাদ। স্থান থেকে স্থানান্তরে, তারা যাতায়াত শুরু করলো, বন কেটে বসত গড়ে তুলতে লাগলো। সভ্যতার ছোঁয়া লাগলো তাদের জীবনে।

মগ জনজাতি লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে জুম চাষের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। দিনের আলোকাশ সময় জুম ক্ষেতেই কাটতো তাদের জীবন। তাই তাদের হৃদয়ের আবেগ, প্রেম-ভালবাসা, দুঃখ-বেদনা, হাসি-আমোদের বহিঃপ্রকাশ ঘটতো এই জুম ক্ষেতেই। জুম ক্ষেতকে কেন্দ্র করেই তখন রচিত হতো লোকগাথা, লোকগীতি, লোকনৃত্য বিভিন্ন ধরনের গল্প, কাপ্যা, ব্যাসা, কৌতুক গান ইত্যাদি আজও মুখে মুখে কিছু কিছু পুঁথিতে প্রচলন আছে। মগ জনগোষ্ঠীদের প্রতিটি গীতি-নৃত্য-নাট্য (জাইত-পাংখুং) ও পূজা-পার্বণ বন্দনা দিয়ে শুরু হয়। কাহিনির বিষয়বস্তু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় দর্শন ও সর্ব প্রাণবাদের সংমিশ্রিত এক অপরূপ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিন্তা চেতনা দ্বারা পরিবেশিত হয়। প্রাচীন কাল থেকেই মগ তথা আইমা সমাজের জ্ঞানীগুণী ও লেখকগণ বিদগাহিট্ (ধর্মীয় শাস্ত্র), বিদাং (জ্যোতিষ শাস্ত্র) প্রভৃতি থেকে মগ জনগোষ্ঠীদের কাহিনি সংগ্রহ এবং তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে সমাজের বাস্তব রূপ ও কাহিনি তুলে ধরে সংগীত ও গীতিনাট্য তৈরী করেন। জ্ঞানীগুণী ও লেখকেরা তাঁদের স্থায়ী চেতনায় সমাজের বাস্তব রূপ ও

জীবনধারাকে সুরে ছন্দে সংগীতের রূপ দেন। এইভাবে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধারায় মগ সমাজে সংগীত ও গীতিনাট্যের উদ্ভব হয় এবং সেসব বংশ পরম্পরায় মগদের সাংস্কৃতিক গতিধারায় প্রবাহিত হয়ে আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। মগ জনগোষ্ঠীদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নৃত্য, সংগীত ও গীতিনাট্যের ঐতিহ্য বিষয়ে নিম্নে ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

কাপ্যা :

কাপ্যা হলো এক ধরনের কাব্য যার মাধ্যমে বিধৃত হয় কোন লোক-কাহিনি। কাপ্যায় জনজীবনের অতীত বা বর্তমান জীবনধারা নিখুঁতভাবে ফুটে ওঠে। সাধারণত মহাপুরুষ বা রাজাদের জীবন কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কাপ্যা। যেমন -পাইদাইমং সাইংদোয়ে সু কাপ্যা।

নীচে বর্ণিত কাপ্যাটিতে রয়েছে পাইদাইমং রাজপুত্র এবং সাইনদুয়ে সু রাজকন্যার কাহিনি। সঙ্গে রয়েছে ত্রিপুরা রাজার মেয়ে পাইনিলা।

আরাকান থেকে সে-সময়ে ত্রিপুরায় যাতায়াত ছিলো মগ সম্প্রদায়র মানুষের। তারা বারে বারে আসতেন আবার ফিরেও যেতেন। সেই সব দিনের কাহিনি রয়েছে এই কাপ্যায়।

পাইদাইমং হলো আরাকানে দাঙ্যাওয়দী (ধান্যবতী) রাজ্যের রাজা চাইন্দা সুরিয়া (চন্দ্র সূর্য) বা মাংবাগ্রীর ছেলে। এই রাজার তিন ছেলে ছিলো। তাদের নাম যথাক্রমে পাইদাইমং, পাইরীমং ও চিংপ্রো। এদের মধ্যে রূপে গুণে সেরা সর্বগুণাশ্রিত ছিলো পাইদাইমং। কাপ্যায় বলছে —

খোয়ী পাইং ঙাং অরং ক্রিগে

রাখাইং প্রেংমা পাইদাইমং।

মর্মার্থঃ রাখাইং দেশে (আরাকানে)

পাইং দাইং মং নামক রাজপুত্র

ঝিঙা ফুলের মত তার গায়ের রঙ। সে অতি সুন্দর।

এই পাইদাইমং মং একবার তার শিক্ষাগুরুদেবের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিলো। সেখানে তার পরিচয় হয় ত্রিপুরা রাজার কন্যা পাইনিলার সাথে। পাইনিলা রাজপুত্রকে দেখা মাত্র তার প্রেমে পড়ে যায় এবং তাকে বিবাহ করতে চায়। পাইদাইমং মং বলে, দেশে ফিরে যাবার আগে এ বিষয়ে সে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। তখন পাইনিলা চং নাম বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে সুরে সুর তুলে বললো, তাহলে প্রতিজ্ঞা করে যাও ফিরে এসে আমাকে বিয়ে করবে।

রাজপুত্র বললেন —সাগীওয়ংজে ঙুরো মাংজইং সাইচা তইং ঙং মকই হইং।

আমরা সাগীওয়ং (শাক্য) রাজবংশ। আমরা এই ধরনের কোন প্রতিজ্ঞা করতে পারবো না। পাইনিলা তখন বললো, তাহলে তুমি প্রতিজ্ঞা কর আবার ফিরে আসবে। রাজপুত্র তখন রাজি হলো। রাজপুত্র তখন রাজি হলো আর একবার ত্রিপুরায় ফিরে আসতে। রাজকন্যা পাইনিলা বললো, কিন্তু আমি কী করে বুঝবো তুমি ফিরে এসেছো?

রাজপুত্র বললো, আমি ফিরে এলে রাজপ্রাসাদের হাতির শালে হাতি, ঘোড়ার শালে ঘোড়া, বনে বাঘ হরিণ এক সাথে ডেকে উঠবে। তখন বুঝে নিও আমি এসেছি। এই কথা বলে

পাইংদাইং মং তার গুরুদেবের সঙ্গে আরাকানে ফিরে গেল।

আসলে পাইংদাইং মং প্রেমে পড়েছিলো রাজকুমারী সাইন্দোয়েসুর সাথে। সাইন্দোয়েসু ছিলো আরাকানের ধান্যবতীর দক্ষিণ প্রান্তে শ্রোং রাজ্যের রাজকুমারী। এরা ছিলো মামাতু পিসতুতো ভাইবোন। পাইদাইং মং -এর জন্ম রবিবারে আর সাইন্দোয়েসুর জন্ম শনিবারে। এমন জাতকদের মধ্যে মগ সমাজে বিবাহ- নিষিদ্ধ। বলা হয় —

চিনিং তলাংগুনিং রাউ মসাং সিদুং হ্রাং ফাউ, ইংথং মপ্রংফুইং। অর্থাৎ - শনিবার আর রবিবার দিনের মিল নেই। মৃত্যুযোগ আছে, তাই বিবাহ মিলন নিষিদ্ধ। কারণ মগদের বিশ্বাস — তলাংগুনিং (রবিবার) হলো গরুড় পক্ষীর বার, আর চিনিং (শনিবার) হলো নাগবার। গরুড়ের খাদ্য হলো নাগ বা সাপ। তাই এই জাতকদের বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু রাজপুত্র রাজকন্যা এসব ভুলে প্রেমে পাগল।

এদিকে পাইংদাই মং আর সাইন্দোয়েসু এমন প্রেমে আবদ্ধ হয়েছে যে, তারা পরস্পরের জীবন সঙ্গী হতে বদ্ধপরিবর। কিন্তু উভয় পক্ষের গুরুজন এই বিয়েতে রাজি হলো না। তাই তারা ঠিক করেছে দুজনে পালিয়ে দূর দেশে গিয়ে বিয়ে করবে।

একাকি রাজবাড়ি থেকে বাইরে যাওয়া সাইন্দোয়েসুর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই সাধারণ মেয়ের বেশে পুরানো কাপড় পড়ে মাছ ধরতে যাওয়ার ভান করে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো। কাপ্যায় বলছে —

সমিং তছেউ সাইন্দোয়েসু

য়াউসেং পংগ্যা, পরইংছোং রোয়ে

কিইহ্রে শইতো গাং হ্রাং লারে।।

মর্মার্থ :

একমাত্র কন্যা সাইন্দোয়েসু, ভাঙ্গা, য়াউসেং (মাছ ধরবার যন্ত্র বিশেষ) ও পরইংছোং অর্থাৎ জীর্ণ বুড়ি সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে কিইহ্রে নদীতে রওনা হল।

রাস্তায় কেউ কিছু জিগ্যেস করলে, সাইন্দোয়েসু বলে —

ক্রীই থমাগুজিরা ছাইংনিং ক্রীনিং ফউছে,

ইউ মিহিগ্যে তলুক থমাং মওয়ংদেং।

রাংগু সেকা থমাং বুইমা গাং দং হ্রাং,

আমিংলে সুওয়উ, আফাংলে সুওয়উ

ইউ মিহিগ্যে মচাদেং।।

মর্মার্থ :

লাল রঙের মোটা চালের অর্ধফোটা ভাত,

তরকারী না থাকলে একগ্রাসও ভাত মুখে ঢোকেনা।

ভাতের পাতে মাছের টুকরা খুঁজে না পেয়ে হয়—

হয় বলে বুক চপড় মারে। মাও তাই বাবাও তাই।

বিনা তরকারিতে ভাত খাওয়া দায়।

তারপর সাইন্দোয়েসু জলে নেমেছে মাছ ধরতে। তখন যে অবস্থা, সাইন্দোয়েসু ভয়ে মরে। এদিকে তখনই রাজপুত্র পাইংদাইমং জলের কিনারায় এসে পড়েছে।

গাচরই তউটোউ গাখোউ জাইংসী

তাগং পগ্যে নোওয়ালউ ক্রীরে।

য়ীগোলে শ্রাংলু, মংরাংখোওয়ংদু ব্রীইলু ওয়ং।।

মর্মার্থঃ

টেংড়া, বোয়াল, মাগুর আরও কত কী—

এক একটা ভেসে উঠেছে—

গরুর মত বড় আকার দেখি

এই দৃশ্য দেখে ভয়ে প্রিয়তমকে বুক জড়িয়ে ধরে।

তারপর দু'জনে দু'জনের হাত ধরে পালিয়ে যায়। বহু দূর যাবার পর ক্যিহুং নদীর ধারে গিয়ে তারা বিশ্রাম করার জন্য বসে। একটু পরে রাজকুমার এদিক ওদিক দেখছে।

“নাজে আছই যাক্র তোওয়ং।

খ্রোসা য়াং য়োং সংপাং থাক্কা খ্যাম্মা ক্রোউরে

খ্রোং ক্রুসাইং তরাইং মিনা

ক্যিহুং নামা ততাই ক্রারে।

চচইলেখং রেকু স্থাং মপ্য রোদা

ক্যিহুং নামা ম্যাউরে ক্যারে।।”

মর্মার্থঃ

ক্যিহুং নদীর ধারে বিশ্রাম করার সময় ঐখানে করুণ সুরে ঘুঘু পাখির ডাক শুনতে পেল। পাখির সেই ডাক শুনে সাইন্দোয়েসুর চোখে জল এলো।

“আমিং লিলে আমিং জংখা

মি উয়ীছাগো মশাং হ্লাং,

আফালিলে আফালে জংখাং মি উয়ীছাগু মশাং হ্লাং।

আরং তুসো ক্রিখ্যীই, রেগা, খোরেইংফু মিশ্রো জংখাং-

মি উয়ীছাগু মশাং হ্লাং।

ই স্যংলেছোউ ক্যিহুং নামা থইংলো গোরো।।”

মর্মার্থঃ

এই সময় আমার দুঃখ বেদনা

মাও দেখতে পেল না!

আমি যে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি

বাবাও এই সময় আমাকে দেখতে পেল না

আমার আদরের ছোট বোন

খোরাইং ফুও আমাকে দেখলো না !

এই কথাগুলো বলে সাইন্দোয়েসু রাজকন্যা

ক্যিত্রেঃ নদীর তীরে বসে অঝোরে কাঁদতে লাগলো ।

“পাইংদাইংমংললাং মাউসা

মিং গোরোং ম্যাচি ক্যারে

মংলে চচই মি নাইংবাদু ব্রিলো লইতে ।”

অর্থাৎ :-

রাজপুত্র পাইং দাইং মং

রোদনরত প্রিয়তমাকে দেখতে পেয়ে

সোজা প্রিয়তমার কাছে দৌড়ে গেল ।

“কোমা দাদা কোমা ক্রিলে

গজক্যে হ্রাই ওয়া

মংমা পারে পো খং চাঃ ।

লাকা তোং খ্যোয়ে -

সাইন্দোয়ীসুগো ম্যারে পোওয়েতে ।”

মর্মার্থ :

রাজপুত্র তার হাতে বাঁধা সোনালী রঙের রেশমি কাপড়টি খুলে নিয়ে সাইন্দোয়েসুর চোখের জল মুছে দিলো ।

‘মঙোজিখ্যাং ক্যিত্রেঃ নামা ফ্যলোবাং

মিথুই ক্রংরা মপ্রোক্যে, মিথুই উয়ীছা মপ্রোক্যে,

লইলো মনিং পোখং তংগো তাকাইচিঃ ।

মর্মার্থ :

রাজপুত্র কোন মতেই তার প্রিয়তমাকে কাঁদাতে চায় না,

প্রিয়তমা চিন্তা করো না, মনে কষ্ট নিও না । রাজ্যের শেষ সীমানায় আমরা পোখং পাছাড়ে উঠে চলে যাবো ।

আবার উঠে হাঁটতে হাঁটতে পথে এমন এক জায়গা দেখল যেখানে —

‘খ্যাদো খ্যাদা পাংসুজা সায়া মাউম্যা

তরগোংমা ওং সাইং ক্রাং ।

হ্লাঃ দং হুদিই তঃ রগোংমা

সংনুং চালো আংখারে ।’

মর্মার্থ :

বনে উল্লুকের ডাক শোনা যায় । গাছে নুতন পাতা গজিয়েছে । কী সুন্দর উল্লুক তার স্ত্রীর

সাথে আনন্দে কচি পাতাগুলো খাচ্ছে!

শেষ পর্যন্ত তারা এক সময় পুখং পাহাড়ের উপরে এসে পৌঁছল। উত্তর দক্ষিণ উভয় প্রান্তে বাঁশ বাগানের বাঁশগুলো মাথা নুয়ে তাদেরকে অভর্থনা জানাচ্ছে। তারা ওই পাহাড়ে থাকবে বলে ঠিক করল।

‘আতং সুংছি উরি শ্রা শ্রা

পোখং তংমা চাদী খ্যারে।

তংগা তদং নামে ঙা খোউ

ইং কেইংফামা খওয়া প্রুউরে।

পোখং তং, প্রেংঝাতং, ছাংখংতং, এগ্যাহী তং, পুহীং তং। যোজাং তংলে খংগেতি।’

মর্মার্থ :

পোখং পাহাড়ের উপর ঠান্ডা জায়গায় ত্রিশহাত লম্বা ঘর তৈরি করে তারা থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। পাহাড় তো একটাই কিন্তু সেই পাহাড়ের নাম পাঁচটি। যথা—পোখং তং, প্রেংঝা তং, ছাংখং তং, এগ্যাহী তং, পুহী তং। অনেকে আবার যোজাং তং বলেও ডাকে।

এক সময় সাইন্দোয়েসু যখন ঐ পাহাড়ে বসেছিল হঠাৎ কোথা থেকে ৫ জোড়া অদ্ভুত ধরনের সুন্দর উজ্জ্বল বর্ণের পাখি আকারে পোকাদের, উড়ে যেতে দেখল। সে তার স্বামীকে দেখাল ও জিগ্যেস করল এই জিনিস কী? পাই দইংমং বলল, এটা ‘পুহী’। এই পোকারা সহজে মানুষের নজরে পড়ে না। পুণ্যবানেরা দেখার সুযোগ পায়। সাইন্দোয়েসু ঐ পোকাকে ধরে দেবার জন্য রাজকুমারের কাছে বায়না ধরল। রাজকুমার বলল—

“পুহী তগং ক্যং তছং
পুহী গু মফেই ফুইং।”

অর্থাৎ :

একটি পুহী একটি মন্দিরের সমান। তাই পুহীকে ধরা যায় না। মহাপাপ হবে।

রাজকুমারী কিছুতেই মানতে চায় না। পুহী পোকা তার চায়ই বলে শক্ত করে বায়না ধরল।

নিরুপায় হয়ে রাজপুত্র পুহী পোকা। ধরবার জন্য আয়োজন করতে লাগল। মগ সমজে পুহী পোকা হলো ভগবান বুদ্ধের অংশ, অত্যন্ত পবিত্র পোকা সুযোগ পেলেই তাকে পূজা করা হয়। তাই রাজকুমার গভীর বন থেকে পুহীর পছন্দের ফুল জোগাড় করে খই, কলা, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে পুহীদেরকে পূজা দেওয়া হলো। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের ডাকে একটি পুহীও নীচে নেমে আসল না। তৃতীয়বারের ডাকে মাত্র একটি মাত্র পুহী পূজার আসরে নামল। সাইন্দোয়েসুর হাতে তুলে দিল। সাইন্দোয়েসু অত্যন্ত খুশি হয়ে হাতে নিয়ে ভাল করে সেই পুহীকে দেখল ও আদর করল। জীবনে সে এত সুন্দর পোকা কখনও দেখেনি! কিছুক্ষণ নিজের কাছে রেখে পরে জল ঢেলে পূজা করে আবার ছেড়ে দিল। ঐ পুহী এই পাহাড়ে বাস করে বলেই পাহাড়ের আরেক নাম পুহী তং।

“মোংখ্রউ রাখাঃ খারীজা লাইংজা স্যাবা পোখং তংমা ঙেঃ মোয়েম্যাঃ।

মর্মার্থঃ

রাস্তায় খাবারের জন্য সঙ্গে যা শুকনো খাবার নিয়ে এলো, সব শেষ হয়ে গেছে। পোখং পাহাড়ে তারা উভয়েই ক্ষুধার্ত।

এদিকে —

মংলিলে মংলে তেদে মেঃ উয়ীছাণ্ড মক্রিহুইং, মংলে চচই, মিনেইং বাদু ব্রিলে লইতে।

মর্মার্থঃ

‘প্রিয়তমার দুঃখ ও কান্না দেখে রাজপুত্রের আর সহ্য হয় না। দৌড়ে তার পাশে এসে সাহায্য দেয়।

কিন্তু এভাবে তো দিন চলে না। সাইন্দোয়েসু তাই তার ‘স্রাঃ নদং’ অর্থাৎ হীরা-পান্নাখচিত কানের দুল খুলে বিক্রি করার জন্য স্বামীর হাতে দিয়ে দিল।

সেই কানের দুল বিক্রি করার জন্য পাইংদাইং মং ছদ্মবেশে রুংগা বাজারে (রাংগামাটি বাজার) গেল। তাকে কেউ যাতে চিনতে না পারে। তাই রাজপুত্র —

‘সারা খোনীং স্যাজীঃ খউছোঃ

সখউছোণ্ড পাইংদাইংমংমা উয়েলেতে,

খংমা ছেইংগ্য কালেইতে।

জগ্যি রোক হাং সন্যাসেসা (সন্ন্যাসী)

আপ্রে প্রেমা তংবচাঃ।

উরাং তংমেইং রোব্রাইং খউলো

রুংগাজীদু পাইংদাইংমংমা সোওয়াখারে।।’

মর্মার্থঃ

“পাইংদাইং মং আম গাছের ছালের রসে সিদ্ধ করা কাপড় গায়ে পড়লো। মাথায় লম্বা জটা ধারণ করলো, হাতে লাঠি নিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে ভিক্ষা করার উদ্দেশ্যে রুংগা বাজারে গেল।”

রাজকুমার যখন রুংগা বা রাংগামাটি বাজারে পৌঁছল, তখন ত্রিপুরা রাজার কন্যা পাইনিলা হঠাৎ দেখতে পেল— রাজার হাতি শালে হাতি, ঘোড়া, বনের বাঘ, হরিণের ডাক শোনা যাচ্ছে। পাইনিলা বুঝতে পারলো যে তার আকাঙ্ক্ষিত রাজকুমার পাইংদাইং মং এসেছে। সে রাজপুত্রকে তার কাছে নিয়ে আসার জন্য লোকজন পাঠালো। নিজে কদমতলায় অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু পাইংদাইং মং তো আসছে না! তখনই পাইনিলা বলছেঃ—

ফাসাইং ফাসাইং ফাসাইং ত্রায়াক ফাঃ মথোওয়উ

ফাঃগুড্যাক্‌মউঃ ব্রাংমা ত্রাক্বীলঃ।

মংসাইং মংসাইং মংসাইং ত্রায়াক মংমারক্

মং ও সাইংখ্রইং থেইংবাং রাঙ্‌মা খ্যোরেলং,

ই স্যাং চংগু পাইং নিলামা ফলাইতে।

চংমা ফগা পাইংনিলামা ততাই ক্রারে ।।

মর্মার্থ :

ব্যাঙের ডাক শোনা যায়—ব্যাঙ তো বাইরে আসে না। সোনা ব্যাঙকে কদমতলায় শিকড় দিয়ে ঢেকে রেখেছে কি না। প্রিয়তমের যেন পদধ্বনি শোনা যায়— তবে কেন এলে না। তাকে কেউ তালগাছের নীচে লোহার খাঁচাতে আটকে রেখেছে কিনা! এই সব কথা ‘চং’ নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে পাইংনিলা সুরে সুরে স্পষ্ট বলছে।

পাইনিলা র লোকেরা এসে বলল— রাজকন্যা, আপনি যেখানকার কথা বললেন সেখানে সবাইকে দেখে এসেছি। আপনার বর্ণনা মত কোন লোক ওখানে নেই। যারা আছে সবাই চেনা লোক। অচেনা বলতে কেবল এক জটাধারী তরুণ সম্মাসী।

পাইনিলা বলছে তবে সেই সম্মাসীই হবে আমার প্রিয়তম। তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। রাজকন্যার লোকেরা তখন পাইংদাইং মংকে জোর করে ধরে নিয়ে আসলো।

রাজকন্যা পাইদাইং মংকে আবার বিয়ে করতে চাইলে পাইংদাইং মং তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলো। পাইনিলা মনে করিয়ে দিলো সে এরা জ্যেষ্ঠ রাজকন্যা তার ইচ্ছাকে পাইংদাইং মং অমান্য করতে পারবে না। পাইদাইং মং বলল, সে বিবাহিত তাই দ্বিতীয়বার বিয়ে করা সম্ভব নয়, এবং এবার তাকে ছেড়ে দিতে বলে। পাইনিলা কোন কথা শুনল না। তাকে রাজ বাড়িতে তুলে নিয়ে জোর করে বিয়ে করলো।

এদিকে পাইংদাইং মং ফিরে আসছে না দেখে সাইন্দোয়েসু রাজকন্যা দুঃশ্চিত্তায় দুর্ভাবনায় দুঃখে কাতর।

কায়াংপাংজে কায়াং পাংথাক্

আসাইং কংগ্যে হ্রোই তাঙ্ ঙ্খাক্।

তাঙ্ ঙ্খাক্ মিসাইং তরাইংমেনা

পোখং তংগা ততাই ক্রারে।

চচইলেখং রেকো হ্যং,

মপ্য রো-দা-পোখং তংমা ম্যাক্বে ক্যারে ।।

মর্মার্থ :

গভীর রাতে গর্জন গাছের উপরে সুকণ্ঠি সোনালি তাং ওহাক নামক পাখি করুণ সুরে তার সাথিকে ডাকছে। এই পাখির ডাক পোখং পাহাড় থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। সেই ডাক শুনে রাজকুমারী মাথা তুলে চারদিক তাকায়। বিরহে মনের দুঃখে পুখং পাহাড় চোখের জলে ভিজিয়ে দিল।

পাইদাইং মং পাইনিলা র সাথে ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে থাকে কিন্তু তার মনেও সুখ নেই। সে সর্বদা সাইন্দোয়েসুর কথা ভাবে। সে কীভাবে একা আছে, কেমন আছে ভেবে পাইদাইং মং—এর মনে কোন আনন্দ নেই।

তার এই মনমরা ভাব দেখে পাইনিলা পাইদাইং মংকে জিগোস করছে, কেন সে সব-সময়

এত মনমরা হয়ে থাকে? পাইনিলা জানতে চাইল, কী পেলে সুখী হবে?

পাইদাই মং তখন বলছে, আরাকানে শ্রোং রাজ্যের রাজকন্যাকে নিয়ে রাজবাড়ি ছেড়ে ত্রিপুরার উদ্দেশে পালিয়ে এসেছে। সে এখন পুখংদং পাহাড়ে পনের হাত উঁচু মাচাঘরে একা স্বামীর পথ চেয়ে বসে আছে। তার কাছে কোন খাবার নেই। সে এখন কী খেয়ে বেঁচে থাকবে! তোমার অনুমতি পেলে তাকেও ত্রিপুরায় নিয়ে আসতে পারি। পাইনিলা বললো, ঠিক আছে দিদিকে নিয়ে এসো তবে আমাকে ছাড়তে পারবে না।

পাইদাইং মং সাইন্দোয়েসুকে নিতে পুখং পাহাড়ে চলে গেল। ত্রিপুরার উদ্দেশে যাওয়ার সময় পথে সাইন্দোয়েসু শুনতে পেল—

নফোউ ছিনীং অবুইং নউচাং।

হইংন্দোমা অংসাই ক্রলতে।

অর্থাৎ— কপালে সিন্দুরের টিপ। কাপড় পেছনের দিকে গুঁজে পরা, হিন্দু রমণীর উলুধ্বনির শব্দ শোনা যায়।

শেষ পর্যন্ত তারা ত্রিপুরায় পৌঁছল। সাইন্দোয়েসু ত্রিপুরীদেরকে দেখে তার স্বামীকে বলছে

‘শ্রোংব্রেং খোওয়ংমা ক্রিখীরেগা,

থাবুইং পংলে, রই সুংখোওয়ং মা নো আরোওয়ে।

ছেইকু লইংখাইং, ক্রাক্কো লইংফ্রেং,

নেং পুয়ীজাংমা উয়ীলু কারে,

জাগো রোসী শ্রোংব্রে খোওয়ংমা প্রুংমেরুং।’

স্বার্থঃ—

মগ ভাষায় ত্রিপুরীদের শ্রোং বলা হতো। এখানে শ্রোংব্রেং বলতে ত্রিপুরা রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে। সাইন্দোয়েসু ত্রিপুরা রাজ্যে এসে দেখতে পেল— ত্রিপুরী মহিলারা পাছড়া হাঁটুর উপরে ললা, নুকে কোন কাপড় নেই। খালি স্তন দেখা যাচ্ছে, কোথাও ছাগল, কোথাও মুরগি বলি হচ্ছে, সেবত পূজা দেওয়া হচ্ছে যে মাচায় তার সামনে ওঝারা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচছে। তাই সাইন্দোয়েসু রাজপুত্রকে বলল, কাকে পূজা করব?

পাইদাইং মং সরাসরি ত্রিপুরার রাজবাড়িতে না গিয়ে কাছাকাছি একটা পরিচিত বাড়িতে উঠল। এদিকে পাইনিলা তার আগমনের খবর পেয়ে রাজবাড়িতে আসার জন্য খবর দিয়ে লোক পাঠাল। সাইন্দোয়েসু লোক পাঠাবার কারণ জিজ্ঞাস করলো। রাজপুত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মেয়ে পাইনিলাকে সাথে বিবাহের কথা বা ঘটনা সব খুলে বলল। এই সব ঘটনা শুনে সাইন্দোয়েসু ভীষণ দুঃখ পেল। যার জন্য মা-বাবা-দেশ ছেড়ে চলে এল সে কিনা অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছে।

পাইদাইং মং আসছে না দেখে পাইনিলা পুনরায় তাকে ধরে নেওয়ার জন্য লোক পাঠাল। তখন সাইন্দোয়েসু পাইনিলাকে বলছে—

আসাক সুংজী লাং মারা

মিংফা ইংমা ক্যোয়েং গংমা ।

অর্থাৎ :-

ত্রিশ বছর পার হয়ে গেল

কেউ বিয়ে করল না,

মা-বাপের বাড়িতে

চাকরদের নেত্রী হয়ে আছ।

সুযোগ বুঝে জোর করে তার স্বামীকে ধরে নিয়ে বিয়ে করেছে বলে পাইনিলার প্রতি
সাইন্দোয়েসু ভীষণ রাগ হলো।

পাইনিলার স্বয়ং কাছাকাছি এসে মাচার উপর থেকে ডাকতে থাকলো। সাইন্দোয়েসু আবার
ডেকে বলে —

থাবুইং তোলাং ওয়া নাদং

ক্যুউছঃ সুন্দং স্রী বুউকো খুইজাং গ্যং

থাবুই পংলে পাইংনিংলামা নুং আরোওয়েং।

স্রোংমা লংবাইং তংফাওয়েং

খোরু জীইজাং হুংত্রাইং হাঁউ,

লাউয়ে ক্যোগ্য তং ম্যাংগা ক্যোয়ীরু খংরে।।

মর্মার্থ :-

ছোট পাছড়া পরে, বাঁশ বেতের তৈরি দুল কানে পরে, তিন হাত লম্বা বাঁকা কোমর,
গায়ের চামড়া শক্ত, পাইনিলার খালি বুক কাপড় নেই, হাঁটুর উপরে উরুর অর্ধেক ঢেকে পাছড়া
পরেছে। ত্রিপুরীদের থালা হলো পাহাড়ের গোলাকার পাতা। শামুক, বিনুক, বাঁশ কুড়ুল তাদের
খাদ্য। মাচার উপর থেকে হাতছানি দিয়ে চিৎকার করে পাইদাইং মংকে ডাক দেয়।

পাইনিলার ডাকে পাইদাইং মংকে ত্রিপুরার রাজবাড়িতে যেতে হলো। সাইন্দোয়েসু
রাজবাড়িতে গেল না। এখানেই রয়ে গেল। স্বদেশের মা-বাবার কথা মনে পড়ে অঝোরে কাঁদতে
কাঁদতে বলল—

‘আমিং লিলে আমিং জংখা

মি উয়ীছাণ্ড মস্যাং হ্লাঃ।

আফালিলে আফালে জংখাঃ

মি উয়ীছাণ্ড মস্যাং হ্লাঃ।

কো থাউলেঙে গ্যোমাসো

খোরাইংফ্রু মিফু জংখা

মি উয়ীছাণ্ড মস্যাং হ্লাঃ।

সুংব্রেখোওয়ংমা মনিংখ্যাং

ইস্যংলে ছো থইংলু গোরো।’

আমার কী যে দুঃখ বেদনা! মা ও বাবা দেখতে পেল না। আমি যে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি ছোটবেলা থেকেই ফুৎ জানতে পারল না। ত্রিপুরা রাজ্যে আর থাকতে ভাল লাগে না। এই সব কথা বলে সে বসে কাঁদছে।

সাইন্দোয়েসু আরও বুঝতে পারলো মা-বাবার অমতে বিয়ে করে পালিয়ে ভিন্ন রাজ্যে এসে কত বড় ভুল করেছে। এখন তার স্বামী অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছে।

পাইদাইং মং রাজপুত্র পড়লো বিপাকে। পাইনিলা তাকে ছাড়ছে না। এদিকে তার প্রিয়তমার সাইন্দোয়েসুর কষ্টও তার সহ্য হয় না। একদিন সাইন্দোয়েসুর কাছে রাজপুত্র গেলে সাইন্দোয়েসু বলল, ত্রিপুরা রাজ্যে থাকতে তার ভাল লাগে না। সে মিনতী করে বলল, আরাকানে নিজ বাড়িতে তাকে যেন ফিরিয়ে নিয়ে যায়। পাইদাইং মং পাইনিলাকেও বুঝিয়ে বলল, তাকে আরাকান রাজ্যে ধান্যোৎসবীতে তাদের সঙ্গে চলে যেতে হবে। পাইনিলাও রাজী হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে পাইদাইং মং তার বউকে নিয়ে রাখেইংপ্রং অর্থাৎ আরাকানে নিজ রাজ্যে ফিরে গেল। পাইদাইং মং-এর বাবা রাজা মাংবাগ্রী তাদেরকে গ্রহণ করলো এবং সুখে জীবন যাপন করলো। এই কাব্য কাহিনিটির কথক - শ্রীশ্রী উদমা নাইন্দাভিসু (অং শ্রী বৈদ্য (মগ) ও অংমোমগ। আরাকান থেকে মগ রাজপুত্র রাজকন্যার ত্রিপুরা আগমন ও ফিরে যাওয়ার কাহিনিটির শেষের অংশের কথক শ্রী মং মং বৈদ্য (মগ)। তিনি বলেন কাহিনিটির ঘটনা মগাব্দ ৮১ সনের। এখন ১৩৭১ মগাব্দ চলছে। মং মং বৈদ্যের এই দাবি সত্যি কি না জানার উপায় নেই—তিনি যা বলেছেন তা উল্লেখ করা হলো মাত্র।

বাসা'না চাগায়াং :

জন্মে বা জন্মিতে মগ জাতিরা একে অপরকে আনন্দ দেবার জন্য এই ব্যাসা গেয়ে থাকে। এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ের দিকে পরস্পরের সৌন্দর্য বর্ণনা ও প্রশংসা করে প্রতিযোগিতামূলকভাবে 'ব্যা' হতো বা এই ধরনের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। গানের শেষে উভয়েই ও ও আসাকলউ বা ও ও আবাইংলউ ও ই ছ ছ করে উচ্চস্বরে উল্লাস প্রকাশ করে। নীচে ব্যাসা কিছু কূলে ধরাছি—

লক্ষ্যসামূলক 'বাসা' গান :

ছেলে :

আরোওয়াব্ পফা (হোং হোং)

আরীস্যাংমা রোওয়া তইং জইং চলোথাঃ

আরী স্যাংমা মাংরে রাংসোয়ী

খামাং খোওয়া না পংখোওয়াং তোওয়ালো

আসীখা মত্রাং ক্রীমা ক্রাংমে

লইং রোওয়া মীগো মংছাইতে মত্রাং লংখাং ময়াং লঃ ছোয়ী

মুত বালা প্যাবা তুয়ীরে।

অনুবাদ :

বড় বড় কুমড়োর পাতা—

রোওয়াতং পাহাড়ে কুমড়োর গাছ লাগিয়ে রেখেছে, গাছগুলি সুন্দর করে বেড়ে উঠেছে। ছোটবেলায় ভালো লাগেনি, যৌবনে ভাল লাগলে ভালবাসতে যদি দেবী হয়ে যায়। তাহলে অন্যজনের সঙ্গে ফুটি করবে।

মেয়ে :

আনুস্থং যাঃ যাঃ রাতং জইমা যাঃ গ্রাং খাঃ

মা তংলখাঃ ময়াং লংমোয়ী

কংয়াং স্রীংমা স্যাংরো তুয়ীরে

আরীস্যাংমা স্রাংরে রাংসোয়ী

আসীখাঃ মত্রাং ক্রীমা ব্রাংমে,

লইং রোওয়ী মংমা

সুতবালা প্যলো তুয়ীরে।।

অনুবাদ :

পাহাড়ের কোলে ছড়িয়ে থাকা সুন্দর নরম তিতা করলার লতা গাছ। সময় থাকতে চেয়ে না নিলে এই জগতে অনেক কিছু হারাতে হয়। পিসীমার বুকের ধন (পুত্র)কে ছোটবেলায় ভালবাসলাম না, বড় হয়ে গেলে ভালবাসব ভেবে ভেবে এখন মংকে অন্য মেয়ের সঙ্গে আনন্দ ফুটি করতে দেখা যায়।

ছেলে :

সাগনা লীখ্যো আলে লউমা পুংলোক্তোঃ চীঃসুউ মসঃ হুঃ সো মাহীঃ

সিংগোওয়াইং ব্রাংমা ক্যালো হীংরে।

অনুবাদ :

সাগনা নৌকা মাঝখানটায় পোকা ধরে গেছে। তাই কাউকে চড়তে দেখা যায় না, চালাবারও লোক নেই। বালুচরে পড়ে আছে।

মেয়ে :

স্থাক্‌প্যো কথই ওয়েংসামা দাঃ মানই।

ক্যাংরা ক্যাংজী কথই সাইং থাক্‌ ক্যাংরে লঃ।

আস্দী ওয়ং ওয়া আহগ্যা খারী

তঃপলউ চারাখিঃ।

পক্‌ছীং গংস্থাক্‌ দাঃগং য়ৌউলুঃ

তঃপলউকু হীঃ রামে।।

অনুবাদ :

কলা গাছকে কাটতে গিয়ে দা গাছের পেটে ঢুকল না। যতই শক্ত গাছ হোক লোহার চেয়ে

কি বেশি শক্ত। হলুদ রঙের তঃপলউ ফল, ফলের বাঁটা শক্ত, সেই ফলকে সহজে ছিঁড়ে খেতে
পায় না। কুড়াল ও ভাল দা নিয়ে গাছকে কাটলে তবেই সেই ফলকে হাতে পাবে।

ছেলে :

আরোওয়ক পপ্রাউ তঃ আউঃ
রহুউ মীরো মা প্রগে
মীরো মাইং ছাইং পালিমে
আরোওয়ক মম্যেঃ তঃরগোংমা তঃপান্নে
লাউস্যে ছোয়িগা তঃপান্নেমা আচীঃ লারে
মিঃগা মাইং ছাইং পালিমে।।

অনুবাদ :

লম্বা লম্বা জংগলি আমের পাতা
সরাসরি বলে লজ্জা দিও না,
প্রেমসী রাগ করতে পারে।
ঘন জঙ্গলে কালো রঙের কাঁঠাল পাতা
চিকন ডালে বুলতে গিয়ে পাতা ছিঁড়ে কষ
বা আঠা হাতে লেগেছে। প্রেমসী রেগে যেতে পারে।

মেয়ে :

সুখোওয়া ফোরং তাঙহুদেমা সুংলোং প্রং, মা পোউচীগে মিনামং সুখোওয়াসী গো
খোয়ীচামে।

অনুবাদ :

চিমড়া, কুমড়া একই বাঁটায় তিনটি ফল ধরেছে। এই ফলগুলোকে পচতে দিও না।
লাকলে দু'জনে বসে ভেঙে খাব। তাকে যতন করে রাখো।

ছেলে :

তাঃখীয়া ওয়ংগে তবাং ওয়াগো খোয়ে কংরে,
খোয়াহিতে মা খোয়াহিতে, খোয়াহিতে যাহোউ
লারে লুইংমা মংহুহিতে।
তোরোওয়া ওয়ংগে তয়উ মিগো মংহুহিতে।
হুহিতে যাহোউ তয়উ মিগো ম্যো হুহিতে।

অনুবাদ :

বনে গেলে একটি বাঁশকে কাটতে ভাল লাগে।
বাঁশ কাটতে গিয়ে শুধু একজনের কথা ভাবতে থাকি।
এক গ্রামে ঢুকলে একজন মেয়ের কথা শুধু ভাবি।
ভাবতে ভাবতে তাকে একান্ত নিজের বলে মনে হয়।

মেয়ে :

ছাংরে সুরে লুউ মাহোউঃ
পজইং ফোরে ঙাঃ মা হোউঃ
কাইংনো কাইংনা পজইং ফোগো য়ো মচাঃ ।

অনুবাদ :

গরীব লোকেরা মানুষ নই, সাদা ইচাণ্ডা মাছ নই
সাদা ইচাণ্ডা মাছ নই ।
জলের কিনারে পড়ে থাকলেও
কেউ তাকে ধরে খায় না ।

ছেলে :

খ্যাউতে প্রোউতে
পজইংফোলে ঙাঃ থাউ আই ॥

অনুবাদ :

রাধুনী রান্না করতে জানলে
সেই ইচাণ্ডাও বড় মাছের চেয়ে
খেতে সু-স্বাদু হয় ।

ব্যাঙ্গসূচক ব্যাসা :

মেয়ে :

ওয়ক্সোমা নাইংগ্রং তঃনায়ং
পোঃ ছোঃমা চাংগ্রং তাং প্যং ব্যং ।
আমংমা যউক্যা ওয়ক উয়ী লারে
যা প্রেসালে যা রোওয়া সাঃ
ব্রিং ব্রিং মা ব্রং ব্রং ব্রিং ব্রিং ॥

অনুবাদ :

ডোরাকাটা ছোট শূকর বনের ধারে
ঘুরে বেড়ায় ডোরাকাটা চাদর জড়িয়ে ভাঙা
কোমরে শূকর কিনতে যাচ্ছে । ও দাদা
তুমি কোন গায়ের গো কোন দেশের ?

ছেলে :

আসীরোঃ আচঃ, নাবাইং জামা সাইংতাসঃ
ক্যউছঃ লোংথোং নোঃ উংগ্রীঃমা
মংগো মিঃরে জা কইচা ।
ব্রিং ব্রিং মা ব্রং ব্রং ব্রিং মা ব্রং ॥

অনুবাদ :

কী ধরনের যুবতী কন্যা, কানের গোড়ায় একসের উকুন কিলবিল করে।

মোটাসোটা ভাঙা কোমর ফোলা

ফোলা বুক নিয়ে আমাকে জিগ্যেস

করার কারণ কী?

মেয়ে :

আসাক্রী ক্যাং খ্রীঃ তবাং লা

ছাংগো খ্যইংরে হোউতে ল ব্রীং নামং।

অনুবাদ :

তুমিত পাকা শিকারী। একটি সুতা

দিয়ে হাতিকে বেঁধে রাখতে পারো।

ব্রীং না মং সেই কথাটা কি ঠিক?

ছেলে :

তর ওউ কাইং থউ ওয়া কউল উমা ক্রোয়উ স্যউতে

মিরো তাং গউ না ফোউ মউকো মংক্যউতে।

লউ মং ক্যউতে।

অনুবাদ :

তরঙ নামক নরম বাঁশের সিঁড়ি, বাঁকা বাঁশের উপর বেয়ে হুঁদুর চলে (মেয়েটি), বাঁকা কোমর ও উঁচু কপালের উপর (আমি) লাঠি মারি।

ছেলে :

বাকাইংমা মাথইং বইংমা থইং লই থইং মামা স্যাংগো মিংরে কী চালে।

অনুবাদ :

কাপড় বুনতে না বসে সুতা তুলতে বইং (বইং = সুতা তোলার যন্ত্র বিশেষ)

নিয়ে বসেছ। নিজের কাজের বেলা কিছুই না। আর আমাকে এমন করে জিগ্যেস করছে।

কেন ?

মেয়ে :

ময়উ চায়াং তাং প্যাং প্যা

আমং হাউক্যা ওয়াউ ওয়ী লারে যা রোওয়াসা।

ব্রিং ব্রিং ব্রিং।

অনুবাদ :

ডোরাকটা বা চেক চেক কাপড় পরে

কোন গায়ের গো তুমি, কোথায় শূকর কিনতে যাও?

ছেলে :

তরুণ কাইং থাউ ওয়া কলউমা ক্রোওয়াউ স্যাউতে

মিরো তাং গউ নাফোউ মউকো

মং ক্যাউতে লউ মং ক্যাউতে। ব্রিমা ব্রং

অনুবাদ :

তরুণ নামক বাঁশের সিঁড়ি, বাঁকা বাঁশের উপর দিয়ে ইঁদুর দৌড়ায়, মেয়েটির বাঁকা পাছা ও কোমরে উঁচু খেবড়া কপালে মং (আমি) লাঠি মারি।

মেয়ে :

পোং ছোয়া তলাইং ওয়া তলাইং

হুং প্রাইং ক্যগ্যে মিগো

নং নং মা হ্রোওয়াং গ্যে।

অনুবাদ :

পুরানো জুম এক দিকে, বাঁশবন অন্য দিকে, দুইবার দুই দিক থেকে পার হয়ে এসে (মেয়েকে) আমাকে বদনাম করো না।

ছেলে :

আবোয়ীং ছোং ফোংব্রা

পোং ছোং তংমা ওয়ী সাং হ্রা।

ব্রিং ব্রিং ব্রং ব্রং - ব্রিং ব্রিং ব্রং।

সুং নহুং পোংছোং, মলংব্রাংমা রং থাঙুং।

অনুবাদ :

রঙ বারে যাওয়া ছেঁড়া পুরনো থাবোয়ীং (পাছড়া) পরে আছ। পরিত্যক্ত জুমে পুড়ে যাওয়া গাছের গুড়িতে জড়িয়ে থাকার মত দেখা যায়।

মেয়ে :

লারা জিলিং লালি য়োউরা দিলে য়োউলি

মিং থাবোয়ীং ছোং গো পংছাং লিং।

অনুবাদ :

যেখানে খুশি নিয়ে যাও। আমার সেই পুরান থাবোয়ীং (পাছড়া)কে গলায় জড়িয়ে নাও।

ছেলে :

তো রোওয়া ওয়ংগ্যে

তয়উ মিগো মং হুইতে।

হুইতে জাহো তয়উ মিগো ম্যোহুইতে।

অনুবাদ :

একটি গ্রামে গিয়ে একটি মেয়েকে ভাল লাগল। ভাবতে ভাবতে আপনজন বলে মনে

হল।

মেয়ে :

ছাইকা ছাইচী তয়উ মংগো
চোয়ী মাপ্রীঃ। ব্রিং না মং কাপ্যালাংগা
ছোফোঃ মাতাইং মং তয়উকো খ্যীঃফোমতাই।

অনুবাদ :

তুমি যতই আপন ভাব। তবে একটি ছেলের কথা আমি ভুলতে পারি না। কাপ্যা, লাংগা
গাহিতে পারি না। তাই মং একজনকে বোঝাতে পারি না।

ছেলে :

ত্বংদাদীরা মায়েউ তয়উমিগো
ক্ষনাদীরা মাখ্য।
তসাঃ খ্যমে মংছাইতে লউ মংছাইতে।

অনুবাদ :

আমি এমন ছেলে যে 'মি'কে (প্রেয়সীকে) ক্ষণিকের জন্য ভালবাসি না। আজীবন ভালবেসে
যাব। এই বলে রাখলাম।

মেয়ে :

ক্রমাদিরা ব্রউক্যে, সাং সোংছীঃ
নিংলিরা সোংবুং ক্যাল্থাব্যা।

অনুবাদ :

ঐ আসছে ডোরাঁকাটা ত্রিশটি মুরগির দল, তিন প্রহর বিকেল, পড়ন্ত বেলা, এখন ঘরে
ফেরার পালা।

রদুউ :

এই রদুউ একটি কাহিনিভিত্তিক লোকগীতি। আবার কাহিনিভিত্তিক নয় তবে আনন্দের বা
বিরহের রদুউ প্রচুর রয়েছে। এতে একটি নির্দিষ্ট কোমল সুর ও ছন্দ বিদ্যমান। অতীতে এই রদুউ
অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও বর্তমানে প্রায় বিলুপ্তির পথে। রদুর মধ্যে কাহিনিভিত্তিক রয়েছে উদীনা
মাউসা রদুউ, দাইং মাউজিয়া রদুউ ইত্যাদি বিরহের মধ্যে লোওয়েং রদুউ উল্লেখযোগ্য। নীচে
লোওয়েং রদুউ অর্থাৎ একটি বিরহের গীতিকাব্য তুলে ধরছি।

অঃ রাঃ সরামা প্যজরালে গ্যেয়ী খাঃ খোঃ গ্যো লঃ তাদোয়ে দোয়ে।

মং গ্রং চোয়ী পো মিস্রো রাংফেঃ সে-লে। প্যজরাজে মানিং দাই আথাউগংখাং আগা ব্রাং
ওয়েং লাংরং ছাং খোয়ে লে। মংছংবা পালঃমে ক্রাইং জিসো হ্রা মরা, আপা ওয়েংগ্যাং ক্রিংমভ্রাজি।

সুমো কোজা থাং লে।

বীঃ চংব্রাইং বীঃ মাতোয়ী

গ্যা চংব্রাই, গ্যাঃ মাতোয়ী,

লাক্ফ্যা কইং ঙাউ, উথীং তাংরে

প্রইপ্রই ম্যাউরে চীং লে।

অং ঙাহ্‌উসা খ্রোঙো বাজা ছোলে -

খ্রোঙোলং ক্রেউ হ্বাজে মং থেং বারমে তারাউ

খ্রোং ছোং খ্রাং গো মিরাসী বা-দে-।

মিঙো নিংরেমা ইংখং জেইংগা খ্রোসা তাক্রোউহ্লা-জে, মাক্রোউ জি খ্যাং দি লে।

পিয়েং, বালি মাংখ্রো সাব্রাং গো

তাহোগা ক্রাংনাজে মাখাইং খ্যা -

তাজাং নিওয়ং ওয়া ইংসামা মংগো তাহ্রো হী-লে।

নিংমাপ্রেং ইংমা ওয়েবাং ছোয়ে

ম্যাক্রাংজে হ্রোয়ীং স্যাং সোম্রীংরে - হুং।

প্যাংলোওয়েং (উয়ীছা) রোওয়ে উয়ীজইং খাং মংগো ইমাক থাংরা মাউজে, অং, সাক্লে
মাহী বাদে। মংলালং ফ্যখালে মিংগা চোয়িলো খ্রোং গো হ্বাজে দে-লে-। খ্রোং তফ্রং থোং তালো
ছোদংমাতে হ্রোকা হ্রোয়েজে সাপ্রে মংলেফু গো, লোওয়ে কোজে মাপ্যরা। হুংপা চোয়ী তো
মংলো ফুছা আহ্রোং মাপিখা লে। স্যাংছোরে লো রোওয়া দোওয়ং হ্রুদা নিংরোওয়ে ম্যাচি খিঃজা
ক্রাংজে -

ছোদং পাইদাং কোং অংনিইং জেথ্রলে - মংগো হ্রুচি তাই রোওয়ে লো রোওয়ে মা ওয়ং
রাং মতাংখাং খাং গো হ্রা- চিজোওয়া হো ক্রাংমিলে কা ব্রীরা আসীগাং ক্রাং মাছো খ্যাংজে ওয়েং
দোওয়ং জাং আসীং ক্রোয়িলে --। খো তাফ্র ওয়াসনা কইংহুং পালো—

ক্রীমা ক্রাংরা বাং লং। ফ্রোময়ে হ্রুজে খোওয়া প্যোময়ে তানিং তাখা মস্রাং বাজে মিংজা
চোয়ী ওয়েং ঙাইলে-। ছোয়েরে রাং খাউতাং লইং খ্যাং স্যাউরোওয়ে আসা হ্রাইং বা খ্যাং লে --।

স্রা সোওয়ং জে ফোং লইং রোওয়ে ফোং খ্যাং লোওয়ং রোওয়ে ফোং খ্যাং লোওয়ং
রোওয়ে ঙিং গোয়ে মংগো দি - লে-। অং ফো খ্যাং লইরোওয়ে ঙিংগোওয়েং মংগো তা ছোগা
নিংমা প্রে-ইংমা ওয়ীবাং ছোয়ে মাক্রাং জে হ্রোয়ী স্যাং সো ম্রিরে হুং।

চীতে জিফোওয়ি মাহী খ্যাং খ্যে, উয়ীছালোওয়ে, লকপোংজে ফ্যসো মপাহী — লে।

মি ম্যাউচীজেক্রিঃ ফাইংম্যা ঙুং সোওয়ং ফ্রোমোংতীংফ্রো লীথ্রং সোওয়ালে —। তাইং থা
আং মানিং তায়ক হ্রোয়ীসো মংফো হীংরা হ্র্যাং জোওয়া তাথক আরক পিয়েং খ্যাং জোওয়ালে —
। মাতীজেকোং দো আ-মাফোরাক হ্রী ক্রাজে কালা ম্যাদে পিয়ং ইংরাজে তাখোয়ী খোয়ী তংস্রং
ওয়ে গ্যাং ক্রী মস্রাংজে, তংখোওয়ংজা আতী - লে —। তংখোওয়ং আতী মংমাহী গো - সীহ্র্যাং
বাং খীংখাজে, বিঙ্যা লোঙয়েং আহ্রী তাজইং - আহ্রা মংগো লোওয়ে - লে -।

অনুবাদঃ—

নিশিরাতে কাতরে ঘুঘু পাখির ডাক শোনা যায়। মং বঁধুর বিরহে প্রিয়া বুকো বার বার
চাপড় মারছে। আকাশে চাঁদের আলোকে কুরাশা আছন্ন করে ফেলেছে। এই সময় আমার একা

এক রাত কাটে না। প্রিয় মংকে খবর দেব কী করে কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না। বাঁদিকে ফিরে দেখলে শূন্য, ডান দিকে ঘুরে দেখলেও শূন্য— প্রিয়তম কাছে থাকলে হাত ধরে বুকে তুলে নিত। ‘মে’ প্রিয়া এই কথা ভেবে একাকি বিছানায় ছট ফট করছে। যাও ঘুমু পাখি তুমি আর ডেকো না। আমিও তোমার মত সাথিহারা, তাই আমি এই ডাক সহ্য করতে পারি না। দুঃখে শোকে ঘুমাতে গিয়ে মং প্রিয়তমকে স্বপ্নে দেখলাম— হায় প্রাণ যেন আমার দেহে নেই। ও প্রিয়তম মং, কাছে এসে আমাকে সান্ত্বনা দাও। পূর্বজন্মে হয়তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাইনি, কোন পুণ্যকর্ম করিনি, হয়তো তার জন্য এই বিচ্ছেদের দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। রাংতা পোয়ে অনুষ্ঠানে বুকে কাপড় বাঁধার আগে তোমাকে দেখে ভালবেসে ফেলেছি। একদিন না দেখলে থাকতে পারি না। মন চায় তাঁর বুকে পরে গলায় জড়িয়ে ধরে ছুঁয়ে থাকতে। বিচ্ছেদ ও বেদনায় দিন কেটে যায়। সন্ত্বনা দেবার মত কেউ আমার কাছে নেই। ও পাখি আমিও উড়ে যেতে চাই আমার মং প্রিয়তমের কাছে। ডানে বাঁয়ে সম্মুখে আমার সুন্দর মুখ মংকে খোঁজি ও আল্লা মং, কাছে এসে আমার দূরবস্থা দেখে যাও।

পাংখুং :

মগ সমাজে পাঙখুং একটি ধীরলয়ের গীতিনাট্য বিশেষ। এই গীতিনাট্যকে কেন পাঙখুং নামে অভিহিত করা হয়েছিল তা জানা নেই। তবে আক্ষরিক অর্থে পাঙখুং অর্থ মাকড়সা। শোনা যায় মাকড়সার ছন্দোময় নৃত্যের ভঙ্গিতে বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে এক মগ বা আইমা নৃত্যরসিক কর্তৃক মগ নৃত্যকলা সৃষ্টি করেন এবং নামকরণ করেন পাঙখুং নৃত্য।

পক্ষান্তরে, পাঙ-অর্থ-সংঘবদ্ধ এবং খুং-অর্থ - উল্লাস। অর্থাৎ সংঘবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে উল্লসিত নৃত্যকলাকে বোঝায় পাঙখুং। এক সুরের পালাগানের আদর্শে জীবন কাহিনিভিত্তিক নান্দনিক অনুষ্ঠানবিশেষ। এর সুর তাল লয় ছন্দরূপ, দারুণ হৃদয়গ্রাহী। মগ ভাষা ও মগ বর্ণমালার মাধ্যমেই পাঙখুং গীতিনাট্য রচিত। এই পালাগানে মিলনান্তক ও বিয়োগান্তক উভয় পর্যায়েরই গীতি-সংলাপে পরিপূর্ণ। এই পালাগানের মধ্যে ফায়েগুঙমা, ককানু, ওয়েসেন্দ্রা, মনরী, থাশা, বম পাংখুং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই পালাগানকে গীতি-নৃত্য-নাট্য সমন্বয় ত্রিসঙ্গম, জাত নাট্যশিল্পবিশেষ বলেও ধারা হয়। যাত্রাপালায় পাঙখুং গান গেয়ে রুমাল নাড়িয়ে সুর, তাল ও ছন্দে নিতম্ব দুলিয়ে ‘আরুসোকারে’ অর্থাৎ নর্তকীগণ আকর্ষণীয় ভাবে পাঙখুং নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। এই নৃত্য গানের কিছু অংশ তুলে ধরছি। যেমন —

উদংমা ক্রোক্রো কিংদিরা

হাংসরা ফগোয়ী লিদালে খোওয়ংমা

দিলীজা ওয়ীগা ক্যা

ফাইংখ্যাংমা জসু ফাইং ললি কোং

খ্যাখ্যাংম জসুহোই হাংলে সাগো

সায়াজা খ্যল কোং।

তংফ্যারা গো থক আগোলে ছুক
 হাংসারা কোপ্রে প্রাইংলিরাগে
 আরমা তাখা হোয়ি হাংলে সাগো
 খ্যমংথোয়ী রামহোউ।
 মা খ্যরা মা ত্রাং মালোরা ওঁরাংগে
 মিরোরা কোপ্রে প্রাইং থা গে
 আর তখা তু য়ে মিগো
 খ্যমংথোয়ী মরাব্য।
 আফা নাহ্বা আরীস্যাংমা
 স্রাংজে রাংসুয়ে খ্যমং থোই
 খ্য খ্যাংমা জসু তুয়ে মিগো
 দিলী খ্যল কোং।।

অনুবাদ :

চারদিকে পাহাড় অরণ্যঘেরা সুন্দর মনোরম লুঙ্গা ভূমিতে হাঁস ও ক্রোক্রো, কিন্দ্রানামক
 ময়ূরীর দল পাখনা মেলে অবতরণ করেছে। কেউ যদি ধরে নিতে চাও ধরে নিতে পারো। কেউ
 যদি ভালবাসতে চাও এই মুহূর্তে ভালবেসে ফেল। নরম সুন্দর পাখা মেলে উড়ে গেলে, নিজের
 দেশে ফিরে গেলে হাঁসকে আর ধরে নিতে পারবে না। যদি, ভাল না বাস যদি, না চাও— সোনার
 হংসবতী ফিরে চলে যাবে। প্রিয়তম চাইলেও কাছে পাবে না। বাবার বোন পিসীর - সবার চেয়ে
 প্রিয় হৃদয়ের রাজা প্রিয় তুমি, —তোমার প্রেমে পাগল আমি।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, সরলজাত পাঙখোংগুলির নাম— ১) সইতাথানু; ২) কংকানু; ৩)
 লংমায়া; ৪) থাঙ্গা; ৫) ওয়ই চাকুমা ৬) মংনং; ৭) লংচাইন্দা; ৮) বৃদ্ধ ওয়েথুইতাদি পালাগান।

জটিল জাত পাঙখুং পালাগুলির নাম — ১) তেঁমী; ২) জনাক্ষা; ৩) সয়েঙ্যা সামা; ৪)
 নেমী; ৫) পুরীন্দা নাঘাং; ৬) চাইন্দা কুমারা; ৭) নারদা; ৮) উইথুরা; ৯) ওয়েসাইন্দ্রা ধম্মাজিয়া;
 ১০) উদীনা; ১১) মগালুলাং; ১২) মনহরী; ১৩) ওয়ংগ্রইং; ১৪) সাংজোয়ে; ১৫) গোং সাংলং
 না; ১৬) নায়দা; ১৭) উইজোয়া; ১৮) সিলাবাঙু; ১৯) শোয়েফঙদ; ২০) ফলুংমাঙ ছাঙজোয়ে।

‘ওয়েসাইন্দ্রা’ পালা গানের কয়েকটি লাইন তুলে ধরার চেষ্টা করছি :-

ওয়েসাইন্দ্রা ফোওয়ারে আখীং খাং (ওয়েসাইন্দ্রা জন্মের সময়) :

উয়েসাইন্দ্রা মাংসা ফোয়াজেনিংস্থংগংখাং সোওয়ারদেজং।

উবস্থছা আমে হীংজং লাখনা আছাংস্থাক।

মাংগলা আপং মোয়েরং আছাং কোলোং ফ্রোথাংজং।

ছাংফোদজে রউল্হায়ে - ফুরাংলং ফোংদংগ্রং।

থপাইং সাংগ্রো চমী অংরা সীদংমোংদেজং,

সীংজি মাংগ্রী খ্যসা দগোনোথী পীএ এ্যাং।

আরেহী সাংমীমা নিংজ মিমা ফ্রোজ মিং মাগো

এগ্যোজ মিংমা নাখরী মিমা সাম্বেহী মিংমাগো।

সাম্বেদো মীংমা আপ্রকাংজ

মীমা দোগো হ্লাথ্যাং রোয়েপং মাছিসাং

খোনি কালউ আপ্রকাংজঃ

খ্যোজঃ নোরে গো।

প্রেজুং বাল্যাং নিহসা হ্লাজোওয়া

নোথীং যাংছুইং জঃ।

নহরা লিগীয়া রোয়ে কউ য়োউরোয়ে

নোথীং পী-এ-য়ে-।

আমে থংসং তায়ক চিমা

সা-লে ফোওয়া সাঙয়ে।

আমে দোসা ফোওয়া ফাউ থউসাং

সোঃ গ্যো দো-গো-লে।

আওয়ে তাইংছাং নোথীং পোখি

আচং আরং পী-।

ওয়েসাইন্দা মাউসাং থউসং ফোওয়াফাউ

তোগোওয়া হ্লাক নীং-য়ে।

মিয়া জোওয়া থ্রাইং তাংদিজোওয়া-

প্য-বা-সায়- জোওয়া।

অনুবাদ :

ওয়েসান্দ্রা মাংসার (বসন্ত, রাজকুমার) জন্ম লগ্নে, সারা দেশে আকাশ আলোকিত এবং আলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। চারদিক মঙ্গলধ্বনিতে মুখরিত। শ্বেতহস্তী ফুল নিয়ে সদ্যজাত বা ভূমিষ্ঠ হওয়া আগামী জন্মের বুদ্ধপ্রাপ্ত শিশুকে পূজা করতে উপস্থিত হয়েছে। সিংজে মহারাজার কাছে শিশুকে লালন-পালন করার জন্য শত মহিলা উপস্থিত হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ শ্যামলা কালো, কেউ গোলাপী ও ফর্সা, কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, কারো নাক লম্বা কারো নাক চেপ্টা ইত্যাদি। এদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে— যিনি সুন্দর, স্নেহময়ী, মাতৃতুল্য দোষমুক্ত নারীকে। ২৪০টি দুধওয়ালা বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রতি একজনের ৬০ হাজার রকমের নাম রাখা হয়েছে। ওয়েসান্দ্রা (বসন্ত) রাজকুমার -এর সঙ্গী একই লগ্নে ছয় হাজার শিশু জন্ম গ্রহণ করেছিল। মহারাজা প্রত্যেক শিশুদের জন্য কাপড়, দুধ, খাদ্য বা সেবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। অনেক শিশুদের মাঝে ওয়েসান্দ্রা রাজকুমার হেসে খেলে শৈশব জীবন কাটিয়েছেন।

পাণ্ডুং মগ জাতিসত্তার একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। কৃষ্টি, ধর্ম, কর্ম, প্রেম, আনন্দ -বিষাদ, আশা- আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং মানবীয় বিভিন্নগুণ, বিভিন্ন রঙে, চঙে, পরিস্ফুটন

ঘটানো হয়েছে পাণ্ডুখুং গীতিনাট্য কর্মে।

বাংলাদেশে স্বনামধন্য লেখক ক্যশেপ্রফ্‌মারমা তাঁর লেখা মারমা নৃ-গোষ্ঠীর সংগীত ও নৃত্য' নামক প্রবন্ধে (পৃঃ৩০) পাণ্ডুখুং সম্পর্কে এই কথা উল্লেখ করেছেন।

এই নান্দনিক শিল্প অর্থাৎ পালাগান বর্তমানে প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। মগদের গ্রামেগঞ্জে উৎসব-পার্বণের সময় মহা উল্লাসে পাণ্ডুখুং নাট্য পালাগান অতীতের মত পরিবেশন করতে আজকাল আর দেখা যায় না।

সাইংগাইঃ

সাইংগাই, একটি সমবেত সংগীত। বিভিন্ন উৎসবে দলগতভাবে এটি পরিবেশন করা হয়। বাংলা জারি গানের মত প্রথমে একজন গান শুরু করে, তারপর তালে তালে একই সুরে ও ছন্দে সমবেতভাবে গানটি গায়। সাংগ্রাইং (চৈত্র সংক্রান্তি) দিনে জল খেলার অনুষ্ঠানে এই গানটি গাইতে দেখা যায়। গানের সাথে বুং পাইট, (এক প্রকার ছোট ও বড় ঢোল) ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

পাদীসা পোওয়ে (কল্পতরু উৎসব)ঃ

ওয়াগাই লারো বা ওয়া উৎসবে, কঠিন চীবরদান উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসবে পারসই পাদীসা (সুদৃশ্য প্রাসাদ ও কল্পতরু) তৈরি করে পূজা করা হয়। সেই পাদীসাকে (কল্পতরু) ঘিরে যুবক যুবতীরা ইং গেয়ে তালে তালে ছন্দে নৃত্য করে। বিভিন্ন ধরনের ইং -এর মধ্যে পোয়ে বাইং ইং, সং সাং ইং পাইং চাইং বে ইং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নীচে একটি পোয়ে বাইং ইং তুলে ধরা হলো —

ফোরা ওরা সাংখাঃ সুংবা হ্রোয়ীক্যংসামা স্রেফোরালে।

ক্যংগ্রী তথং পাইংজে ফোংগ্রী হ্রোয়ী ক্যংসামা ছারাগ্রী।

আকোয়াইং তখ্যাউ সাই ছারাগো উতঃয়াংলে।

আসুদাদা আসুকমোউ সিংদব্রাংমা কন্মো লুকতে।

য়উক্যা ফ্রহ্রোয়ী ফঃ হ্রোয়ী মকোয়ী রেংওয়েংবেজঃ জাংখারোগো সাংখারেলে।

হ্রীগা ফোওয়া লুব্যোম্যামা টোয়েংগা সোওয়ালে।

নউকা ফোওয়া লুব্যোম্যামা ঙাংগা সুওয়ালে।

সুওয়ালি দাদা সুওয়ালি জখাঃ পোয়ীদঃ সামা রউলে তিলে।

পোয়ীদঃ সামা ক্রিখ্যীরেগা পারসে ঙাছং পিদিসা লিংবাং সিংদঃব্রাংমা শ্রাংলঃতিলে।

হিংচই চই হই।।

আর তসোয়ী সিংদঃব্রাংমা ক্রিখ্যীরিগা

খমাংথংরে পাইংথং কগোওয়া ছিমিংথং প্রংব্রং

সিংদঃব্রাংমা শ্রাংলতেলে।

লুউতে কবাং নেনাং সগ্রা ফোরা মালু

নেংসা লিয়উ সিংদঃ ব্রাংমা

সাইংতংমোয়িং ও রোরাই কইলু চংহ্লারিলে ।
 চতুবালা লোকাবালা আসাইং বালা জরাবালা
 নেংসালিং যউ নেহ্ পারসেকো চংহ্লারিলে ।
 সাধু খং সেইং থাং আগামা খোওয়াইং মাঙেইংলে ।
 আর তসুয়ে ক্রিখ্যিরিগা সিংদ ব্রাংমা সাংলতিলে ।
 থাকাং তাজইং কিংজা থইংরে
 অউকা তাজইং লুবোয়া থইংরে
 হুচইং জইংরে হুচইং আক্রা মংসাইঞ্য হুউ
 মেমাঙেও ইংছোং খ্যারে ।
 মতে মতে আক্যুওয়েং হুেউমা ঙাং মরোওয়ে ।
 ঙাংউরে মানইং খোংরে মরোওয়ে
 নোওয়া সুজ্জীমা খংলং চোয়ে হুঙাং ।
 ইংসাইং সাইংরে ইং সাইং মাকং
 ওয়া থ্রী থ্রং ও থেং কজাই ঙাং ।
 তারাউ আক্যোওয়েং ইং সাইখ্যোঙছো প্রামিলে ।
 মক্যাজংলি ফারা লসি
 পোয়ীদংনিংরে ওরী গ্রীক ।
 মসাং জলে ফাবালসি
 পোয়ীদোওয়াং নিংরে নউম্যাহোলে ।
 মিংয়ং যংরে মিংয়ং তুউলে পোয়ীদং সামা আমিং মেলে ।
 ফায়ং যংরে ফায়ং তুউলে
 পোয়ীদসামা আফা স্লেলে ।
 কোয়ংয়ংরে কোয়ং তুউলে
 পোয়ীদংসামা পোয়ী ক্রিসুলে ।
 আক্যোওয়েং তখ্যাউ কুরুসুগো ওঃওঃ যাউলে ।
 লাখোউ সাইংখ্যো মন্ডিলু লামা লাউচোয়ে লাছিখ্যংগো
 হুখ্যংগো হোয়ে লাছিখ্যংমা হোয়ী লাউচোয়ে ।
 আতোওয়াং প্রাফো জেগসুউ প্রাংথা
 ইং গো ছোরে লুবোয়ামা রো । হীং চই চই হই ॥

অনুবাদ :

এই স্বর্ণমন্দিরে বুদ্ধ ধর্ম সপ্ত তিনটি রত্ন প্রতিষ্ঠিত । যিনি এক হাজারটি মন্দিরের মালিক,
 সেই স্বর্ণমন্দিরের ফোংথ্রী (বুদ্ধ ভিক্ষু) মহা গুরুজীর চরণে প্রণাম জানায় । কাদের পুণ্যকর্ম সেই
 সিংদংমঠে উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে । পুরুষেরা দল বেঁধে বড় রাস্তা ধরে চলে গেছে ।

যুবকেরা সামনের পাঠেলে হাঁটছে আর পিছনের পাকে টেনে নিচ্ছে। এমনি করে চলতে চলতে পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানে পৌঁছে গেল। এই অনুষ্ঠানে পারসে গাছং (পাঁচটি কল্পিত সুদৃশ্য প্রাসাদ), চারটি পাদীসা (কল্পতরু) দেখলাম। আর এক লাইনে দেখলাম থমাংথং (হাজার ভাতের তৈরি মন্দির), পাইংথং (হাজার ফুলের প্যাগোডা), ছিমিং থং (হাজার প্রদীপ) উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই পুণ্যকর্ম শুরু করার সাথে সাথে চার জন — চতুর্ভল, লোকবল, আসাইংবল জরাবল নামক চারজন দেবগণ লোহার যষ্ঠী হাতে নিয়ে পারসে পাদীসাকে পাহারা দিতে এসেছে। আকাশে বাতাসে সাধু সাধুবাদে মুখরিত। আর একদিকে দেখলাম উপরে এক লাইনে বয়োবৃদ্ধ ও গুরুজন শ্রেণীরা বসেছিলেন। আর নীচের লাইনে বসেছিল যুবক শ্রেণীরা। দুই শ্রেণীদের মাঝখানে মেমাঙে-যুবতীকে পাদীসা ইং (কল্পতরু) উৎসবের গান গাইবার দায়িত্ব দেওয়া হল। পারি না বলে বারবার না করা সত্ত্বেও ইংগাইতে বলল। ‘ওয়া থ্রীং’ (বাঁশের তৈরি বাজনার যন্ত্র) বাজালে যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমন ভাঙা গলার স্বর বিশ্রী হয়ে আছে। গলা ভাল হলে এক দিন ইং গেয়ে শুনাব (এই কথা বলে যুবতী)।

গানের মধ্যে বাদ পড়ে গেলে বয়োবৃদ্ধরা সংশোধন করে দিও। ভুল হলে ঠিক করে দিও। মা ও বাবার সমান, বন্ধু ও ভাইবোনেরা সকলকে জানাই আমার প্রণাম। গানের সাথে সুর মিলিয়ে তালি তালি, হাতের তালি। দশ আঙুলে সোনার আঙ্গুটি (আংটি)। হাতের তালি ঠিক ঠিক বাজে না। তাই দুই আঙুলের আংটি খুলে দিল। বাজনার তালে নেচে নেচে যুবক যুবতীরা ইং গেয়ে পাদীসা (কল্পতরু) উৎসব ধ্বনি প্রতিধ্বনিত আনন্দে মুখরিত হলো। ইং চই চই হই।

লাংঙ্গা :

মগ সংস্কৃতিতে লাংঙ্গা একটি জনপ্রিয় লোক-সংগীত। কোন এক প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্যকে বর্ণনা করে বা জীবন কাহিনির বিবরণ দিয়ে এই লাংঙ্গা রচনা করা হয়।

সাক্সাং :

সাক্সাং মগ জনগোষ্ঠীদের একপ্রকার কাহিনিভিত্তিক লোক-সংগীত। সাক্সাং লোকগীতের মধ্যে যেমন —সইতথানু; সাংখ্রাং ককানু; সাক্সাং ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই লোকগীতের মাধ্যমে মহাপুরুষদের সুখে- দুঃখের জীবন কাহিনি সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

লুংদি :

মগ জাতিদের মধ্যে এই লুংদি একটি সমবেত সংগীত হিসাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সিদ্ধার্থের (বুদ্ধদেব) শৈশব ও যৌবনের কাহিনি নিয়েই মূলত এই লুংদি সংগীত রচিত।

নবাইংলাওসইং আকা :

সাধারণত মগ জাতিদের মধ্যে কোন লোকের মৃত্যু হলে মৃতের বাড়িতে মরদেহকে পাহারা দেবার সময় নবাইলা বা সসীজা সংগীত পরিবেশন করা হয়। গৌতম বুদ্ধের নির্বাণ সম্পর্কিত বা জীবনীকে কেন্দ্র করে কোমল সুরে ও ছন্দে এই গীত গেয়ে থাকে। ঐ সময় মৃত ব্যক্তির বাড়িতে ছাইছোয়েসে আকাও পরিবেশিত হয়।

মগ সমাজে মৃতদেহকে দলীয়ভাবে কাঁধে নিয়ে গান গেয়ে তালে তালে সইং নৃত্য পরিবেশন

করে চলতে থাকে। সুদৃশ্যমান মন্দিররূপী ‘তলা’ তৈরি করে দলগতভাবে কাঁধে নিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিমায় এই নৃত্য পরিবেশিত হয়। এই নৃত্য খুবই কঠিন, উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় যা অন্য জাতিদের মধ্যে এইরূপ দেখা যায় না। বিশেষ করে গুরুশ্রেণী বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মৃতদেহকে নিয়ে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে সইং গীতের সাথে সাথেই এই নৃত্য পরিবেশিত হয়ে থাকে।

গাচোয়ে আকা :

এটি একটি গীতিনৃত্য। মগ সমাজ সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ বাণীগুলিকে গানের সুরে প্রচার করে তালে তালে গাচোয়ে পরিবেশন করে। শিল্পীরা বিভিন্ন জ্যোতিষ শাস্ত্র ধর্মীয় শাস্ত্র থেকে ভবিষ্যৎ বাণী সংগ্রহ করে তা প্রচার করতো।

‘কাইফাং নাদাইং রাজওয়ং’ নামক গ্রন্থে এই বাণীগুলো বিস্তারিতভাবে লিখা আছে। নীচে কয়েকটি বাণী বা কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

যেমন— ১। ‘আংগি লাক মংদো লব্যো কিংজা ম্যালিমে’ - অর্থাৎ সমাজে ছোটজনেরা নেতা হয়ে সমাজ শাসন করবে।

২। ‘মংমা আতাক পউলিমে’ টেকি থেকে শাখা প্রশাখা বের হবে। অর্থাৎ ধান, চাল জাঙার বিভিন্ন ধরনের মেসিন বের হবে।

৩। ‘ইংগ্রো ইংগ্রা ওয়উস্যে ব্রিলিমে’ বাড়িঘর -এর মাঝখান দিয়ে সড়ক হবে ও গাড়ি যাতায়াত করবে।

৪। ‘ইংগ্রো ইংগ্রা পাংখোং শ্রী রংলিমে’ বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে বৈদ্যুতিক তার হুড়িয়ে থাকবে।

৫। ‘ফোয়ীখুমা হ্রোয়ী তাইংলিমে’ তুষ -এর দাম স্বর্ণ দামের তুল্য হবে।

৬। জ্রামা থাব তোয়েং লিমে —মহিলারাও প্রতিবাদী হয়ে গর্জে উঠবে। মোরগের পরিবর্তে মুরগি ডেকে উঠবে।

রেগেইং (Ragaing) :

মগ জনজাতিদের মধ্যে বৃষ্টি বা বর্ষা আগমনের জন্য নানা প্রকার গীত প্রচলিত হয়ে আসছে। আদিম যুগে মানুষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চলতে হতো। অনাবৃষ্টি ও খরায় বৃষ্টি প্রার্থনার নিমিত্ত মারমা (মগ) নৃগোষ্ঠী খোলা মাঠে নৃত্যগীত পরিবেশন করে থাকে। এই নৃত্যগীত রেগেইং (ragaing) নামে পরিচিত। মারমাদের (মগদের) বিশ্বাস তাদের নৃত্যগীতে আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরে পড়বে। নৃগোষ্ঠীর এই বিশ্বাসগুলো প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে কিছু কিছু অঞ্চলে আরাকান, মায়নমার দেশে এখনও বিভিন্ন ধরনের রেগেইং সম্পর্কিত গান নৃত্য নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তবে ত্রিপুরাতে আজকাল এসব গান, নৃত্য, খেলা অনুষ্ঠান প্রায় বিলুপ্ত।

খইসইতেজ্রাং (আধুনিক গান) :

বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আধুনিক গান ও নৃত্য প্রচলিত। তবে রচয়িতার সংখ্যা খুবই কম, তাই গানের সংখ্যা সিমিত।

আকাঃ (নৃত্য) :

মগ জনগোষ্ঠীদের দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ ক্রিয়াকর্মে নৃত্য ও গীতের ভূমিকা প্রবল। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন ও অন্তরের আনন্দময় প্রেরণার সংমিশ্রণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসাহিত। তাই তাদের নৃত্যগীত মগ বা মারমা লোক-সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান বলে বিবেচিত। সমষ্টিগতভাবে তাদের এই নৃত্যকে অভিহিত করা হয় মগ বা স্রাইমা আকা। সামাজিক প্রতিটি অনুষ্ঠানে মগ জনজাতির নৃত্যগীতের আয়োজন করে থাকে। তাদের এই নৃত্যগীতগুলো শুধু আনন্দ বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে বিবেচ্য নয়, ধর্মীয় রূপেও বিবেচ্য। তাই মগ বা মারমা নৃগোষ্ঠী জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, জুমাচাষ, ফসল কাটা, অশুভ্যস্তিক্রিয়া প্রভৃতি সকল সামাজিক ও কৃষ্টি-কর্মের নানাবিধ অনুষ্ঠানে নৃত্য-গীত আয়োজন করে থাকে।

১। পাংখোংনৃত্য :

কিশোরী পাঙখোং নর্তকীগণই হাতে রুমাল নিয়ে রুমাল নাড়িয়ে নাড়িয়ে সুর-তাল-লয়ে ছন্দোময়ভাবে নিতম্ব দুলিয়ে দুলিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে পাঙখোং নৃত্য পরিবেশন করে থাকে।

২। ছিঃমিং খোওয়াং আকাঃ (প্রদীপ নৃত্য) :

ধর্মীয় পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠানে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রদীপ জ্বালিয়ে ছন্দিত পদচারণায় মনোমুগ্ধকর দৃশ্যকল্পই এই ছিঃমিং খোওয়াং আকাঃ বা প্রদীপ নৃত্যের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। মগ ভাষায় এই নৃত্যের নাম ছিমুই খোওয়াউ আকা। ছিঃমিং অর্থ প্রদীপ, খোওয়াউ শব্দের অর্থ বাতি। আকা শব্দের অর্থ হলো নৃত্য। দু'হাতের তালুতে দুটো বাতিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে মগ নৃত্যশিল্পীরা এই প্রদীপ নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। এই নৃত্যের বিষয়বস্তু ও নৃত্যশৈলীতে মগদের আদিবাসভূমি প্রাচীন বার্মার সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত। উল্লেখ্য ব্যাপার যে, এই নৃত্য আরাকানের রাজা মাংবাগ্রী আমল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে।

৩। সাংগ্রাইং আকাঃ-

বছরের অন্তিম দিন, নববর্ষ বরণ ও নূতন দিন— এই তিনদিনকে নিয়ে মগ জনজাতি বা সাংগ্রাই উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে। এই দিনগুলোতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের সাংগ্রাই নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। যেমন— রীলং বোয়ে আকা (জল খেলা নৃত্য), থীঃ আকা (ছাতা নৃত্য), য়েঃ আকা (পাখা নৃত্য), লংবাইং আকা (খালা নৃত্য) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নৃত্য পরিবেশন করে সাংগ্রাই উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকেন।

৪। পাদীসা পোয়েং আকাঃ (কল্পতরু উৎসবের নৃত্য) :

ওয়াগ্যাইলাব্রে (আশ্বিন পূর্ণিমা), তাইং ছেং বো লাব্রে (কার্তিক পূর্ণিমা), কাঠিন্ পোয়ে (কঠিন চীবর দান উৎসব), কছো, লাব্রে (বৈশাখী পূর্ণিমা বা বুদ্ধ জয়ন্তী) ইত্যাদি বিভিন্ন পুণ্য তিথিতে পাদীসা পোয়েং (কল্পতরু উৎসব) উদ্‌যাপন করে থাকে। সুদৃশ্য প্যাগোডা বা মন্দির তৈরি করে তার চতুর্দিকে পাদীসা (কল্পতরু) তৈরি করে রাখা হয়। পারসাই ও কল্পতরুকে পাহারা দেবার জন্য চারজন ছেলেকে স্বর্গের দেবতা সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সেই দেবরূপী ছেলেরা পাদীসা নৃত্য পরিবেশন করে। পাদীসা ইং গেয়ে হাতের তালি দিয়ে যুবক যুবতীরা এই

অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতামূলক দলে দলে নৃত্য করে ও উৎসবকে মুখরিত করে তোলে। বয়স্করাও এই নৃত্যে যোগদান করে থাকে।

৫। সইং আকা :

বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ধর্মীয় গুরুর মৃত্যু হলে তাঁর শবদাহ উৎসব অনুষ্ঠানে এই সইং আকা নৃত্য পরিবেশন করে থাকে।

মৃত ব্যক্তিকে ‘প্যাগোডা’ প্রতীক শবধারে বহন করে গৃহ থেকে শ্মশান পর্যন্ত যাবার পথে, সইনৃত্য সহকারে হেঃ বুঙ, পাইত চেঃ, লাঙখোওক বাদ্যের ছন্দের তালে তালে এবং শরীর-এর সম্মুখভাগে বাহন কাঠামোর উপর নৃত্যের পোশাকে সজ্জিত ভাবে দাঁড়িয়ে, এক সইংছারা (সইংনৃত্যে গুরু), মংয়ো - মংয়ো লেঃ লেঃ লেঃ— অর্থাৎ ভাইসব ভাইসব এসো এসো। মগ ভাষায় গানের সুরে ও তালে তালে কবিগানের মত তাৎক্ষণিক স্বরচিত সইং নৃত্যের গান গেয়ে, নৃত্য প্রদর্শন করে। গুরু বা ওস্তাদের গানের সুরে পালাক্রমে অনুসরণকারী বাহক, গায়কদল নিজ নিজ কাঠিতে সজোরে শবধার বাহন-কাঠামোর বাঁশের খোপে আঘাত দিয়ে সমান তালে নৃত্য করে। বাদ্যযন্ত্রের তাল এবং নৃত্যের তাল ও ছন্দকে রক্ষা করে দলীয় সই নর্তক শবধার চলমান অবস্থায় দর্শকদেরকে নৃত্য প্রদর্শন করে থাকে। শ্মশানে শবধারে অগ্নি সংযোগ-এর আগে ‘দ্বা’ নামক শবধার বহন করে বাজনার তালে তালে জিমনাস্টিক নানান ডিসপ্লেকে নৃত্যের ও বাজনার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে সই নৃত্য মুহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আনন্দের আবহ সৃষ্টি হয়। এই আনন্দ এই জনমে দুঃখভোগ থেকে মুক্তির প্রতীক। এই মুক্তির প্রতীক সইনৃত্যের মাধ্যমেই প্রকাশ করে, তাই মগ সমাজে এই নৃত্য অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ নৃত্য। প্রকাশ থাকে যে, মগ সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বৌদ্ধ ভিক্ষু পরলোক গমন করলে সই নৃত্য ও গীত অবশ্যস্বারী। তবে আজকাল আর্থিক দীনতা ও মাতৃভাষার বর্ণশিক্ষার অভাবের কারণে, সইং নৃত্য-গীতি প্রশিক্ষণ প্রচলন বা পরিবেশন ও লালনের ঐতিহ্য ক্রমশ বিলীন হতে চলেছে।

৬। পুরী নেসমী আকা :

মগ জনজাতিদের বিখ্যাত রূপকথার “মনরী নেসমী” নামক গল্পের সাতবোন পরীর নৃত্য খুব জনপ্রিয়। স্বর্গ থেকে অবতরণ করে তারা হিমালয়ের পাদদেশে স্বচ্ছ সরোবরে এসে স্নান ও নৃত্য সমারোহে জলকীড়া করে। এক শিকারী বা ব্যাধ তাদের অপরূপ রূপদর্শন লাভ করে অভিভূত মোহিত হয়ে যায় এবং ধরবার জন্য চেষ্টা করে। এই পরীনেসমী (পরীর নৃত্য) এখনও কোথাও কোথাও মগ সমাজে প্রচলিত হয়ে আছে।

এছাড়াও গ্যঃসে আকাঃ (মাছ ধরার নৃত্য), বুলু আকা (মুখোশ নৃত্য), চেপ্ৰাঃ স্যেং আকা বা দাবাস্যেং আকা (দূত নৃত্য), কাংথাঃ মোছোঃ আকাঃ (ব্যাধের নৃত্য), পাঙখোংমাং আকাঃ (মাকড়সা রাজার নৃত্য), আবংমা আকাঃ (ধনদেবী আবংমা নৃত্য) ইত্যাদি মগ সমাজে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এসব ঐতিহাসিক নৃত্য সবজায়গায় পরিলক্ষিত হয় না বললে চলে।

মগ জাতিদের এই সব নৃত্যগীতসমূহে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ধরনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাঙখোং গীতি নাট্যের পাণ্ডুলিপি পূর্বে পার্বত্য বনভূমিতে প্রাপ্ত ভূজপত্র লিপিবদ্ধ

করা হতো। কিন্তু বর্তমানে পাণ্ডুলিপি কাগজেই লিপিবদ্ধ আছে। এই মগ বা শাইমা বর্ণমালা দিয়েই লিপিবদ্ধ। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, পাণ্ডাখোং গীতিনাট্যের সংলাপ একই সুরের ধীর লয়ের মগ আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় প্রণীত। কিন্তু জাইত গীতিনাট্যের সংলাপ বর্মী লেখ্য ভাষায় প্রণীত। উল্লেখ্য যে, মগ বা মারমা কথ্য ভাষা বর্মী লেখ্য ভাষারই অপভ্রংশ বা উপভাষা বিশেষ।

বাদ্যযন্ত্র :

নৃত্যগীতের সঙ্গে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলোর মধ্যে মগ সংস্কৃতির ঐতিহ্য অঙ্গীকৃত। মগদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে পাহাড়ী বর্নার কলকল শব্দ মুখরিত অরণ্যের প্রাণ মাতানো প্রাকৃতিক ছন্দ ও তালকেই প্রধানত ফুটিয়ে তোলা হয়। (জাফর আহমদ হানীফ, উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি, প্রাপ্ত, পৃষ্ঠা ৭৭)। এছাড়াও মেঘের গর্জন, জলের শব্দ, জোয়ার ভাঁটার শব্দ, বাতাসে পাতা নড়ার শব্দ থেকেও তারা ছন্দ-সুর-তাল গ্রহণ করেছে।

তারা যে- বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে তার অধিকাংশই তাদের স্বকীয় শিল্পভাবনাজাত। বনের বাঁশ, পাতা, বেত, কাঠ, পশুর চামড়া এ-সকল বাদ্যযন্ত্রের উপাদান, উপকরণ —

মগ জনগোষ্ঠীদের কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের নাম উল্লেখ করছি।

১/ বুঙ - পাইং, ২/ পাইত্মা, ৩/ পাইমাগ্রী, ৪/ পাইত ছই, ৫/ পাইতলা, ৬/ ক্রীঃ হাঙঃ, ৭/ ক্রীছই, ৮/ লাঙু খোওক, ৯/ চীঙ চোউ, ১০/ চেঃ, ১১/ দুঙঃখলঙ, ১২/ মঙঃ, ১৩/ হেঃ, ১৪/ দুংমাঙ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও খ্রঃখ্রঃ মহিলাদের প্রিয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

যেমন — প্রথমতঃ বুঙ, পাইত, পাইমাগ্রীঃ পাইত্মা বা পাইতছই এই বাদ্যযন্ত্রগুলো গাছের খোলে চামড়া মোড়ানো বাদ্য। এই বাদ্যযন্ত্রের মধ্যস্থলে কালো রঙের হাতের তৈরি বিশেষ আঠাযুক্ত রাবের পুরু প্রলেপ করা।

পাইতছই :

বাদ্যযন্ত্রের আকৃতিগত অনুসারে রুঙ পাইত বাদকের ক্ষুদ্রতম পাইতটির আকৃতির তুলনায় এই পাইতছই-এর পাইতগুলি আনুক্রমিকভাবে ১৬টি পাইত সাজানো থাকে কাষ্ঠনির্মিত বাদ্য-বাদনের গোলাকার অভ্যন্তরে। বাদক গোলাকার ভেতর বসে পাইতছইগুলি বাজায়।

হেঃ

মইং জিরী কাঠের তৈরি প্রায় দুই ফুট লম্বা এই বাঁশের এক পাশে ৭টি ছিদ্র এবং বিপরীত পাশে মাত্র ১টি ছিদ্র আছে। কাঠের এই বাঁশির নলীর আকার সর্ব থেকে মোটাকৃতি। এর মোহনায় বাঁধা আছে পিতলের চুঙ্গী। দড়ি দিয়ে বাঁধা লহড়ীর রানী হলো “হেঃ” আর রাজা হলো পাইতছই।

খ্রীঃখ্রঃ :

বাঁশ বা লোহার তৈরি এক প্রকার ছোট সংগীত যন্ত্র। এই যন্ত্র বিশেষ করে মগ মহিলারা ব্যবহার করে। পুরানো দিনে মহিলারা খ্রীঃখ্রঃ বাজিয়ে ছেলেদের বাঁশীর সুরের উত্তর দিয়ে থাকে। লোক কাহিনিতে এই সব তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

পাইতলা :

এই বাদ্যযন্ত্রটি অনেকগুলি চেপ্টা লোহার পাত অথবা বাঁশের ফালি-টুকরোবিশিষ্ট দৈর্ঘ্য

ছোট থেকে ক্রমান্বয়ে বড় আকার বিশিষ্ট, সারিবদ্ধভাবে শক্ত দুটি দড়ি দিয়ে পাতের বা ফালির দুই প্রান্তে ফুটোর ভেতর দিয়ে গেঁথে এনে ছোট আকারের ডোঙ্গা নৌকার মত কাঠের খোলের সামান্য ওপরে তা বুলিয়ে রেখে, দুটি গোলাকৃতি কাঠি দিয়ে এই পাইতলাঃ বাজানো হয়। এই বাদ্যযন্ত্রের শব্দ অনেকটা জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রের শব্দের মতো

ক্রীহ্নাঃঃ ক্রী ছাইঃ

এই দুটি বাদ্যযন্ত্র সাধারণত পাইতলার সমজাতীয় বাদ্যযন্ত্র। তবে এর আকার মাঝখানে কুঁজ বিশিষ্ট গোলাকার কাঁসা বা পিতল দিয়ে তৈরি করা হয়।

মগ সংগীত ও নৃত্যের তালকে ধরে রাখার জন্য যে বাদ্যযন্ত্রগুলি আছে, তার মধ্যে ‘চিংচোও অক’ (পিতলের তৈরি ছোট জুড়ি), কাঁসার তৈরি বাঁঝর, লম্বা বাঁশের ফালি দিয়ে তৈরি করা লাঃখোও অক, মোটা বাঁশের ফালি দিয়ে করা ‘দুঙঃখলঙ’ পাতার বাঁশি, বাঁশের তৈরি বাঁশি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্র ত্রিপুরাতে সহজলভ্য নয়।

প্রাচীনকালে এই সব বাদ্যযন্ত্র মগ বা মারমা নৃগোষ্ঠীরা নিজেরা নির্মাণ করে শিল্প দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শুধু বাদ্যযন্ত্র নয়, নৃগোষ্ঠীর নিত্য ব্যবহার্য গৃহস্থালী উপকরণের নির্মাণ শৈলীর মধ্যেও তাদের শিল্পসৌকর্যের পরিচয় বিদ্যমান। শিল্প কর্মের মধ্যে হাতির দাঁত ও হাড়ের তৈরি পাখা, চিরুনি, মূর্তি ও বিভিন্ন ধরনের অলংকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদের ব্যবহার্য ধাতব অলংকার, তাবিজ, চুরট, পাইপ, বুদ্ধমূর্তি, কাঠের ঘন্টা প্রভৃতি নির্মাণ শৈলীতে নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যের ছাপ পুরো বজায় রয়েছে। গাছ খোদাই করে নৌকা, মূর্তি, বাদ্যযন্ত্র তৈরির অভিজ্ঞতাও তাদের আছে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের শিল্পীসুলভ কারিগরী নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

“প্রবাদ প্রবচন ও ধাঁধা” :-

(চা গাথা পাইং হ্রোও অক)

লোক-সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে প্রায় সকল দেশে সকল কালে প্রবাদ বাক্যের প্রচলন আছে। কিন্তু কবে, কীভাবে প্রবাদের উদ্ভব ঘটেছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। এই প্রবাদ প্রবচন মানুষের স্মৃতিতে প্রবাহিত হয়ে আসছে যুগ যুগান্তর ধরে। মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি আপন সুর-বেগে ও সহজ ভাষায় নিঃসৃত হয়েছিল। ব্যক্তিগত কিছু নেই বলেই প্রবাদের জাতিগত এবং অনেক সময় জাতির সমষ্টিগত জ্ঞানের অভিযুক্তি। প্রবাদ সম্পর্কে তাই বলা হয়ঃ

“The wit of one man and the wisdom of many”

প্রবাদ মুখ্যত বাস্তবঘেরা, মানুষের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ও সরসবুদ্ধির স্বচ্ছন্দ প্রকাশঃ

“a short sentence drawn from long experience.”

ত্রিপুরার পাহাড়ে, জঙ্গলে, গ্রামে, অশিক্ষিত সাধারণ খেঁটে-খাওয়া মানুষের মুখে মুখে যে-মৌখিক কথাসাহিত্য গড়ে ওঠে, তার অন্যতম বিষয়বস্তু হল এই প্রবাদ প্রবচন।

অন্যান্য ভাষায় প্রবাদ প্রবচনের মত মগ ভাষার প্রবাদেও সেইসব বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। এই সব প্রবাদ বাক্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হল—সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিক সাংসারিক

ধরলে নামিয়ে কাঁটা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরা করে একটা পাত্রে নেওয়া হবে। তারপর কাঁচা মরিচ পুরে আদা দিয়ে বেটে নেবে। টুকরো টুকরো করা সেকা মাছ, মরিচ বাঁটা, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, ধন্যপাতা, সামান্য লেবুর রস দিয়ে মেখে মাছের ভর্তা তৈরি করা হয়। এই ভর্তা খেতে খুব সুস্বাদু। একই পদ্ধতিতে সেকা মাংসকেও ভর্তা করে খেতে মগরা খুব ভালবাসে। ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের বেশি মাছ পাওয়া গেলে মাছগুলিকে কুটে ভালকরে ধুয়ে নিয়ে বড় বড় চালুনের মধ্যে বিছিয়ে চুলার আগুনের উপর ঝুলিয়ে সেকঁকে নেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে সেকা মাছ দীর্ঘ দিন ধরে খাওয়া চলে। এর নাম গুগ্গিউ। অধিক পরিমাণে শূকর, হরিণের মাংস পেলে বড় বড় টুকরো করে কাঠির মধ্যে গাঁথে সেকঁকে চুলার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। অথবা মাংস ঠিকভাবে শুকিয়ে গেলে কোন পাত্রে ঢুকিয়ে দীর্ঘদিন রাখা যায়। যখন খুশি মাংসগুলিকে পরিমাণ মতো নিয়ে কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর ভেজানো মাংসগুলিকে ছোট ছোট টুকরো করে - লবণ, হলুদ, মরিচ, আদা, পেঁয়াজ দিয়ে পুনরায় রান্না করেও খাওয়া যায়। এই পদ্ধতি আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গেলেও মাংসাদির বেলায় 'সিক' গাঁথে রেখে খাওয়ার পদ্ধতি চোখে পড়ে। মগদের আর ১টি প্রিয় খাবার হলো 'গুগ্গি' - গু-অর্থ মাছ, গুগ্গি-অর্থ-পিষিয়ে গুড়া করা, সজ্জি, তরকারিতে দিয়ে রান্না করা যায়। বাঁশ কুড়ুল, মুলা, বিচি ছাড়িয়ে সিম, বাঁধাকপি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শাকসবজিও ছোট ছোট টুকরো করে কেটে শুকিয়ে রাখার রেওয়াজ এখনও মগ সমাজে প্রচলিত আছে।

আল্‌হঃ (ভাজা) :

বহুকাল আগে থেকেই মগ জাতির প্রকৃতিপ্রদত্ত তেল দিয়ে বিভিন্ন রকম মাছ, মাংস, তরিতরকারি ভাজা করে খেতে শিখেছে। যেমন শূকরের তেল ভাজা করলে গরম ভালভার মত তরল হয় তখন সেই তেলকে কোন পাত্রে জমিয়ে রাখা হয়। মাছ, মাংস, সবজি যেকোন সময়ে ভাজা করে খাওয়া হয়। মরিচ, হলুদ, লবণ দিয়ে রান্না করে খাওয়া যায়। চালের গুঁড়া পিঠা, শূকরের তেলে ভাজা করে খেতে সুস্বাদু। এছাড়া মাছের তেল কাঁকড়ার তেল দিয়েও আল্‌হঃ (ভাজা) করে খাওয়া যায়।

ফলের বিচি দিয়ে তরকারি :

মগ জাতির বিভিন্ন রকম ফলের বিচি বেটে তরকারিতে দিয়ে রান্না করে খেতে ভালবাসে। যেমন পাকা বহেরাকে কেটে বিচি বের করে নিয়ে শিলনুড়াতে বেটে নেওয়া হতো। টাটকা মাছ, ভাজা করে নিয়ে শুকনো মাছ বা ডিম ইত্যাদি যেকোন তরকারি, লবণ, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ দিয়ে বাটা বহেরা বিচি জল দিয়ে ঘুলিয়ে একটা পাত্রে কিংবা করাইতে নিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়। তরকারি সিদ্ধ হয়ে জল শুকিয়ে আসলে ধন্যপাতা দিয়ে নামিয়ে রাখা হয়। অন্য পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ ছেড়ে দিয়ে রান্না করা তরকারিতে ঢেলে দেওয়া হয়।

ঐ একই রকম পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণগাছী (বেড়ন গাছের পাকা ফলের বিচি) ফোরোংচী, (মিষ্টি কুমড়োর বিচি), স্যাসাচী (পাকা শশার বিচি) নোয়ী ছোট্টী (লতায় ধরে এক জাতীয় ফলের বীজ) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ফলের বীজ বেটে নিয়ে তরকারির সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করে খাওয়া যায়।

বাংলা : সৎলোকের সহবাসে

সততা প্রাপ্তি হয়।

৯/ চাঃ লিচাঃ মকুঙ জিগ্যে

ওয়েলিঃ ওয়ে মঙোহ্জিগ্যে।

বাংলা : খাবে তবে শেষ হতে দিও না।

পরবে তবে ছিঁড়তে দিত না।

অথবা মিতব্যয়ী।

১০/ তবংলা ক্যায়ী দইং গো নোঙ্ মরা

বাংলা : ভুলিয়ে বশ করা যায় না।

১১/ লুঃ গো মাকং মক্রাইংগং

মাকং কোঃ দোওয়াং ব্রিলোউ ওয়ং।

বাংলা : পরের ক্ষতি করতে গেলে

নিজের ক্ষতি হয়।

১২/ সাংসরা থাউ ওয়েং জা ক্রীয়ে

বাংলা : খালি পেটে সাধন ভজন হয় না।

১৩/ কুছোঙ্ তাজি নাইংয়োঙ্ ছুচিঃ

বাংলা : সময় থাকতে বীজ বপন করা ভাল।

১৪/ ক্রং সদাং সুং লাংদাস্যোগো কক্যা ফ্রোং।

বাংলা : বিড়াল তপস্বী।

১৫/ গুদাইতে সাং নোঃ চোউরারে।

বাংলা : যে শিশু কাঁদতে জানে

সেই দুধ খেতে পায়।

১৬/ আথাউপঃরে প্রাংব খ্যলঃ

আথী মা ক্যা - ম্যো।

অনুবাদ :

দুষ্টলোকের মিষ্টি কথা।

১৭/ উঃমালে ক্রীঃ খোওয়ন্ মালে থীঃ

অনুবাদ :

আয় বুঝে ব্যয় কর।

১৮/ থাইং সী ক্রোয়ীছঃ কী নহ্ গ্রঃ

অনুবাদ :

মেঘ না চাইতে জল।

১৯/ চাবাফ্যাং রোওয়ংরে

লুঙ আমা প্রেঃ পাইতে।

বাংলা : মরাধান বাতাসে ওড়ে

বুদ্ধিমানেরা দেশ ঘোরে।

২০/ জাফ্যাঙ্ হাদ্লা, লাউগু, থোদ্লা

বাংলা : সহজে প্রাপ্তি লাভ।

২১/ ছোং সাইংলউ সাইংলি

ক্যোঙ্ মিং অউকা নিংরারে।

বাংলা : ধনীর চেয়ে গুণী বড়।

২২/ অখঃ কঙ্গে আথুউ কংরে।

বাংলা : ডাকতে জানলে ফল পাবে।

২৩/ ইলং ছোগো মচারা

আনউফাক্ গাবুক কো হারে।

অনুবাদ :

আদার ব্যাপারী আবার জাহাজের খবর রাখে।

২৪/ তগং খোই, খোই মহোউ

তয়উ লুঃ লুঃ মহোউ।

অনুবাদ :

একতাই বল।

২৫/ লাওয়া তাথুউলা লাখোউ মামীঃ।

বাংলা : এক হাতে তালি বাজে না।

২৬/ উঃখাউ পাবাঙ্ চা মালুক।

বাংলা : ভরা কলসি নড়ে না।

২৭/ উয়ং চংগে মিয়াগং রারে।

বাংলা : সবুরে মেওয়া ফলে।

২৮/ চুউলা চুউ থোঃ রেঃ

বাংলা : কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

২৯/ তুং গৌউকো প্রচলা সুংগো প্রচলা আতোউদু।

বাংলা : গাছের গুড়িকে বলা আর তাকে বলা একই।

৩০/ পঃগে যঃ রে, যংকো প্রীঃ ক্যারে।

বাংলা : অবহেলায় বিফলতা আসে।

পাইং হোয়ক (ধাঁধা) :-

১) গং খাং আলে খোওয়উ গাখো, দাব্রোসী।

বাংলা : অর্ধাকাশে পাঁচটি বাতি। উত্তর : চালতা ফল।

২) মাংগ্রী গং বং পঙ্ মাকোং। লাইং।

বাংলা : রাজার পাগড়ি মাথায় প্যাঁচিয়ে শেষ হয় না। উত্তর : রাস্তা।

৩) মাংগ্রী পছু রী মাদোয়ে। প্রীঙফাউ।

বাংলা : রাজার চাদর জলে ভিজে না। উত্তর : কচুপাতা।

৪) তইং লেদইং তোওয়ং মতোউ,

আগ্রী ফাউতু তাফোউ ফোউ। পাখাউ।

বাংলা : চারটি পালা মাটি থেকে আলাদা,

সম্মুখে দোদুল দুলা। উত্তর- দোলনা।

৫) মাফোয়ে প্রে ফোরে নাই পাছোঃ

মাফ্রি রে প্রি রে নাই রীউঃ। উংসী, উংসীরী।

বাংলা : ধোয়া নাই দেবতার চাদর

ধব ধবে সাদা;

ভরে নাই দেবতার ঘট, তবু ঘটে জল ভরা। উত্তর : নারিকেল ও তার জল।

৬) রউমা ইংলা ঙা ইংলা থীঃ খ্যাং বক্। প্রইদোং।

বাংলা : বৌদির ঘর আর আমার ঘর, একই মুখোমুখি। উত্তর : বাঁশের চোঙ।

৭) আথাকপরে প্রাংব খ্যল, আথীঃমা ক্যক্চরঃ। গইংয়ইংসীঃ।

বাংলা : উপরের প্রলেপ সুন্দর, ভিতরে নুড়ি-পাথর। উত্তর : পেয়ারা।

৮) ত্রেংঃ লারে, নোয়া মলাঃ। ফ্রেং বাং ফ্রেং সীঃ।

বাংলা : দড়ি চলতে থাকে। কিন্তু গরু চলে না। উত্তর : কুমড়োর গাছ ও কুমড়ো।

৯) রী মাহিরে থ্লীঃ লারে। পাখাউ।

বাংলা : জল নেই— নৌকা চলে। উত্তর : দোলনা।

১০) জাইম্বো সব্রী পপংক্রোয়ী

প্রিলোং প্রেসা কউ মরা। মো রোওয়ারে।

বাংলা : জাইম্বো জাম আঝোরে ঝড়ে,

দেশবাসী কুড়িয়ে পাই না। উত্তর : বৃষ্টি।

১১) আলাক্লা কইংছইংরে

ম্যাচি গা মম্ভাং রা। আগং

বাংলা : হাত দিয়ে ধরা যায়, চোখে দেখা যায় না। উত্তর : নিজের মাথা।

১২) ইংঅথীঃমা ইং। থ্রাংথং

বাংলা : ঘরের ভিতরে ঘর। উত্তর : মশারি।

১৩) পাইং ওয়ইং মা পাইং ছোয়েলু পাইং মাকোং। ক্রীঃ

বাংলা : একটি বাগানে ফুল তুলে শেষ হয় না। উত্তর : নক্ষত্র খচিত আকাশ।

১৪) মাংগ্রী ছীপোঃ মাকইং হুইং। সীং

বাংলা : রাজা লাঠি ধরা যায় না। উত্তর : সাপ।

১৫) মোরীংখাঃ ওয়েলা, ক্রীঃ খাঃ ক্যাক্যলাক। ওয়াদো, ওয়া

বাংলা : কাপড় পরে শিশুকালে, বড় হয়ে লেংটা হলে। উত্তর : বাঁশ কুড়ুল, বাঁশ।

কলসিনিবাসি—

—আরী অংক্রইএগ্যা, থেকে সংগ্রহ করা একটি ছড়া তুলে ধরছি—

ঘুমপাড়ানী ছড়া :

আসুয়ামা কী চারে (বাংলা যামা)

বাংলা যামা কিংচারে।

চারা চাজি মাহঃ জিগ্যে -

হঃগ্যে বাসা হঃ ওয়ে আয়ুসাঃ

সাঃতায়উকো যোঃ যোঃ ঙাং ঙাং,

পাখাউ তাং।

ইং লি যাং যাং যাং যাং উয়ি

খাবারা লাক্ চোয়ে মংগোওয়ে মাং।

আরাক খাইংরে খোংদইংমা।

জুলা জুলা অঃ রউমা

দীখক্ দীখক্ তাঙগউমা।

আচোওয়া প্যাং রোং রউমা মং।।

বাংলা অনুবাদ :

কারজুমে তোতা পাখি ধান খায়।

বাংলার জুমে তোতা পাখি ধান খায়।

খেতে থাক খেয়ে যাক, তাড়াবে না মারবে না।

তাড়ালে বিপদ হবে, ধান না পেলো কী খাবে।

একমাত্র শিশুকে টেনে নিয়ে,

দোলনায় চড়িয়ে,

ইং লি যাং যাং যাং যাং উয়ী।

ঘুমাও বাছা গান গেয়ে।

খ্যাবরা আঁটি পরা

মোগলের বাদশা,

কখন কাকে নিয়ে যায়, কারোর নেই জানা।

ভাতের মোচা বাইরে পালাতে বাধা আছে।

এত দৌড়াদৌড়ি কীসের বৌদি

কী করছ সাবধানে থেকো।

হাত পাতা খেলার ছড়া' :

১) তব্রা হুঃ প্রাঃ প্রাণা,
প্রাঃ গ্রাঃ খয়ইং দোঙ্ ডাং,
ডুঙ্গা পদং কোয়ে কোয়ে
গ্টিং গ্টিং প্রং ব্রং
ঙাহীঃ দঙ্
হোয়ী দং মোয়ী দং
দুউক্যে দাউক্যে ইঃ আঃ ।।

অনুবাদ :

একটি পাতা, দুইটি পাতা,
পর পর হাত পাতা ।
পাতা হাত ধুম ধাম,
পদং ভেঙে খান্ খান্ । (পদং- জিনিস রাখার পাত্র)
চিক্ চাক্ উজ্জ্বল ।
পঞ্চশটি পাহাড় তল ।
সোনার টিলা, রূপার টিলা,
দুউক্যে দাউক্যে পথ চলা ।
ইঃ আঃ ।

২) অঙ্গুলি খেলার ছড়া :

তংদইং হুতইং মিয়াং দইং
তইং রে মিয়াং সারাকাং
কাঙ হোয়েং রীচাং
তদইং নোউ ।।

অনুবাদ :

একটি খুঁটি, দুইটি খুঁটি
দাঁড়িয়ে আছে আঙুলটি ।
বিষকচু চুলকায়,
রাঁধলে খেতে মজা পায় ।
জল ছিটালো শুদ্ধ হলো,
একটি খুঁটি তুলে ধরো ।।

৩) মে সানাউ থেকে সংগ্রহিত ছড়া —

আমিং আফ্রীঃ

অঃ সপাং সপাং নাং জালং লীঃ রোং ?

বাইঙ্ তাকলো লীংরে।
 বাইঙ্ জালং তাকতোং।
 ঙাঃ পংলোউ তাক্তে।
 ঙাঃ জালং পং রোং?
 রীঃ নউলো পংরে।
 রীঃ জালং নউতুং?
 কোয়ী, চীংলো নউতে।
 কোয়ী জালং চীং রো?
 ফ্রোক কইলো চীং রে।
 ফ্রোক জালং, কইতোং?
 মোং উংলো কইতে।
 মোং জালং উংরোং?
 ফাঃ সিরোউ উংরে।
 ফাঃ জালংসিং রোং?
 সিং কলো সিং রেং।
 সিং জালং কইতো?
 অওয়েং পোছি পোছা তুই রো। (কইতে)।

অনুবাদ :

গাছের ডালা কেন হেলান দিল? বক বসেছে তাই হেলান দিল।
 বক কেন বসেছে? মাছ দেখে বসেছে।
 মাছ কেন ভেসে উঠেছে? জল ঘোলা হয়েছে তাই উঠেছে।
 জল কেন ঘোলা হয়েছে? মহিষ স্নান করেছে।
 মহিষ কেন স্নান করেছে? মশা কামড়াচ্ছে তাই স্নান করেছে।
 মশা কেন কামড়াচ্ছে? আকাশে মেঘ করেছে।
 আকাশে কেন মেঘ করেছে? ব্যাঙ জোরে ডেকেছে।
 ব্যাঙ কেন ডেকেছে? সাপ কামড় দিয়েছে।
 সাপ কেন কামড় দিয়েছে?
 পেটের জ্বালায় কামড় দিয়েছে।।

মগ আদিবাসীদের খেলাধুলা

প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে যুগসন্ধিকাল এসে দেখা যায়—কোন কোন গোষ্ঠীরা কালজয়ে
 দা সচেপ্ত হয়ে উত্তরোত্তর তাদের পৌরাণিক খেলাধুলার পরিবর্তে অগ্রজজাতিরীতি অনুযায়ী
 খেলাধুলাই পরিলক্ষিত হয়। পশ্চাৎপদ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই হোক, বা তার গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যই

হোক, যে গোষ্ঠী পৌরাণিক আচার-অনুষ্ঠান যথাযথ ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, সেইসব গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ পৌরাণিক খেলাধুলার রীতিনীতি সংরক্ষিত রয়ে যায়। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মগজাতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় না। বিশেষত কোন খেলাধূল্যকেই নিজস্ব এবং গোষ্ঠীগত স্বত্ব বলে দাবি রাখতে পারে না, কেননা নিয়ম মার্কিন খেলাধূলা সমগ্র তিব্বতি-বর্মী ভাষাভাষীর মধ্যেও প্রায়শই সাদৃশ্য লক্ষ্যগোচর হয়। ভাষা লেনদেনের সঙ্গে সঙ্গে আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতি তার পাশাপাশি খেলার রীতিনীতি আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

মগ জাতিদের ব্যবহারিক জীবনে মধ্যানুবর্তী কালে খেলাধুলার নিয়ম নীতি কালের গতিতে সামঞ্জস্যসাধন না হলেও বর্তমান কালেও তার অস্তিত্ব রয়ে গেছে। মগ গোষ্ঠীদের মধ্যে বেঁচে থাকা এই রকমারী খেলার আসর ভিন্ন ভিন্ন রীতিনীতিতে সন্নিবিষ্ট, যা শতাব্দী ধরে উক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্গত চর্চা হয়ে এসেছে। তাদের সাধারণত খেলাধুলার মধ্যে :

দঃ কজা (শিল খেলা), খোএগ্যাং (গিলা খেলা), কাংছী (দাঁড়িয়াবান্ধা খেলা), গোদু (হা ডুডু খেলা), আমহাংথোউ (ভাতের মোচা খেলা), গ্যাংবউ (লাটিম খেলা), ব্রীদাইং (দৌড় প্রতিযোগিতা), খোংদাইং (লক্ষন খেলা), হোউদাইং (লুকোচুরি খেলা), গোংজুই (কানামাছি খেলা), পাইংসো কজা, এইংখেঃ (কাইমের খেলা), ক্রাখীথোঃ (মোরগের পা খেলা), ক্রোয়ী (কড়ি খেলা), সুউকেচা (কুস্তি খেলা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত যুবক ছেলেরা কজা, গোদু (হা ডু ডু বা কাবাডি) আমহাং থোউ (ভাতের খেলা), গ্যাংবউ (লাটিম খেলা), ব্রীদাইং (দৌড় খেলা), খোংদাইং (লক্ষন খেলা), কুস্তি খেলা ইত্যাদি করে থাকে।

মেয়েরা :- কাংছীঃ (দাঁড়িয়াবান্ধা), গোদু (হা ডু ডু বা কাবাডি), গোংজুই (কানামাছি), এইংখেঃ (কাইমের টুকরো নিয়ে খেলা), পাইং (বেতের টুকরো নিয়ে বাঘ-মাছি খেলা), ক্রোয়ী (কড়ি খেলা) ইত্যাদি খেলে থাকেন।

শিশুরা : ক্রোয়ী (কড়ি), এইংখেঃ ক্রাখীথোঃ (মোরগের পা খেলা)। তব্রা হু প্রা (হাত পাতা খেলা), ব্রীদাইং (দৌড় খেলা), খোংদাইং (লক্ষন খেলা), হোউদাইং (লুকোচুরি), খোএগ্যা (গিলা খেলা), কাংছীঃ (দাঁড়িয়া বান্ধা) ইত্যাদি খেলা করে অবসর বিনোদন ও আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

সাংগ্রাহি বা চৈত্র সংক্রান্তি এসে গেলে—দঃ কজা খোএগ্যা, কাংছী ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী খেলার প্রতিযোগিতা মাস ব্যাপী জাঁকজমকপূর্ণভাবে চলতে থাকে।

প্রাচীন কাল থেকেই অবসর বিনোদনের জন্য এইসব খেলাধুলার আসর জমে থাকে এবং মন মাতানো জ্যোৎস্না রাত্রে যুবক যুবতীরা ও শিশুরা এই সব খেলাধূলায় উৎসাহী হয়ে উঠত। মগ জনগোষ্ঠীদের প্রাক জীবন যাপন জড়িত আচার, আচরণ কৃষি উপজীব্য রীতিনীতি উত্তরোত্তর পরিহারের সঙ্গে সঙ্গেই, তাদের আদিকালের খেলাধুলার চর্চার অভাবে কোন কোন খেলা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে নব্য মগ সমাজে, দিন দিন সার্বিক প্রচলিত খেলাকেই আত্মস্থ করতে পরিলক্ষিত হয়। যেমন বল খেলা, ভলিবল, কাবাডি, খো-খো ইত্যাদি খেলাগুলোকে আত্মস্থ

করে নেয়।

আবার শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরিচর্যায় নিত্য নূতন অসংখ্য খেলার চর্চা করতে হয় বলে আদিকালের বিশেষ খেলাধুলাগুলি দিন দিন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হয়ে যায়। বর্তমানে মগ জনগোষ্ঠীদের শিক্ষিত মহলে অগ্রজ জাতি থেকে রপ্ত করা ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, তাসখেলা ইত্যাদি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

লোকগল্প :

‘কীফোরা প্রেঃ’ (সাদা টিয়া পাখির দেশ)

এক গরীব দুঃখী সংসারে তার আপন বলতে তার স্ত্রী ও এক ছেলে আছে। ছেলেটির বয়স ১০ বছর। অতি দুঃখে তাদের জীবন অতিক্রান্ত হয়। যেদিন পরের বাড়িতে কাজ নিলে সেদিনটা কোন রকমে আহার জোটে। কাজ না পেলে সেদিনটা অনাহারে কাটাতে হয়। লোকটি খুব সহজ ও সরল। কারো জিনিস চুরি করে না, মিথ্যা কথাও বলে না। দূরে এক জমিদারের বাড়িতে একদিন কাজ করতে আসে। জমিদার তার সততা ও সরলতা দেখে খুশি হয়ে এক কাঠা ধান দিয়েছিল। গরীব লোকটি খুশি হয়ে জমিদার থেকে পাওয়া ধানের অর্ধেক অংশ বীজ বোনার জন্য রেখে দিল। বাকিটা ধান ভেঙে খেয়ে ফেলল। বেশ সুদূরে এক সুন্দর বাঁশ বাড়ে গাছপালায় পূর্ণ জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গল কেটে তারা জুম চাষ করল। জুমে ভাল ফসল হয়েছিল। জীবনে এই প্রথম নিজের জুমের ধান ঘরে উঠবে একথা ভেবে দুঃখী চাষির মন আনন্দে বুক ভরে যেত। যথা সময়ে ধান পাকতে শুরু হলো। জুমের একটা অংশ থেকে ধান কেটে নিয়ে কিছু ধান বাড়িতে নিয়ে গেল। সেই গরীব চাষী ও তার স্ত্রী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জুমেই কাজ করে। রাত্রিতে বাড়িতে ফিরে যায়। সারাদিন তার ছোট ছেলেটি ঘর পাহারা দিত। একদিন জুমের নূতন ফসল ধান উঠানে মেলে শুকাতে দিয়ে গেল। ছেলেকে ধান পাহারা দেবার জন্য বাড়িতে রেখে গেছে। মা ও বাবা ছেলেকে খুব সাবধান করে দিয়ে বলে গেল যে, একটি পাখিও যাতে একটা ধানও খেতে না পারে সেই ভাবে পাহারা দিতে হবে। না হলে তোর রক্ষা নেই। ছেলেটি সারা দিন মেলানো ধানের পাশে বসে খরা রোদের মধ্যে পাহারা দিচ্ছিল। বিকাল বেলা এক বাঁক তোতা পাখি আকাশ থেকে এসে তার ধানের উপর ঝাঁপে পড়ল। ছেলেটি চিৎকার করে পাখিদেরকে বলল, তোমরা এই ধানগুলোকে খাবে না। মা বাবা বারণ করে গেছে। তোমরা যদি ধান খেয়ে ফেল তাহলে আমাকে আর মা বাবা ঘরে রাখবে না। তাই তোমাদের হাত জোড় করে মিনতি করছি, এই ধান খাবে না। তত ক্ষণে টিয়া পাখির দল ধানগুলি খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। ছেলেটি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, এখন আমি কী করব? কোথায় যাব? মা বাবা আমাকে আর থাকতে দেবে না! ছেলেটির করুণ অবস্থা দেখে টিয়া পাখির দলনেতা তাকে ডেকে বলল—ধান তো আমরা খেয়ে ফেলেছি। তুমি আমাদের দেশে চলে এসো। তোমার যে ক্ষতি আমরা করেছি তা সম্পূর্ণ পূরণ করে দেব। তা নিয়ে তুমি আবার বাড়িতে ফিরে আসতে পারবে। এই কথা বলে টিয়া পাখির দল উঠে চলে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মা বাবা একটু পরেই বাড়িতে ফিরে আসবে। মা বাবা ঘরে ফিরার আগেই ছেলেটি তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল টিয়া পাখির দেশের সন্ধানে। ঘুটঘুটে অন্ধকার ভয়ে ভয়ে সে চলছে কোথায় টিয়া পাখির দেশ সে জানে না — চোখের ঘুমে ঢলে এক সময় গাছের নীচে শুয়ে রাত কাটল। ভোর বেলা উঠে আবার রওনা হল যেদিকে দু-চোখ যায়। যেতে যেতে এক সময় এক রাখাল ছেলের সামনে পড়ল। রাখাল ছেলেটিকে ডেকে বলল, ‘অঃ মং নোওয়া গ্যংসাঃ মং নোওয়াগ্যংসাঃ কীঃ ফ্রোরোওয়া প্রেঃ জামালেঃ’ - অর্থাৎ রাখাল ভাই, রাখাল ভাই সাদা টিয়া পাখির দেশ কোথায় বলতে পারো?

‘ঙা আমাহং তালোক চাহাঃ ঙাঃরীঃতাদুক সক্হা। ঙা নোওয়াখীঃ তাংবাক্ খোওয়ে বঃ হা য়াছক প্রীঃ মা কীঃ ফ্রোরোওয়া প্রেঃমা রক্ লিমে।

অর্থাৎ আমার ঘরের এক গ্রাস ভাত খেয়ে যেও, এক টোক জল পান করে যেও, অর্ধভাগ গোবর ফেলে দিয়ে যেও। তবেই সাদা টিয়া পাখির দেশে পৌঁছতে পারবে। রাখালের কথা মতো ছেলেটি এক গ্রাস ভাত খেল, এক টোক জল পান করল ও গোয়াল ঘর থেকে অর্ধভাগ গোবর ফেলে পরিষ্কার করে। সে আবার রওনা হল টিয়া পাখির দেশের খোঁজে — যেতে যেতে পথে আর একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল। সে মাঠে বিরাট এক পাল ঘোড়া চড়াচ্ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করল :

অঃ মং সাংগ্যংসাঃ - মং সাংগ্যংসা - কীঃফ্রোঃ রোওয়া প্রেঃ জামালে ‘অঃ দাদা টিয়া পাখির দেশ কোথায়?’ সে উত্তরে বলে ঙা রী তাদোক সক্হা ও, ঙা আম্মাং তালোক চাহাও, ঙাঃ স্রাংখ্যিঃ তা বাক খোওয়ে বঃহা ও, য়ালক প্রীঃ মা কীঃ ফ্রোরোওয়া প্রেমা রক্হু মে। অর্থাৎ আমার ঘরের এক ফোঁটা জল পান করে যেও, আমার ঘরের এক গ্রাস ভাত খেয়ে যেও, আমার আন্তাবল থেকে এক ভাগ ঘোড়ার পায়খানা ফেলে দিয়ে যেও, তারপরেই তুমি সাদা টিয়া পাখির দেশে পৌঁছতে পারবে। দুঃখী বালকটি ঠিক তাই করল। তারপরে আবার টিয়া পাখির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হচ্ছে, পথে কত ঝড়বৃষ্টি-বাধাবিপত্তি পেয়েছে তার আন্ত নেই। কখনো ক্ষুধায় কাতর কখনো তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়—এমন অবস্থায় সে পাহাড় পর্বত নদী মালা পার হয়ে এসেছে। বালকটির শরীরে শক্তি কমে গেছে, ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন সে টলতে টলতে ধীরে ধীরে হাঁটছে অজানা দেশের সন্ধানে।

চলতে চলতে আবার আরেকটি লোকের সঙ্গে দেখা হল। লোকটি এক পাল ছাগল নিয়ে মাঠে চরাচ্ছিল। বালকটি তাকে জিজ্ঞেস করল, অঃ মং ছোয়ি ক্যংসা, মংছোয়ী ক্যংসা, কীঃ ফ্রোঃ রা প্রেঃ জামালে? অর্থাৎ ও ছাগল নাইয়া ভাই, টিয়া পাখির দেশ কোথায় আছে দয়া করে আমায় একটু বলে দিন। আমি অনেক কষ্ট করে বহুদূর থেকে এসেছি টিয়া পাখির দেশের সন্ধানে — কোন পথে গেলে টিয়া পাখির দেশে পৌঁছতে পারব বলে দিন। ঙা আম্মাং তালোক চাহাও, ঙা রীঃ তাটোক সওহা ও য়া হ্লাক প্রীঃ মা কীঃ ফ্রোরা প্রেঃ মা রক্হুমে। অর্থাৎ আমার ঘরের ভাত এক গ্রাস খেয়ে যেও, আমার ঘরের এক টোক জল পান করে যেও, আমার ছাগলের পায়খানা ফেলে দিও। তাহলেই কীফ্রোরা দেশে পৌঁছতে পারবে। বালকটি ছাগল মালিকের কথা মত এক গ্রাস

ভাত খেয়ে নিল। এক টোক জল পান করে নিল ও ছাগলের পায়খানা ফেলে দিয়ে ছাগলের ঘর পরিষ্কার করে দিল।

বালকটি ছাগল মালিকের দিকে চেয়ে কাতরভাবে মিনতী করে বলল, দাদা এবার আমায় কীফ্রারা দেশে যাবার পথ বলে দিন।

লোকটি বলে দিল যে সোজা পশ্চিম দিকে বরাবর যাবে, তার পর পড়বে এক নদী। সেই নদী পার হয়ে পশ্চিম দিকে যেতে থাকবে। তারপর সামনে পড়বে এক সুন্দর পাহাড় — সেই পাহাড়ের উপরে আছে কীফ্রারা প্রেং বা টিয়া পাখির দেশ। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুরো উদ্দম নিয়ে বালকটি রওনা হল টিয়া পাখির দেশের উদ্দেশে। যেতে যেতে দেখল নদীতে জল থই থই করছে—নদীতে জল দেখে প্রথমে ছেলেটি ভয় পেয়ে গেল। কী করে পার হব। একবার ভাবছে ফিরে যাবে কিন্তু কোথায় যাবে। মা বাবাতো বাড়িতে স্থান দেবে না। তার চেয়ে বরং নদীতেই বাঁপ দিই, পার হতে পারলে তো বেঁচে যাব নতুবা মরেই যাই — এই ভেবে সে নদীতে নেমে পড়ল। দেখা গেল অনায়াসে সে নদী পার হয়ে এসেছে। পশ্চিম দিকে একটু যেতেই সেই সুন্দর পাহাড় চোখে পড়ল। কীফ্রারা প্রেং অর্থাৎ সাদা টিয়া পাখির দেশে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সেখানে সাদা টিয়া পাখিদের সঙ্গে দেখা হল। তারা আদর করে বালকটিকে ডেকে নিল। ঘরে উঠার আগে বালকটিকে জিজ্ঞেস করল—তুমি রূপার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবে, না সোনার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবে? না কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবে? এখানে সোনা, রূপা ও কাঠের তিন ধরনের সিঁড়ি আছে। তোমার ইচ্ছে মতো যেকোন একটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসবে। ছেলেটি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। তাকে সোনার থালায়, রূপার থালায় ও মাটির থালায় খাবার এনে দিল, এবং গ্লাসও ঠিক একইভাবে সোনার গ্লাসে, রূপার গ্লাসে ও মাটির গ্লাসে জল দিল। পাখির দলনেতা ছেলেটিকে বলল, থালা ও গ্লাস তোমার পছন্দ মত, সেই পাত্র তুলে খাবার খাও। ছেলেটি মাটির থালায় করে খাবার খেয়ে মাটির গ্লাসে করে জল পান করল—বালকটির সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা কষ্ট ও ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও নির্লোভতা দেখে টিয়া পাখির নেতা মুগ্ধ হলো। তাকে এক ঘড়া সোনার মোহর উপহার দিল। ছেলেটি মোহরগুলি নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল এবং সমস্ত ঘটনা মা ও বাবাকে শোনাল। গরীব দুঃখী ছেলে ফিরে পেয়ে, এক ঘড়া মোহর পেয়ে খুব খুশি হল তারা। তাদের দরিদ্রতা মুছে গেল। সেদিন থেকে সুখে দিন যাপন করতে লাগল। বাড়ির পাশে অন্য এক পরিবার তাদের সংসারে উন্নতি হওয়ার কারণ বিস্তারিতভাবে জেনে নিল। মোহর পাওয়ার লোভে তারাও নিজের ছেলেকে সব কিছু শিখিয়ে পাঠিয়ে দিল কীফ্রারা প্রেং অর্থাৎ টিয়া পাখির দেশের সন্ধানে। সঙ্গে খাবার নিয়ে ছেলেটি বেরিয়ে পড়ল। যাবার পথে রাখাল ছেলে, ছাগলের পালের মালিকদের সঙ্গে দেখা হল। তারা সবাই ছেলেটিকে বলত যে এক গ্রাস ভাত খেয়ে যাও, এক টোক জল পান করে যাও, গোবর ফেলে দিয়ে যাও। এই ছেলেটি সামনে থালা ভরা ভাত ও গ্লাসভরা জল পেয়ে গ্লাস ভর্তি জল ও সমস্ত ভাত খেয়ে ফেলল। কিন্তু গোবর আর ফেলে দেয় না, গোয়াল ঘর পরিষ্কার করে না। এই ভাবে চলতে চলতে এক সময় কীফ্রারা প্রেং টিয়া পাখির দেশে এসে পৌঁছল। সেখানে সোনার সিঁড়ি, রূপার সিঁড়ি ও কাঠের সিঁড়ি পাতা আছে। ছেলেটিকে

যেখান দিয়ে খুশি সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে বলা হয়েছে।

ছেলেটি গট গট করে সোনার সিঁড়ি দিয়ে বেয়ে উঠে গেল। সোনার থালা, রূপার থালা ও কাঠের থালায় করে খাবার দিল। পাশাপাশি সোনার গ্লাস, রূপার গ্লাস ও কাঠের গ্লাসে করে জল দিল। ছেলেটি সোনার থালায় ভরা, খাবার নিয়ে পেট ভরে আহার করল ও সোনার গ্লাসে করে জল পান করল। যাবার সময় টিয়া পাখির দলনেতা শক্ত করে ঢাকনা দিয়ে একটা বড় কলসি দিয়েছিল। বলেছিল যে বাড়িতে গিয়েই কলসীর মুখটা খুলবে। ছেলেটি কলসীটা নিয়ে বাড়িতে ফিরে গেল। বিরাট একটি কলসী নিয়ে ফিরে আসতে দেখে মা বাবা ভীষণ খুশি। সবচেয়ে বেশি ধনী হবে — সেই আনন্দে কলসী মাথায় নিয়ে নাচানাচি করছিল। ছেলেটি বলে, বাবা এবার কলসির মুখ খোল, মোহরগুলি গুনে দেখি। মাথা থেকে কলসি নামিয়ে ঢাকনা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলসির ভিতর থেকে বিশাল আকারের একটা সাপ বেরিয়ে এসে মা বাবা ও ছেলেটিকে দংশন করল। সাথে সাথেই সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। অতিলোভে সমস্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল।

“লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু”।

মগ জনজাতিদের লোকগল্প

‘ম-নরী’

বারাণসীতে এক রাজা ছিলেন। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর তাঁদের কোলে ফুটফুটে একটি সুন্দর ছেলের জন্ম নেয়। তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত ছেলের পুত্র পেয়ে রাজার আনন্দের শেষ নেই। তিনি উৎসবের আয়োজন করলেন। দীনদুখীদের কাপড় দান করলেন। মহারাজা রাজগুরু পুরোহিত দ্বারা রাজপুত্রের ভবিষ্যৎ গণনা করে দেখলেন। রাজগুরু শিশুটিকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এ তো সাধারণ শিশু নয়। পুরোহিত বললেন, এই শিশুটির দেবলোক প্রাপ্তিযোগ আছে এবং দেবকন্যাকে পত্নী রূপে লাভ করবে। বিখ্যাত রাজা হয়ে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন করবে। রাজগুরু রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করে নাম রাখলেন সুথানু মাউসা। সুথানু মাউসা রাজ প্রাসাদে সকলের আদরে লালিত হয়ে দিনের পর দিন বড় হতে লাগল। একদিন রাজা ও রানী তাঁদের আদরের পুত্রকে সকল বিদ্যায় পারদর্শী করার জন্য সম্রাসীর হাতে অর্পণ করলেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে রাজপুত্র যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি, এবং বিভিন্ন শাস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন। রাজপুত্র পুরোপুরি যৌবনে পদার্পণ করল। কিন্তু তার পত্নী হবার মতো সুযোগ্য রাজকন্যা কোথাও খুঁজে পেল না।

ঐ রাজ্যের অন্তর্গত পাহাড়ের নীচে অর্ধভাঙ্গা এক কুটিরে ব্যাধ ও তার স্ত্রী পরিবার নিয়ে বাস করত। ব্যাধ সারাদিন হরিণ, শূকর, খরগোশ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পশু শিকার করে গৃহে আনত। শিকার করা মাংস রাজবাড়িতে ও হাটে বাজারে ব্যাধ ও তার স্ত্রী ঘুরে ঘুরে বিক্রি করত

দিনের শেষে বিক্রি করা মাংসের টাকা দিয়ে চাল সজ্জি ইত্যাদি কিনে নিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করত। শিকার মিলে গেলে তাদের ভোজনের ব্যবস্থা খুব ভালো হতো। কিন্তু যেদিন কোন কিছু শিকার করতে পারতো না সেইদিন অনাহারে থাকতে হতো। ব্যাধের বউটি প্রায়দিন ঘরের বাইরে যেতে হয়। তার বাড়িঘর অগোছালো। অভাবের তাড়নায় সুযোগ পেলে কারো ক্ষেত থেকে ফলমূল শাক-সজ্জি চুরি করে নিয়ে আসতো। উসকো খুশকো পাখির বাসার মত মাথার চুল, ছেঁড়া কাপড় পরে সারাদিন মাংস কাটাকাটি করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাংস বিক্রি করাই তার কাজ। এতো কষ্টের সংসারের মধ্যেও তারা মাঝে মাঝে বেশ হাসিঠাট্টা-তামাশা করে আনন্দ উপভোগ করতো। এইভাবেই চলতো মচ্ছে বা ব্যাধের জীবন।

এদিকে আনন্দ নামক রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টিপাত না হওয়াতে খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রাজ্যে ফসল উৎপাদন হচ্ছে না। প্রজাগণ খেতে না পেয়ে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। রাজা রাজসভায় পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ডেকে বলল যে, রাজ্যে খরা ও দুর্ভিক্ষের হাত থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাব তার উপায় বলুন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাগরাজকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তাই ব্রাহ্মণ গণনা করে বলল যে, নাগরাজকে ধরে এনে বলি দিলেই দেশে বৃষ্টিপাত হবে। প্রচুর ফসল উৎপাদন হবে এবং শান্তিও ফিরে আসবে। তাই যেমন করেই হোক নাগরাজকে ধরে আনতে হবে। নাগরাজকে ধরে বলি দিতে বলার পিছনে ছোট একটি কাহিনী আছে।

একদিন নাগরাজ তার পত্নী নাগিনীকে বলল যে, এই পাতালপুরীতে পুণ্য অর্জন করার মতো কিছুই নেই। মর্ত্যভূমিতে পাপকর্ম যেমন আছে পুণ্য অর্জন করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। বড় বড় মহাপুরুষেরা মর্ত্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করে সংকাজে নিয়োজিত হয়ে পুণ্য অর্জন করে গেছেন। পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য মর্ত্যভূমিই উত্তম স্থান। চলো আমরাও মর্ত্যভূমিতে গিয়ে পুণ্য অর্জন করি। এইরূপে নাগরাজ ও নাগিনী পাতালপুরী ছেড়ে মর্ত্যালোকে পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য চলে আসে। এই খোলা আকাশ-বাতাস সবুজ বনানী গিরী পর্বত বার্নার বার বার শব্দ, নদী, সাগর, বিচিত্র পাখিদের কলতান—প্রকৃতির এইসব দৃশ্য দেখে নাগিনী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। জীবনে এই দৃশ্য প্রথম দেখে সে আনন্দে নারীবেশে গান গেয়ে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়। ঠিক ঐ সময় ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়ে বনে যাচ্ছিলেন ঔষধের সংগ্রহে। অপূর্ব সুন্দরী মানবীরূপে নাগিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ তাকে নিয়ে বিয়ে করবে বলে জোর করে জাপটে ধরল। নাগিনী তার স্বামীকে চিৎকার করে ডাকল বাঁচাও বাঁচাও বলে। নাগরাজ সর্পরূপে দংশন করতে গেলে ব্রাহ্মণ নিরুপায় হয়ে নাগিনীকে ছেড়ে দিল। মানবীরূপী নাগিনীকে সে আর ভুলতে পারল না। নাগরাজকে মারতে পারলেই নাগিনীকে পাওয়া যাবে—এই কথা ভেবে ব্রাহ্মণ দিনরাত শুধু নাগরাজকে মারবার জন্য ফন্দি আঁটতে লাগল।

রাজ সভায় রাজা দেশে কী করলে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পাবে তা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করলেন। রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ নাগরাজকে ধরে এনে বলিদেবার জন্য প্রস্তাব করল। রাজা ব্রাহ্মণের কথা অনুযায়ী ঘোষণা করে দিয়ে বললেন যে, যদি কেউ এই নাগরাজকে ধরে দিতে

পারে তাকে ১হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এক বিখ্যাত সাপুড়ে ওঝা রাজার কাছে এসে বলল যে, সে-ই নাগরাজকে ধরে দিতে পারবে। এদিকে নাগরাজ ও নাগিনী পাহাড়ের উপর বিশাল এক গাছের নীচে বসে ধ্যান করছিলেন। ঐ সময় সাপুড়ে ওঝা এসে বিন বাজাতে বাজাতে নাগরাজকে নদীর ধারে চতুর্দিকে মন্ত্র দ্বারা বান দিয়ে বন্দি করে রাখল। তাদেরকে বন্দি করে রেখে রাজার কাছে খবর দিয়ে পুরস্কার নিতে গেল।

এদিকে মচ্ছো (ব্যাধ) শিকারের জন্য জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে নাগরাজ দম্পতিকে বন্দি অবস্থায় দেখতে পেল। শিকারীকে দেখে নাগরাজ কাতরভাবে মিনতি করে বলল যে, সাপুড়ে তাদেরকে বন্দি করে রেখে গেছে, দয়া করে তাড়াতাড়ি যেন এই বন্দি থেকে মুক্ত করে দেয়। তারা কাউকে ক্ষতি করে না, মর্ত্যলোকে সাধনা করতে এসে এই বিপদ ঘটেছে। তাদেরকে যেন মুক্ত করে প্রাণে বাঁচায়। নাগরাজের কথা শুনে ব্যাধ তাদের প্রতি খুব মায়া হলো। তাদেরকে মুক্ত করতে গেল। ঠিক এই সময় সাপুড়ে এসে জোর গলায় বলে যে, এটা তার শিকারের জিনিস কেউ তাদেরকে খুলে দিতে পারবে না। ব্যাধ নাগরাজকে মুক্তি দিতে চায়, সাপুড়ে তাদেরকে ধরে নিয়ে যেতে চায়। এই নিয়ে মচ্ছো (ব্যাধ)ও সাপুড়ে ওঝার ঝগড়া থেকে যুদ্ধ বেধে গেল। সাপুড়ে পরাজিত ও আহত হয়ে পালিয়ে যায়। তারপর মচ্ছো (ব্যাধ) নাগরাজ ও তার নাগিনীকে মুক্ত করে ছেড়ে দেয়। নাগরাজ এতে খুশি হয়ে মচ্ছোর (ব্যাধ) সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতে এবং বলে যে, যখন প্রয়োজনে তাকে স্মরণ করবে ঠিক তখনই নাগরাজ বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য হাজির হবে। এই কথা বলে তারা পাতালে চলে গেল। মচ্ছো (ব্যাধ)ও আবার পশু শিকারের জন্য বনে-দুকে গেল। কিছুই শিকার মিলছে না। যেতে যেতে বনের মাঝে এক শান্তসৌম্য সন্ন্যাসীর সাথে দেখা হলো। মচ্ছো সন্ন্যাসীকে দুঃখ করে বলে যে আজ সারাদিনে একটি পশুও শিকার করতে পারলাম না। বাড়িতে গেলে ভাত খাবার পরিবর্তে বউ-এর হাতে বকুনি খাবে। সন্ন্যাসী বলেন, প্রাণী হত্যা মহাপাপ। তুমি এই রকম প্রাণী হত্যা করে আর পাপের বোঝা বাড়াবে না। মচ্ছো প্রতিবাদ করে বলে যে, আমি জাতিতে মচ্ছো বা ব্যাধ। পশু শিকার করে মাংস বিক্রি করাই আমার পেশা। এই কাজ ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না। সুতরাং আমাকে শিকার করতেই হবে। সন্ন্যাসী তখন লামাকে বলে যে, তা হলে তুমি তোমার ডান দিকে বা বাঁ দিকের কোন পশুকে হত্যা করতে পারলে না। অগত্যা কোন পশু সামনে এসে পড়লে তখন তাকে বধ করবে। অন্তত এই কথাটি তুমি প্রতিজ্ঞা করে যাও। মচ্ছো সন্ন্যাসীর কাছে প্রতিজ্ঞা করে যায় যে, সে কোনদিন তার ডানে বা বায়ে কোন পশুকে মারবে না। কিন্তু তার সম্মুখে যদি এসে পড়ে তাহলে তাকে আর ছাড়বে না। এই কথা বলে সন্ন্যাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার শিকারের জন্য বেড়িয়ে পড়ে।

ব্যাধ তার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে গান গাইতে গাইতে শিকারের জন্য পাহাড়ের পর পাহাড় বন পেরিয়ে যায়—অবশেষে পাহাড়ের নীচে কমলবনে ঘেরা অতি সুন্দর স্বচ্ছ একটি সরোবর দেখতে পায়। সেখানে সাত বোন পরীরা মনের আনন্দে জলক্রীড়া করছে। সে ঝোপের আড়াল থেকে তাদেরকে দেখে ধরবার জন্য এগিয়ে যায় ওমনি সব পরীরা পাখামেলে আকাশে উড়ে চলে গেল। কিন্তু মচ্ছো পরীদের কথা আর ভুলতে পারলো না। সে সোজা সন্ন্যাসীর কাছে চলে

আসে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে কীভাবে পরীদেরকে ধরা যায় তার একটা উপায় বলে দিতে হবে। তখন সন্ন্যাসী বলে যে, পরীদের ধরা কারো সাধ্য নেই। একমাত্র নাবাই ক্যগং (নাগপাশ) নামক মায়াদড়ি দিয়ে পরীকে ধরা যাবে। সেই নাবাই ক্যগং একমাত্র নাগরাজের কাছে আছে। তখন মচ্ছো (ব্যাধ) নাগরাজকে স্মরণ করল। মচ্ছোর ডাকে নাগরাজ এসে হাজির হলো এবং ডাকার কারণ জিজ্ঞেস করল। মচ্ছো বিস্তারিত ঘটনা জানালো এবং নাগরাজের কাছ থেকে ‘নাবাইক্যগং’ (নাগপাশ)টি চাইল। অগত্যা বন্ধুত্বের খাতিরে নাগরাজ তার অতি প্রিয় রক্ষাকবচ নাবাইক্যগংটি মচ্ছোর হাতে দিয়ে দিল। মচ্ছো পশু শিকারের কথা ভুলে গিয়ে সুন্দরী পরী ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে নাবাইক্যগং নামক মায়াদড়ি নিয়ে পরীদেরকে ধরবার জন্য সেই সরোবরের কিনারায় ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এক সময় পরীরা যখন সেই সুদৃশ্য স্বচ্ছ সরোবরে স্নান করতে নামল, সাত বোন পরীদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বোনটি সবার চেয়ে বেশি সুন্দরী। তারা স্নান সেরে চলে যাবার সময় মচ্ছো সবচেয়ে ছোট বোনের দিকে লক্ষ্য করে নাবাইক্যগং নামে মায়াদড়িটি ছেড়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট বোন পরীকে বন্দি করে ফেলল। সে কোনোভাবেই আর উড়ে যেতে পারছে না। তখন ছোট বোন দিদির উদ্দেশে ডেকে বলল —

শউকা লীহাং তংদো ঙাউরে,

তংগা লীহাং শউতো ঙাউরে।

হ্রীগা লীহাং নউতো ঙাউরে

নউকা লীহাং হ্রীদো ঙাউরে।

মিগ্রী মিসে মিলে রোউ

আমিংলে ম্যাচী মইংদংফোংমা

দিলেজা খ্যায়াউমে। ফাংলে ম্যাচী, হ্রায়উমো।।

ছোট বোন পরী :

বড়দি মেজদি শেষে দিদি সবাইকে নিজ দেশে ফিরে যেতে বলে। কারণ এতক্ষণে মইংদংফোং নামক স্বর্গে মা বাবা তাদের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করে থাকবে। ছয় বোন পরীরা তাদের আদরের ছোট বোন মর্ত্যলোকে রেখে তাদের দেশে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। সুন্দরী পরীকে বিয়ে কঁরে সুখের সংসার করবে এই কথা ভেবে মচ্ছো হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে তুলতে গেল। আমাকে রক্ষা করো বাবা— এই কথা বলে মচ্ছো নামক ব্যাধের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। মচ্ছো মহা মুক্তি পেয়ে গেল— যাকে বিয়ে করব বলে মনে মনে সে কত জল্পনা কল্পনা করেছিল! মেয়েটি তাকে বাবা বলে ডেকেছে। তাকে তো আর বিয়ে করা যাবে না। মচ্ছো স্থির করে ফেলল যে, ধরেই যখন ফেলেছি তাকে আর ছেড়ে দেবো না। রাতটা জঙ্গলে কাটিয়ে ভোর হলেই বাড়িতে নিয়ে যাবো। এই ভেবে গাছের গোড়ায় মেয়েটিকে বেঁধে রেখে মচ্ছো নিজে গাছের উপরে উঠে ঘুমাতে লাগল। নিবুন্ম রাত বনে বিভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ধরণের পশুপাখি ডাকছে। দূর থেকে মানুষের গন্ধ পেয়ে বাঘ আক্রমণ করার জন্য ছুটে আসছে দেখে পরী মেয়েটি ভয়ে কাতরভাবে চিৎকার

করছে। মচ্ছো গাছ থেকে নেমে এসে বাঘকে মেরে তাড়িয়ে দিল। এইভাবে কোন রকমে রাতটা শেষ হল। ভোর হলে মচ্ছো মেয়েটিকে নিয়ে বাড়িতে ফিরে এল। যখন তারা বাড়িতে পৌঁছল তখন মচ্ছোর বউ বাড়িতে ছিল না। সে খাবারের সন্ধানে বাইরে গেছে। এসে দেখে ঘরে বউ নেই, খাবারও নেই তাই মচ্ছো মেয়েটিকে পালার সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রেখে খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। সেই ফাঁকে মচ্ছোর বউ ফিরে এসে দেখে যে অপূর্ব এক সুন্দরী তার ঘরে বন্দি হয়ে আছে। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পাড়ল যে তার স্বামী মচ্ছো মেয়েটিকে ধরে এনে বন্দি করে রেখেছে। মচ্ছোর বউ তার সংসার জীবনে বারমাসের অভাব-অনটন দুঃখের কাহিনি শোনাল।

অভাবের সংসারে একজন বউকে সঠিকভাবে খাওয়াতে পারছে না। তার উপর আরও একটি সুন্দরী মেয়ে ঘরে এনেছে। স্বামীর উপর প্রচণ্ড রেগে বউটি বকছে আর অঝোরে কাঁদছে। একটু পরেই স্বামী মচ্ছো কিছু খাবার জোগাড় করে বাড়িতে এলো। মচ্ছোকে দেখা মাত্রই তার স্ত্রী ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে কেন ঘরে নিয়ে এল, এ বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া বিবাদ ঘটে গেল। অতি কষ্টে চঞ্চলমতি বউকে পোষ মানিয়ে বুঝিয়ে মচ্ছো তার স্ত্রীকে বলল যে, ঐ সুন্দরী মেয়েটি মানুষ নয়, স্বর্গের পরী, মচ্ছোকে বাবা বলে ডেকেছে। সুতরাং, সে আমাদের মেয়ের মতো। তখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যুক্তি করে স্থির করল যে তারা ঐ সুন্দরী পরীকে রাজার কাছে উপহার স্বরূপ দেবে। পরিবর্তে অনেক পুরস্কার পাবে এই আশা করে তারা পরীকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। নাম জিজ্ঞেস করে জানতে পারে যে সুন্দরী পরীর নাম 'ম-নরী'। মহারাজ ম-নরীকে দেখে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন। রাজপুত্র সুথানুরও মনরীকে ভীষণ পছন্দ হয়েছে। শুভদিনে রাজপুত্র সুথানু ও স্বর্গের পরী ম-নরীর সঙ্গে খুব ধুমধাম করে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। ম-নরী শুধু রূপবতীই নয় বিদ্যা জ্ঞান-বিচক্ষণ বুদ্ধি সম্পন্ন নারী। তাঁর যুক্তি বিচারবুদ্ধির কাছে সারা দেশবাসী তথা মহারাজাও হার মানেন। এত দিন ঐরাজ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অঙ্গুলি হেলেনে রাজকার্য পরিচালনা হতো। ব্রাহ্মণ যা বলতো মহারাজা ও দেশবাসীরা অন্ধের মতো তা বিশ্বাস করতেন ও মেনে নিতেন।

মইংদংফোং নামক স্বর্গের রাজা তোংস, তোষ দেবের সাত কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠ কন্যা ম-নরী।

যেমন কারো কোন সন্তানদি জন্ম না হলে, কোন পরিবারে কেউ অসুস্থ হলে, কোন বিপদ ঘটলে, ফসল শস্য ঠিক মতো ঘরে না উঠলে ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রাহ্মণরা জনগণকে বলে দিত যে, সহস্র মুদ্রা ব্রাহ্মণদের দান করতে হবে অথবা গো-ছাগল দান করতে হবে অথবা পাঁঠা বলিদান, পূজা দিতে হবে। এইভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভয় দেখিয়ে জনগণের কাছ থেকে সুবিধামতো টাকা-পয়সা গরু-ছাগল ইত্যাদি আদায় করে নিতো। সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সম্মান ছিল উপরে।

'ম-নরী' রাজার পুত্রবধূ হয়ে আসার পর থেকে ব্রাহ্মণদের এই কর্মকাণ্ডগুলো বন্ধ করে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। ম-নরী যুক্তি দিয়ে বিভিন্নভাবে তার স্বামী শ্বশুর-শাশুড়িদেরকে

বুঝিয়ে দিলেন যে, ব্রাহ্মণদের এই কর্মকাণ্ডগুলো ভুল এবং তা মেনে নেওয়া অন্যায়। ম-নরী রাজ্যে আসার পর থেকে ব্রাহ্মণদের দাপট বা ক্ষমতা ক্রমশ কমতে লাগল। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ম-নরী পরীর উপর ভীষণ ক্ষেপে গেল। কীভাবে ম-নরীকে দেশ থেকে তাড়ানো যায় তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। এদিকে ‘ম-নরী’ তার আচার ব্যবহার, কার্যকলাপ দ্বারা স্বামী সুথানু রাজা-রানী ও দেশবাসীদের মন জয় করে নিয়েছে। ম-নরীর যেমন রূপ তেমন গুণ। তাই ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা কেউই তাকে চরম শাস্তি দেবার মতো কোন রকম সুযোগ পাচ্ছে না। এর মধ্যে স্বর্গের অঙ্গরা ম-নরীর গর্ভে ফুটফুটে একটি সুন্দর ছেলের জন্ম হলো। যুবরাজের পুত্র সন্তান হয়েছে সেই উপলক্ষ্যে রাজবাড়িতে আনন্দ উৎসবের আয়োজন হলো। পচাইন্দ্রা নামক এলাকাবাসীরা হঠাৎ রাজাকে কর দেওয়া বন্ধ করে দিল। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মহারাজ তাঁর পুত্র যুবরাজ সুথানুকে পচাইন্দ্রা এলাকাবাসীদের দমন করার জন্য পাঠালেন। যুবরাজ সৈন্য সামন্ত নিয়ে সেখানে গেল। বেশ কয়েকদিন যাবৎ উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বাধে।

এর মধ্যে মহারাজ স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনি চাঁদকে কোলে নিয়েছেন, সূর্যকে কানে পরেছেন। মহারাজের পেট থেকে আতুরি ভুঁড়ি বের হয়ে রাজপ্রাসাদকে সাত বার প্রদক্ষিণ করে ফিরে আবার পেটে প্রবেশ করেছে।

জীবনে এমন অদ্ভুত স্বপ্ন রাজা কখনও দেখেননি। তাই তিনি ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ডেকে স্বপ্নের কথা বললেন। ম-নরী তখন অন্দরমহলে শিশুপুত্রকে নিয়ে ব্যস্ত। রাজদরবারের খবর নেওয়ার সময় ছিল না। সেই সুযোগে পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজাকে বলল যে, মহারাজ খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন। এই স্বপ্ন দেখবার অর্থ হলো দেশে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। রাজপুত্র সুথানু যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হবেন। এই পুরোহিতের কথা শুনে রাজা পুত্র হারাবার ভয়ে কাতর হয়ে পড়লেন।

তখন পুরোহিত বলল যে, এই সমস্ত দুঃখ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার ও সুখী হওয়ার উপায় আছে। রাজা অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, কী উপায় আছে তাড়াতাড়ি বলে দিন।

পুরোহিত বললেন, দেশের মাটিতে দেবীর রক্ত দিতে হবে।

অর্থাৎ দেবতাকে বলি দিয়ে পূজা করতে হবে।

তা হলে দেশে দুর্ভিক্ষ হবে না, রাজপুত্রও নিহত হবেন না যুদ্ধে জয়লাভ করে দেশে ফিরে আসবেন।

মহারাজ বললেন যে, বলি দেওয়ার জন্য দেবতা কোথায় পাব?

আসনে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণরা এক ডাকে উঠে বলল, মহারাজের ঘরে পুত্রবধূইত স্বর্গের দেবী। তাকেই বলি দিতে হবে। তা যদি না করেন তা হলে রাজপুত্রকে হারাতে হবে। পুত্রস্নেহে অন্ধরাজা নিজপুত্রকে বাঁচাবার জন্য পুত্রবধূ ম-নরীকে বলি দেবার জন্য ঘোষণা করে দিলেন। সকলের প্রিয়পাত্রী ম-নরীকে এই খবর বলবে কে, কারোর সাহস হয় না। রানী নিজেও তাঁর আদরের পুত্রবধূকে এই কথা বলতে পারছেন না।

রানী ম-নরীকে চুল আঁচড়ে সাজিয়ে দেবে বলে কাছে ডেকে নিলেন। পরম আদরে হাত

বুলাতে বুলাতে মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। এমন রূপবতী গুণবতী বউকে হারাতে হবে এই কথা ভেবে রানীর কান্না চাপিয়ে রাখতে পারলেন না। তাই হাত বুলাতে গিয়েই ম-নরীর পিঠে চোখের জল টপ টপ করে পড়তে লাগল। দেবী ম-নরীর ব্যথা অনুভব হলো। সঙ্গে সঙ্গে ম-নরী রানীকে জিজ্ঞেস করল যে, মা আমার পিঠে কিল মারছেন কেন? বলে ফিরে তাকালে তখন দেখে যে রানী অবোরে কাঁদছে। বারবার কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করাতে রানী বিস্তারিত ঘটনা খুলে বললেন। রানী বউকে ধরে বললেন, মহারাজার আদেশে ব্রাহ্মণ পুরোহিত তোমাকে বলি দেবে। রাজার আদেশ অমান্য করে তোমাকে বাঁচাতে পারবো না। তাই বলছি রাজা পুরোহিতরা আসার আগেই এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাও। যুবরাজও ঘরে নেই, যে তোমাকে বাঁচাতে পারবে। সুতরাং, যত তাড়াতাড়ি পারো পালিয়ে যাও।

একদিকে স্বামী রাজপ্রাসাদে, নেই, অন্যদিকে দুধের শিশু! সংসারের প্রতি ভীষণ মায়ী জন্মে গেছে। ম-নরী কিছুতেই তাদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছে না। শাশুড়ি রানীমার কথায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। মর্ত্যের মানুষের সাথে সহবাস করেছে বলে এতদিন পরী তার পাখনা দুটো রানীমার কাছে রেখে দিয়েছিল। স্বর্গের ফিরে যাবার জন্য রানীমার কাছ থেকে তার পাখনা (ডানা) চেয়ে নিল। তার পুত্রকে পেট ভরে বুকের দুধ খাওয়াল, দুধের পাত্রে দুধ ভরিয়ে রাখল। তারপর নিজের জীবনীকে গানের সুরে গাইতে গাইতে দোলনায় দুলিয়ে ঘুম পাড়াতে লাগল তার শিশুপুত্রকে। এই দোলনার গান ম-নরী স্বাঃ হ্রোয়ি খাইং নামে বিখ্যাত।

গানটি এইরূপ—

ইলে যাং যাং চা জি খ্যাংলে

মিংখাং মং বারনা তংগ্রী ছিয়ে -

সা মংবাংগো মিংখাং কোগা প্র-লে।

রোওয় খ্যাং খ্যাং জে মোয়ি সা ফো—

লোম্যো রাইংখা মতবাজে-

চইংহ্লা থৌনা ম্যোদো।

মংফুলে নে আত্ৰাং - মিংখাং জেনে আচঃ

দাফী কিনা থৈইং মাদাজে দেওয়া তোশ-লে।

আঃ সাখ্যলেমং ফোদোওয়ং রাংখোওয়ংজে

ফোওয়াত্রেস

মিংহ্লা হ্রোয়েজে তোংব্রি তোংব্রি তোওয়াং পংজ্রা।

খোনয়ক তাজো দোওয়াং প্যজইং ম্রিজে

নেতো রীগাইং দোওয়াং হু।

কাজাজে আখা নজইং লেমী

ফাসা ওয়েজে সিথী কোন্তয়েং রক্কা-লে।

ইংলিয়াং যাং - যাংয়াংদে-লে।

সাঃ হোয়ী ফোং বাচ্চাটি দোলনায় ঘুমিয়ে পড়লে ম-নরী তার ডানা দুটি পিঠের সঙ্গে লাগিয়ে মইং দং ফোং নামক স্বর্গের উদ্দেশে যাবার জন্য আকাশে উড়ে গেল। করণ সুরে চিলপাখির ডাক শুনে ম-নরী ভাবল যে তার দুধের শিশুটি ঘুম থেকে উঠে মাকে খুঁজছে। তাই ফিরে এল ছেলে দেখতে। এসে দেখে যে ছেলে দোলনায় ঘুমিয়ে আছে। দোলনা থেকে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আবার বুকের দুধ খাওয়াল। দোলনায় তুলে দিয়ে যত্ন সহকারে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর তীব্র বেগে আকাশে উড়ে গেল। যাবার সময় মুনীর আশ্রমে গিয়ে তার হাতের আংটিটি দিয়ে বলে গেল যে, যদি কোনদিন তার স্বামী ম-নরীর খোঁজে আসেন। তবে এ ই হাতের আংটি যেন রাজকুমারের হাতে দিয়ে দেন। কীভাবে তাদের দেশে অর্থাৎ মইং দং ফোং নামক পর্বতে আসবে তার উপায়ও বলে দিল। কিলিঙ্গা নামক গাছের শিকড় (যা কানে পরলে পিপীলিকার মত আকারে ছোট হয়ে যাবে) রাজকুমারকে দেবার জন্য মুনীর হাতে দিয়ে গেল।

ম-নরী মুনীকে বলল যে, তাদের দেশে যেতে হলে প্রথমে লহাখ্যাং অর্থাৎ লহা নদী পার হয়ে যেতে হবে। সেই নদীতে সকালবেলা নাগরাজের লেজের অংশটি উপরে ভেসে ওঠে— দুপুরবেলা দেহের মধ্য অংশটি উপরে ভেসে ওঠে— বিকালবেলা মাথার অংশটি ভেসে ওঠে। সময় বুঝে নাগরাজের দেহের উপর দিয়ে চড়ে নদীপার হয়ে যেতে হবে। তারপর যেতে যেতে সামনে পড়বে পদা খ্যাং অর্থাৎ পারদ নদী। সেই নদীর কাছে যাওয়াতো দূরে থাক কোন জীবের ছায়া পড়লেও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাই কিলিঙ্গা নামক গাছের শিকড় কানে পরে পিপীলিকার রূপ ধারণ করে কোন পাখির শরীরে চড়ে ঐ পদা বা পারদ নদী পার হয়ে আসতে হবে। এইভাবে বিস্তারিত যাবার উপায় বলে দিয়ে ম-নরী নিজ দেশে যাবার উদ্দেশে উড়ে গেল। যখন ম-নরী আকাশের অনেক উপরে উঠে গেছে— তখন উপর থেকে তার স্বামীকে সৈন্যদল-সহ পতাকা উড়িয়ে ফিরে আসতে দেখেছে। কিন্তু এত উপর থেকে আর নীচে নেমে আসা সম্ভব নয়। তাই নিরুপায় হয়ে উড়ে গেল।

রাজপুত্র সুথানো যুদ্ধে জয় লাভ করে দেশে ফিরে এসেছে। তাই রানী পাত্রমিত্র সবাই খুশি। এদিকে সুথানো ঘরে এসে দেখে যে তার সবচেয়ে প্রিয় আপনজন স্ত্রী ঘরে নেই। মা-হারা দুধের শিশু মাকে খোঁজে কাঁদছে। স্ত্রীকে না পেয়ে সুথানো দিশেহারা হয়ে এদিকে ওদিক ঘুরে খোঁজাখুঁজি করছে। সবশেষে মাকে জিপ্সেস করে ম-নরী রাজবাড়ি ছেড়ে যাবার কারণ বিস্তারিতভাবে জানতে পারল। রাজা নিজেই দোষ স্বীকার করে বলল যে, একমাত্র বংশধর ছেলেকে হারাবার ভয়ে ম-নরীকে বলি দেবার জন্য আদেশ করেছিলেন। কারণ পুরোহিত বলেছে যে, দেবীর রক্ত দিয়ে পূজা না দিলে ছেলে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হবে। রানীমা বললেন যে, তার আদরের কন্যাতুল্য পুত্রবধূ ম-নরীকে যাতে বলি দিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করে তাকে রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে অনুমতি দিয়েছেন। সুথানো ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের শাস্তি দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবার আদেশ দিলেন। রাজপুত্র সুথানোর মনে শাস্তি নেই — ঠিকমত খাওয়া দাওয়াও করছে না। আনন্দমুখর রাজবাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এল।

তারপর একদিন মা-বাবা থেকে অনুমতি নিয়ে সুথানো ম-নরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

ছেলের দুরবস্থা দেখে রাজা ও রানী অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু কোথায় তাঁকে খুঁজবে! জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একদিন মুনীর আশ্রমে উপস্থিত হলো। সম্যাসী রাজপুত্র সুথানোকে ম-নরীর দেওয়া আংটি ও কিলিঙ্গা শিকড় দিল। কীভাবে মইং দং ফোং নামক পর্বতে যেতে হবে তার উপায় বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বলে দিল। সুথানো ম-নরীর আংটি পেয়ে আশার আলো দেখতে পেল। নূতন উদ্যম নিয়ে সুথানো এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে সামনে পড়ল লহা খ্যং নামক বিশাল নদী। সেই নদীতে মুনীর নির্দেশ মতো সকালে নাগরাজের লেজ উপরে ভেসে উঠল। সুথানো সেই লেজের চড়ে নদীর খানিকটা অংশ পার হল। দুপুরবেলা নাগের দেহের মধ্যম অংশ নদীর উপর ভেসে উঠল। রাজপুত্র তার উপর উঠে পার হল। তারপর বিকালবেলা নাগরাজের মাথার অংশ ভেসে উঠল — সুথানো তখন তার উপর দিয়ে হেঁটে নদী পার হল। এইভাবে আঁকাবাঁকা গিরি অরণ্য পার হয়ে যেতে যেতে আবার সামনে পড়ল পদাং খ্যং - অর্থাৎ পারদ নদী। যে নদীতে পড়লে ছাই হয়ে যাবে। কোন জীবের ছায়া পর্যন্ত নদীতে পড়তে পারে না। তাই সেই নদী কেউ পার হয়ে মই দং ফোং নামক পর্বত বা স্বর্গে যেতে পারে না। সুথানো বিরট একটি গাছের ছায়ায় বসে ভাবছে কীভাবে এই নদী পার হব। সেই সময় গাছের উপরে ঈগল ছানা বাসায় মা বাবার অপেক্ষা করছে আর বিশাল একটি সাপ ঈগল পাখির ছানাকে খাওয়ার জন্য গাছের উপরে উঠছে। ছানা দুটি ভয়ে কাতর ভাবে বাবা মাকে ডাকছে। তৎক্ষণাৎ সুথানো তার ধারালো তলোয়ার দিয়ে সাপকে মেরে ফেলল। এবং টুকরো টুকরো করে কেটে পাখির ছানাকে খেতে দিল। ছানা দুটি পেট ভরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিটিংগ্লাং আবো আমা বিশাল আকৃতির ঈগল পাখি (স্বামী ও স্ত্রী) বাচ্চাদের জন্য খাবার নিয়ে যখন ফিরে আসে বাচ্চাদের ডাক না শুনে প্রথমে ভয় পেয়ে গেছে। তারা ভাবল কারা যেন তাদের বাচ্চাকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু বাসায় এসে দেখে যে তারা পেট ভরে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে আছে। কিটিংগ্লাং নামক পাখিদ্বয় বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞেস করল যে, কীভাবে কোথা থেকে খাবার পেয়েছে। বাচ্চারা তখন বিস্তারিত ভাবে বলল যে, এক মানুষের দ্বারা প্রাণে বেঁচে খাবার পেয়েছে। কিটিংগ্লাং বাচ্চার মার সুথানোর প্রতি খুব করুণা হল এবং তার এখানে আসার কারণ জিজ্ঞেস করল। রাজপুত্র বলল, মইংদং ফোং পর্বতে তার স্ত্রী ম-নরীর কাছে যাবার জন্য এখানে এসেছে। কিটিংগ্লাং বলল যে, তারা রোজ মইং দং ফোং পর্বতে খাবার খেতে যায়। এখানে পূজা দেওয়ার পর প্রসাদগুলি বাইরে ফেলে দেয়। সেই প্রসাদ খেতে রোজ যাই। সুথানো এই কথা শুনে কিটিংগ্লাং মাকে অনুরোধ করল তাকে নিয়ে যাবার জন্য। কিটিংগ্লাং বাচ্চার মা বলল যে, তুমি যদি ছোট শরীর ধারণ করতে পারো তাহলে আমার ডানার ফাঁকে ঢুকে চলে যেতে পারবে। সুথানো কিলিঙ্গা হুঙ্গ নামক শিকড়টি কানে ঝুঁজে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পিপীলিকার রূপ ধারণ করল। কিটিংগ্লাং মায়ের ডানার ফাঁকে ঢুকে গেল। সকাল বেলা বাচ্চাদের বাসায় রেখে মইংদং ফোং নামক পর্বতে যাবার উদ্দেশ্যে পদাং খ্যং নদীর উপর দিয়ে কিটিংগ্লাং স্বামী ও স্ত্রী উড়ে গেল। স্ত্রী পাখি ভাল করে উড়ে যেতে পারছে না শরীর বেশ ভারী মনে হচ্ছে — তাই তার স্বামীকে বলছে তার পাখার সঙ্গে মিলিয়ে যাতে নিয়ে যায়। কিটিংগ্লাং স্ত্রীর তুলনায় স্বামী ভীষণ মেজাজী। সে বার বার বউকে কোন কীট ডানায় আটকে

আছে কি না ঝেড়ে ফেলতে বলে। বউ কষ্ট করে হলেও সুথানোকে ডানার ফাঁকে আগলে রেখে মইং দং ফোং পর্বতে পৌছে যায়। সুথানো পুনরায় মানুষের রূপ ধারণ করে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। সুথানো দেখল যে একদল যুবতী গান গেয়ে জল তুলতে যাচ্ছে। যুবতী দলের মধ্যে নেতৃস্থানীয় একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করে সুথানো জানতে পারল যে, ম-নরীকে স্নান করাবার জন্য ল নিতে যাচ্ছে। রাজপুত্র অবাক হয়ে প্রশ্ন করল কেন এতঘটা করে স্নান করাবে? যুবতী উত্তর দেয়, ম-নরী মর্ত্যলোকে মানুষের সঙ্গে সহবাস করে তার সারা অঙ্গে মানুষের গন্ধ করছে। সেই গন্ধকে দূর করাবার জন্য এই স্নানের আয়োজন করা হয়েছে। সুথানো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলে যে এই মেয়েটির কলসী যেন আমি নিজ হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত সে-কলসী কাঁখে নিতে অক্ষম হয়। কলসী এত ওজন হয়েছে যে মেয়েটি কোন রকমে কাঁখে তুলতে পারছে না। তখন বাধ্য হয়ে সে সুথানোকে সাহায্য করার জন্য ডাক দেয়। সুথানো সানন্দে কলসীটি তুলে দিল এবং কলসীর ভিতরে ম-নরীর দেওয়া আংটি রেখে দিল। সেই আংটিটি ম-নরীকে স্নান করাবার সময় তার কোলে টুপ করে পড়ল। ম-নরী আংটি পেয়ে বুঝতে পারল যে তার স্বামী তাদের দেশে এসে পড়েছে। শীত করার ভান করে ম-নরী তাড়াতাড়ি স্নানের পর্ব শেষ করে দিল এবং সুথানোকে ডেকে আনল। কিন্তু দেব তোমরাজা মর্ত্যবাসী রাজপুত্র সুথানোকে কোন মতেই মেয়ের জামাই রূপে গ্রহণ করতে রাজি নন। তোমরাজাকে সুথানো কয়েকটা পরীক্ষা করার কথা বললেন যে, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তবেই তার হাতে মেয়ে সমর্পণ করবেন। উত্তীর্ণ হতে না পারলে প্রাণে মেরে ফেলবেন এও বললেন।

প্রথম পরীক্ষা :

কাঠের দেওয়ালের মধ্যে সাতটি আঙুল ঢোকার মত ছিদ্র থাকবে। সেই সাতটি ছিদ্রের মধ্যে ম-নরীর আবার সাত বোনের একটি করে আঙুল থাকবে। দেওয়ালের অপর প্রান্ত থেকে শুধু আঙুল ধরে চিহ্নিত করতে হবে কোন আঙুলটি তার স্ত্রী ম-নরীর আঙুল।

সুথানো বার বার ভগবানকে ডাকতে লাগল যাতে সে সঠিক স্ত্রীর আঙুলটাই ধরতে পারে। কারণ সব আঙুল একই রকম মনে হচ্ছে তার কাছে। তখন স্বয়ং ইন্দ্রদেব মাছির রূপ ধারণ করে ম-নরীর আঙুলে গিয়ে বসল। সুথানো সেই আঙুলটি ধরল।

দ্বিতীয় পরীক্ষা :

তোমরাজার সাত মেয়ে আকাশে উড়বে। সেই সাতটি পাখিদের মধ্য থেকে ম-নরীকে তীর মেরে ফেলতে হবে। ম-নরীর দিদিদের সঙ্গে যুক্তি করে ঠিক করল যে, ছয় বোন দিদিরা এক সাথে উপরের স্তরে উড়তে থাকবে, ম-নরী উপরে একা আলাদা ভাবে উড়বে যাতে তাকে লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে পারে।

সঠিক সময়ে সাতবোন পরী উড়তে আরম্ভ করল। তাদের যুক্তি অনুযায়ী ম-নরী আলাদা ভাবে উড়তে থাকে আর সুথানো মাউসা অনায়াসে তীর মেরে বউকে নীচে নামিয়ে দিল।

তৃতীয় পরীক্ষা :

ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধেও সুথানো জয় লাভ করল।

এমনি করে প্রত্যেক পরীক্ষায় সুথানো জয় লাভ করল। তোস মহারাজ খুশি হয়ে তার কনিষ্ঠ কন্যা ম-নরীর সাথে পুনরায় বিবাহের আয়োজন করলেন। রাত্রিকালে সুসজ্জিত সোনার পালঙ্কে ফুলশয্যা বা ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিল। মহারাজ দেব তোস মেয়ে ও জামাইকে ঘুমন্ত অবস্থায় মর্ত্যলোকে তথা রাজবাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ভোরবেলা ম-নরী ঘুম থেকে জেগে পাখির ডাক, মোরগের ডাক, মং সাইংজোয়ী নামক কাঁসর ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনতে পেল। পূজার ধ্বনি এইসব শব্দ শুনে ম-নরী জানতে পারল যে, এক রাত্রিতেই মর্ত্যলোকে এসে পৌঁছে গেছে। তাই ম-নরী—

ত্রম্যালে সং সং তোয়াইং।

ত্রিবো লাং খোওয়াং-ত্রীনা মংখে সাইংলে—

এই গান গেয়ে স্বামী সুথানোকে ঘুম থেকে তুলে দিল। সুথানোর মা-বাবা কেউই বেঁচে নেই। তাঁর ছেলে রাজকার্য পরিচালনা করছে। উনিও বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। মর্ত্যলোকে রাজ বাড়িতে তার মা-বাবা ফিরে এসেছে শুনে লাঠি ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে গভীর আগ্রহে দেখতে এল। কী আশ্চর্য্য! মা ও বাবা এখনও যুবক যুবতীর মত দেখতে। অথচ তাদের সন্তান বৃদ্ধ হয়ে লাঠি ভর করে হাঁটতে হয়! ম-নরী সেই বৃদ্ধ পুত্রকে কোলে তুলে আবার বুকের দুধ খাওয়াল, বৃদ্ধ পুত্র মায়ের পরশে পুনরায় শিশুতে পরিণত হল। মহাধুমধাম করে উৎসব উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সুথানো রাজ সিংহাসনে বসলেন। দীর্ঘদিন ধরে সুখে শান্তিতে রাজ্য শাসন করলেন।

প্রথাগত সামাজিক আইনকানুন এবং শাসন ব্যবস্থা

সমাজে বাস করতে হলে চাই সমাজ কল্যাণ চেতনাবোধ এবং এই চেতনাবোধই শেষপর্যন্ত সমাজের প্রথা রীতিনীতিকে মেনে চলতে বাধ্য করে। তখন সমাজজীবী মানুষের কাছে হয়ে ওঠে এইসব আইন কানুন রীতিনীতি পবিত্র এবং মূল্যবান। এই পবিত্র এবং মূল্যবান আইন কানুন রীতিনীতিকে লঙ্ঘন করলেই তাঁকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং উক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এইরূপ প্রাচীনকাল থেকেই মগ সমাজে সামাজিক আইন প্রচলিত আছে। এই আইন বা নিয়মনীতি বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থে মগ ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে — যার নাম মনু তামসে বা ‘মনুসংহিতা’।

আইনের বিচারকদের মগ ভাষায় বলা হয় ত্রাসুগ্রীঃ, প্রধান বিচারপতিকে বলা হয় ত্রাসুঃ গ্রীগগ্রি।

এই সামাজিক আইনে মগ ভাষায় ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ নিম্নে দেওয়া হল।

ত্রাপোয়ে — আদালত।

ত্রাঃ ছোঃ — মামলা, দাইং-দণ্ড।

আয়ঃ — জরিমানা, জেঃ পোওয়ে — প্রায়শ্চিত্ত।

পোয়েনি পোয়েসা — আদালত কর।

পোয়েরা মাংগ্যা — অভিযোগ ফি।

ত্রাঃ সুঃগ্রী — বিচারক, মাউ সাইং — দূত।

জ্যাপ্যাঃ — সমাজ চ্যুত।

আস্রা আসং পোয়ে — বিবাহ অনুষ্ঠান।

প্রতিটি মগ রোওয়া বা পচ্চু অর্থাৎ গ্রামে একটি করে রোওয়া আদালত থাকে। এক একটি আদালতে একজন ত্রাসমাগ্রী থাকেন। সাধারণত গ্রামে জোতদার, তলুকদার কিংবা সর্দার তারাই ত্রাসমাগ্রীঃ হয়ে থাকেন। অধিকাংশ ত্রাসমাগ্রীঃ বা নিজস্ব হরফে লিখিত ভাষায় শাস্ত্রজ্ঞ সামাজিক দোষমুক্ত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও দণ্ডবিধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বটেন। প্রথাগত আইন ও বিচার ব্যবস্থা দু-ধরনের হয়ে থাকে।

১) প্রথম স্তরের ক্ষেত্রে ছোটখাট বিবাদ বাগড়ার মীমাংসার কাজ করা হয়। দণ্ড বা জরিমানা করতে পারে না। সেই রূপান্তর হল পচ্চু ত্রাসফাং বা গ্রাম আদালত।

২) দ্বিতীয়টি মহকুমাভিত্তিক আদালত যেখানে বিচারের রায় থেকে আরম্ভ করে দোষীদের শাস্তি, জরিমানা ইত্যাদি দণ্ড প্রদান করতে পারে। এটি রোওয়া বা পচ্চু আদালতের তুলনায় উচ্চ

আদালত — দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমায় ছিল বলে সন্ধান পাওয়া যায়।

আইনের সীমা :

১) এই আইন কেবলমাত্র মগ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

২) দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলা এই আইনে বিচার করা হয়।

৩) খুন ও ডাকাতির মামলা ছাড়া সামাজিকগত সমস্ত প্রকার মামলা এই আইনে বিচার করা হয়।

অভিযোগ অবিচারের নিয়ম :

প্রচলিত সাধারণত অভিযোগকারী মৌলিকভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়ে পচু ত্রাসুংগ্রীর কাছে বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ৫টাকা থেকে ১০টাকা (রূপার মুদ্রা) মাংজা দিয়ে। ত্রাসুংগ্রী বা বিচারকও মৌলিকভাবে বিচারের দিন ধার্য করেন এবং নির্দিষ্ট তারিখে অর্থাৎ বিচারের দিন মাং সাইং বা দূত পাঠিয়ে বিবাদীকে ডেকে বিচার সভায় উপস্থিত করান। সমাজে দাগী অপরাধী বা সমাজদ্রোহীদের ক্ষেত্রে একবারে অনেক সংখ্যক দূত পাঠিয়ে অপরাধীদের ধরেবেঁধে বিচার সভায় উপস্থিত করা হয় তখন, যখন বিবাদী বিচারকের হুকুম অমান্য করে। বিচারের দিন গ্রামে কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কারবারী। তিনি বাদী ও বিবাদীকে ঘটনার বিবরণ জিজ্ঞেস করেন, সাক্ষী থাকলে তাও বিচার সভায় উপস্থিত করান। প্রয়োজনে কিংজা বা হলফ ধরান। তবে কিংজা বা হলফ প্রয়োজন কিনা তা বিচারকই চূড়ান্তভাবে রায় প্রদান করেন। প্রয়োজনে দাগী অপরাধী বা সমাজদ্রোহীকে থানায় জমা দেওয়া হয়।

দণ্ডবিধি :

মগ সামাজিক প্রথাগত আইনে প্রায় সব অপরাধের ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড ও বেত্রদণ্ড প্রচলিত আছে। বিশেষ অপরাধীকে বেত্রাঘাত দেওয়ার নির্দেশ ছিল। আবার কিছু কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্তকরণ নিয়ম আছে। অর্থদণ্ড তিন রকমের আছে।

১। জরিমানা ২। ক্ষতিপূরণ (আয়ঃ) ৩। বিচার সভায় ব্যয়ভার বা আদালত কর (পোয়েনি পোয়েসা)। জে পোওয়ে বা প্রায়শ্চিত্তকরণের ক্ষেত্রে কোন অর্থদণ্ড ধার্য করা হয় না।

জরিমানা দণ্ড :

১। এই দণ্ড অপরাধীর অপরাধের মাত্রানুযায়ী ধার্য করা হয়।

২। পরাজিত পক্ষের উপর ধার্যকৃত জরিমানার টাকা আদালতে জমা রাখা হয়। আর ক্ষতিপূরণের পুরো টাকা বাদী বা বিজয়ী পক্ষকে দেওয়া হয়।

ক্ষতিপূরণ দণ্ড (আয়ঃ) :

১। ক্ষতির জন্য দায়ী বা মামলায় পরাজিত পক্ষের উপর ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী এই দণ্ড ধার্য করা হয়।

২। ক্ষতিপূরণের জন্য দণ্ডিত সম্পূর্ণ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হয়।

বিবাহ আইন :

পরিবার গঠনে প্রাথমিক স্তর হল বিবাহ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সামাজিকগত কতকগুলি বিধি নিষেধ আরোপিত। শাস্ত্রীয় মনুসংহিতা বা মনুতেমসে গ্রন্থে অন্তর্গত লগাম্যাকুং (সংসার তত্ত্ব) — এর মতে পুরুষানুক্রমিক রক্ত সম্পর্কীয় পিতৃ ও মাতৃ বংশের কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কিত কন্যা/মাতৃ স্থানীয় আত্মীয়া যেকোন নারীর সহিত যৌন মিলন কিংবা বিবাহ সম্পূর্ণ অবৈধ ও অশুদ্ধ। তাই সম্পর্কের তারতম্য অনুসারে কৃত অপরাধের পরিমাপকে একটি কুমোড় বা একটি লাউ-র সম্পূর্ণ অংশ, তিন চতুর্থাংশ, দুই চতুর্থাংশ অথবা এক চতুর্থাংশ পচে যাবার ন্যায় ৪(চার) প্রকার আইনের অনুশাসনে বিচার করা হয়। এই অনুযায়ী নারীকে মোট ৪(চার)টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

প্রথমত :

বিবাহের যৌন মিলনের ১০০ভাগ বা পূর্ণ ভাগ অবৈধ যেসকল নারী (অলুংবুঃ) —

- ১) গর্ভধারিণী মা, ২) সৎমা, ৩) মাতৃসম বা মাতৃসহোদরা, ৪) নিজ কন্যা, ৫) নিজ পুত্র বধু, ৬) কাকীমা ৭) জ্যেষ্ঠীমা, ৮) ভ্রাতৃপুত্র বধু, ৯) সহোদর বোন (অগ্রজা), ১০) সহোদর ভাই (অনুজ) এর স্ত্রী, ১১) পিতৃব্য পুত্র (কাকাতো, জ্যেষ্ঠাতো ভাই) —এর স্ত্রী, ১২) পিতার ঔরসজাত (অনুজ) —এর স্ত্রী।

দ্বিতীয়ত :

৭৫ % বা তিন চতুর্থাংশ অবৈধ যেসকল নারীঃ- (সুংজিবুঃ)

- ১। মামীমা (মাতৃ সহোদর ভাই-এর স্ত্রী, ছোট ও বড়);
- ২। সৎমার ভগ্নী (ছোট ও বড়);
- ৩। জ্যেষ্ঠ (স্ত্রীর বড় বোন);
- ৪। স্ত্রীর সহোদর ভাই অথবা বোনের কন্যা।

তৃতীয়ত :

৫০% বা দুই চতুর্থাংশ অবৈধ যেসকল নারী (তাপ্ত্রেংবোউ) —

- ১। সৎ পিতার ভগ্নী;
- ২) মাসতুতো বা পিসতুতো ভাই (কনিষ্ঠ) —এর স্ত্রী;
- ৩) মাসী বা পিসির ননদ এবং ভাসুর ও দেবরের স্ত্রী;
- ৪) ভাইরার ভাই/বোনের কন্যা।

চতুর্থত :

তাজোয়ী বুউ,

২৫% বা এক চতুর্থাংশ অবৈধ যেসকল নারীঃ- (তাজী বোউ) —

- ১। মাসী বা পিসির ননদের ননদ, ভাসুর বা দেবরের স্ত্রী;
- ২। ভাইরার ভাই বা বোনের কন্যার ননদ;
- ৩। মাতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তনয়া/কন্যা।

ক) পুরষানুগ্রমিক রক্ত সম্পর্কীয় বলতে কমপক্ষে ৪(চার) পুরুষ পর্যন্ত ধারাবাহিকতাকে বোঝায়। সম্পর্কের এই ধারাবাহিক ৪(চার) পুরুষ পরবর্তী বংশধরদেরও বজায় থাকে যখন আত্মীয়তার মূলসূত্র পাওয়া যায় কিংবা সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

খ) অবৈধ সম্পর্কিত নারীর সহিত বিবাহ কিংবা যৌন মিলনজনিত অপরাধ সম্পূর্ণরূপে সমাজচ্যুত (জ্যাঃপ্যাঃ) বলে গণ্য করা হবে।

গ) এ ধরনের ক্ষেত্রে সমাজচ্যুতির সাথে সমাজের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

ঘ) সমাজচ্যুতকে গ্রাম থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে যদি না সে জ্যাঃ পোয়ে বা প্রায়শ্চিত্ত করে।

প্রায়শ্চিত্তকরণ বা জেঃ পোয়েঃ

প্রায়শ্চিত্তযোগ্য অবৈধ বিবাহ কিংবা বা যৌন মিলন আইনত দণ্ডনীয় এবং এই ধারা অনুযায়ী অবৈধ সম্পর্কিত যেকোন যৌন মিলন জেঃ পোয়ে প্রায়শ্চিত্ত বাধ্যতামূলক।

১) অবৈধ যৌন ঘটিত অপরাধ ১০০ % পূর্ণভাগ হলে সম্পূর্ণরূপে সমাজচ্যুত (অলুংবোঃ জ্যাঃ প্যাঃ) হিসেবে বিবেচিত হয় এবং নিম্নরূপে জ্যাপোয়ে (প্রায়শ্চিত্ত) করতে হয়। জ্যাপোয়ে বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পরিশুদ্ধ করতে হলে প্রথমে মৃতদেহ সংস্কারের পূর্বে মৃতদেহকে যেভাবে আচরণ করা হয় সেইরূপ আচরণ বিধি পালন অবশ্যস্বাবী। পরে গ্রামের বাইরের ভাঁটি নদীর ধারে পৃথক পৃথক শূকরের খাঁচার ঢুকিয়ে শূকরের ন্যায় আচরণ করে, খাঁচার উপর থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষু (কমপক্ষে চারজন) র স্নান এর জলে ধৌত করে নেওয়া হয়। তারপর খাঁচার বাইরে এনে বৈদ্য বা পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপাঠ করা জলে মাথা ধৌত করে নিয়ে নদীর জলে স্নান সেরে নিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ ও মঙ্গল স্তোত্র শ্রবণ করানো হয়।

প্রথম পর্বের অনুষ্ঠান শেষ করে একই দিনে মাথা মুগুন করে নতুন মাটির পাত্রে মন্ত্রপাঠ করা সাত প্রকার বনজ ও পশারী মিশ্রিত জল প্রায়শ্চিত্তকারীদের আপাদমস্তক ধৌত করে অবশিষ্ট জল প্রায়শ্চিত্তকারীদের ঘরে ছিটিয়ে চারজন ভিক্ষু দ্বারা গৃহশুদ্ধ করিয়ে নেওয়া হয়। তারপর প্রতিবেশীদের অন্নভোজন দিয়ে মনুষ্য সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করে।

২) তিন-চতুর্থাংশ ও দুই-চতুর্থাংশ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের নিয়মাবলী মৃতের ন্যায় আয়োজন ব্যতীত অন্যান্য অনুষ্ঠান ১০০ ভাগের অনুরূপ।

৩) এক-চতুর্থাংশ বা ২৫ শতাংশ অপরাধের ক্ষেত্রে খাঁচা নির্মাণের প্রয়োজন নেই। তবে নং (১) ও নং (২) এর অনুরূপ বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ ও মঙ্গল স্তোত্র শ্রবণ করতে হবে। তারপর গৃহশুদ্ধিকরণ, ভোজের আয়োজন ১০০ ভাগের অনুরূপ।

৪) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি (ওয়াছুলাঃব্রেই) থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি (ওয়াগ্যেয়েলাঃ ব্রেই) পর্যন্ত অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু বর্ষাবাসকালীন বিবাহে আবদ্ধ হলে অশুদ্ধ বিবাহ বলে গণ্য করা হয়।

ক) এই ধরনের বিবাহ হলে পঞ্চশীল গ্রহণ ও মঙ্গল স্তোত্র শ্রবণ করতে হবে এবং ছোয়াইলং পোয়ে অন্ন ভোজনদান অনুষ্ঠান করতে হবে।

খ) বর্ষাবাসকাল অর্থাৎ আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি (ওয়াগাই লাঃরে) পর্যন্ত বিচ্ছেদ করে থাকতে হবে এবং উক্ত তিথির শেষে যেকোন দিন পূর্ববার বিবাহ অনুষ্ঠান করতে হবে।

গ) উপরিউক্ত 'ক' ও 'খ' নং উপধারা আইন অমান্যকারীকে সমাজচ্যুত বলে গণ্য করা হয়।

৫) উভয় পিতামাতার যৌথ উদ্যোগে বিবাহ হলে দাফার পরিবর্তে নুঃ আখাঃ (মায়ের দুধের দাম) রূপার মুদ্রা ৩০ (ত্রিশ) টাকা দিতে হয়। তবে তা কন্যা কুমারী অবস্থায় ও প্রথম বিবাহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

৬) বিবাহের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে যেকোন পক্ষকে ৫০১/ (পাঁচশত এক) টাকা জরিমানা ও আয়োজনের যাবতীয় খরচের দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ক) বরপক্ষ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে ৬নং ধারা আইন প্রযোজ্য এবং দেয়া স্বর্ণবস্ত্র ফেরত পাবে না।

৭) পিতামাতার অগোচরে বিবাহ হলে দাফা আইন প্রযোজ্য। ছেলের পক্ষের পিতামাতা মায়ের পক্ষে অভিভাবককে তাদের দাবী ও নুযায়ী সাধ্যমত 'দাফা' বা টাকা জরিমানা দিতে হয়।

ক) সালিস দরকার হলে পৈরাঃ মাঃ জাঃ ৫১ টাকা ও অন্যান্য আদালত কর দিতে হয়।
বিবাহ বিচ্ছেদ ও খোরপোষ আইন :

মগ সামাজিক প্রথাগত আইনে খো পোষ আইন বলবৎযোগ্য। এই আইন মোতাবেক স্বামী বিনা কারণে স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করলে, দ্বিতীয় বিবাহ করলে —

১। স্বামীর স্বাবর ও অস্বাবর সমস্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার আইন অনুরূপে বণ্টনযোগ্য — যখন সন্তানগণ মায়ের সাথে বাস করে।

২। স্ত্রী ব্যতিচারিণী হলে, স্বেচ্ছা বিনা প্ররোচনায় স্বামীর ঘর করার অসম্মতি প্রকাশ করলে কিংবা পর পুরুষের সাথে পালিয়ে গেলে স্বামী তার স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করতে পারে। এক্ষেত্রে স্বামীর উপর খোরপোষ আইন প্রযোজ্য ন।

৩। উভয় পিতা - মাতার যৌথ উদ্যোগে বিবাহ দেবার কিছু দিনের মধ্যে ছেলে তার স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করতে চাইলে স্ত্রী শরীর মূলের পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়, নতুবা বিচারকের বিবেচনার উপর শাস্তির বিষয় নির্ভর করে

৪। সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর ঘর করার অসম্মতি দিলে কিংবা অন্য পুরুষের সাথে পালিয়ে গেলে জরিমানা — সহ বিয়েতে যাবতীয় খরচ স্ত্রীকে অবশ্যই দিতে হয়।

মাতালের শাস্তি :

১) বুদ্ধ মন্দিরের ও বৌদ্ধ বিহারে সীমানার অভ্যন্তরে মদ্যপান করলে, কিংবা মদমত্ত হয়ে অনুপ্রবেশ করলে, অথবা বৌদ্ধদের পালনীয় ধর্মীয় উৎসব ও পার্বণগুলিতে মদ্যপান করলে, মদ্যপায়ীর মাথার চুল কেটে ভিক্ষুর কাছে মঙ্গল স্তোত্র পাঠ শ্রবণ, ও পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়।

২) মাতলামিতে অপরের ক্ষতি করলে ক্ষতির পরিমাণ মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

ব্যভিচার :

১। বিবাহিতা স্ত্রীর অপহরণে অপহৃতার স্বামীর পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থাভিত্তিক (নিকট মধ্যম, ও উৎকৃষ্ট) যথাক্রমে ১,০০০- ৫০০০ টাকা দণ্ডরূপে অপহরণকারীকে দিতে হয়।

ক) এ ধরনের ঘটনা বলপূর্বক হলে অপহরককে অর্থদণ্ড-সহ ২৫বার বেত্রাঘাত দেওয়া হয়।

২। বলপূর্বক অবিবাহিতা কন্যা অপহরণে অপহরণকারীকে ১,৫০০ টাকা ও ১০ ঘা বেত দণ্ডনীয়।

৩। বিবাহিতা পরস্ত্রীর নিকট গমন করলে অপরাধীর উপর নগদ ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড করা হয় এবং ৫ ঘা বেত দেওয়া হয়।

ক) এ ধরনের ঘটনার প্রমাণসাপেক্ষে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই প্রত্যেকে ৫ ঘা বেতদণ্ড পাবে।

খ) অশালীন বা স্ত্রীলতাহানির চেষ্টা করলে কেবল ৫০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

৪। বিবাহিতা পরস্ত্রীকে বলাৎকারে অপরাধীর উপর নগদ ১,০০০ টাকা ও ১০ ঘা বেতদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

৫। অবিবাহিতা কন্যার উপর বলাৎকারে অপরাধী ২৫ ঘা বেত ও ৬,০০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয়।

ক) এধরনের ঘটনায় কন্যার বিবাহে সম্মতি থাকলে ও সম্পর্কে বৈধতা প্রশ্নে বাধা না থাকলে, ধর্মিতার সহিত বলাৎকারীর (ধর্মক) বিবাহ অবশ্যসম্ভাবী।

খ) এক্ষেত্রে আদালত কর ব্যতীত বেতদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রযোজ্য হবে না।

৬। ১৩ বৎসরের অনুর্ধ্ব নাবালিকা কন্যার উপর বলাৎকার হলে অপরাধী অনূন্য ২৫ ঘা বেত ও ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় এবং প্রয়োজনবিশেষে চিকিৎসা বাবদ প্রয়োজনীয় খরচ বহনযোগ্য।

৭। অবৈধ গর্ভধারণ করা হলে মগ সামাজিক আইনানুযায়ী বিবাহ বাধ্যতামূলক যদি সম্পর্কে বৈধতা প্রশ্নে বাধা না থাকে।

কিন্তু বিবাহে বৈধতা প্রশ্নে বাধা থাকলে — সমাজে জেঃ প্যা বা সমাজচ্যুতি হিসাবে ধরা হবে। এক্ষেত্রে জেঃ পোওয়ে বা প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে প্রবেশ করতে হয়।

চুরি সংক্রান্ত আইন :

যদি কোন পথিক, অসুস্থ ব্যক্তি কিংবা ভিক্ষাজীবী কোন ব্যক্তি, কাঙাল মালিকের অজ্ঞাতসারে সীমিত কাঁচামাল চুরি করে তবে সেই সব চুরিকে চুরির পর্যায়ে অভিযুক্ত করা হয় না।

এছাড়া ধান ও বিভিন্ন ফসল হাঁস, মোরগ, গরু, ছাগল, শূকর ইত্যাদি পশু-পাখি, গাছপালা, কাঠসামগ্রী, স্বর্ণ-রূপা অলংকারাদি ইত্যাদি চুরি করলে — চুরির অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা দিতে হয়। তবে দুর্ভিক্ষ বা মহামারিকালীন কোন নিঃস্ব ব্যক্তি চুরি করলে,

তা বিবেচনাধীন হয়।

ঝগড়া, বিবাদ কার্যাদির আইন :

১। বিনা প্ররোচনায় কুবাক্য বা অশালীন ভাষা প্রয়োগে ৫টি রৌপ্য মুদ্রার মূল্যের পরিমাণ টাকা জরিমানা প্রদেয়।

ক) বিনা প্ররোচনায় প্রহারে পরিমাণ টাকা জরিমানা দিতে হয়।

খ) কোন মহিলার উপর আক্রমণমূলক আক্রমণে মহিলা আহত হলে আক্রমণকারী পুরুষকে ৩৫টি রৌপ্যমুদ্রা মূল্যের জরিমানা দিতে হয় এবং চিকিৎসার জন্য ব্যয়ভার বহন করতে হয়। এর বিপরীত ক্ষেত্রে মহিলা আক্রমণকারী হলে, ৩০টি রৌপ্যমুদ্রার মূল্যে টাকা জরিমানা দিতে হয়।

গ) মহিলা-মহিলা ও পুরুষে-পুরুষে মারপিট করে আহত করলে আহতকারীকে যথাক্রমে ১০-১৪টি রৌপ্যমুদ্রা জরিমানা এবং কোন একটি অঙ্গহানি হলে তার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

২। গৃহপালিত পশুপাখি ইত্যাদি মেরে ফেললে জরিমানাস্বরূপ পশু বা পাখির মূল্যের পরিমাণ জরিমানা দিতে হয়।

৩। গাছপালা বৃক্ষ ও ফসল নষ্ট করলে তার ২ গুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

মৃতের সৎকার :

১। অমাবস্যা কিংবা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে যেমন বজ্রাঘাতে, কলেরায়, আত্মহত্যা ইত্যাদিতে মৃতদেহটিকে দাহ সৎকারের পরিবর্তে মাটিতে কবর দিতে হয়।

২। অমাবস্যা তিথিতে স্বাভাবিক মৃত্যু হলে গুরুপক্ষের প্রতিপদের আরম্ভ হবার আগেই মাটিতে কবর দিতে হয় অথবা দাহ করতে হয়।

৩। অমাবস্যা তিথি শনি কিংবা মঙ্গলবারে হলে এবং ঐ সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে দেহটি গুরুপক্ষ আরম্ভের পূর্বে উপুড় করে কবর দিতে হয়। মগ ভাষায় তাকে বলা হয় শ্রিং তলা সাংগ্রো।

৪। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে মৃতদেহকে সুসজ্জিত বাক্স (ছংবাই)—এর মধ্যে রাখা বিধিসম্মত নিষিদ্ধ।

৫। নিজ গ্রামের বাইরে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হলে মৃতদেহটিকে সংশ্লিষ্ট গ্রামে প্রবেশ করানো দোষনীয়।

৬। স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে জাঁকজমকভাবে দাহ-সৎকার বা অত্যন্তিক্রিয়া অনুষ্ঠান করা হয়।

৭। মৃত্যুর ৭ দিনের খহুংরাঃ ছেইং বা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অবশ্যই করতে হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ৭ দিনের আগেও করানো যায়।

আইনত পালনীয় :

১। ওয়াছুলাঃলাব্রে (আষাঢ় পূর্ণিমা) তিথি থেকে ওয়াগ্রো লাঃলাব্রে (আশ্বিন পূর্ণিমা)

এর মধ্যে মগ সমাজে বিবাহ কিংবা নূতন বসত বাড়ি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ।

২। নূতন ঘর তৈরি করলে ঐঘর বসবাসের আয়োগ্য বলে গণ্য করা হয়। কিংবা ঐ ঘরের অন্নজল অন্যলোকেরা গ্রহণ করবে না।

৩। পিতা-মাতা, গুরু ও গুরুমাতাদের প্রতি প্রহার করলে আইনত গুরুদণ্ডনীয় অপরাধ।

ক) এই অপরাধে প্রহারকারীকে ১০-১৫ ঘা বেত দণ্ডনীয়।

খ) মাথার চারপাশে চুল কেটে দিয়ে এই অবস্থায় গ্রামে চক্কর দিতে আদেশ দেওয়া হয়।

গ) ঐ দিন থেকে সাত দিনের জন্য মন্দিরে শ্রমণ বা ভিক্ষুজীবন গ্রহণ করতে হয় এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে অন্নসেবা (স্যাং ছেইং) অনুষ্ঠান করতে হয়।

ঘ) কোন পাইজাং বা ভিক্ষুকে গালি (অশ্রাব্য ভাষায়) দিলে উপরিউক্ত নিয়ম পালন করতে হবে।

অপরাধী যদি নিয়মগুলি পালন না করে তা হলে নিয়ম অমান্যকারীকে সমাজচ্যুত হিসেবে গণ্য করা হবে। সে কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবে না। তার সাথে সামাজিক কোন সম্পর্ক রাখা হবে না।

৬) এই ধরনের অপরাধী শ্রমণ বা ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করলেও নির্ধারিত দিনের শেষে সাধারণ মানুষ জীবনে ফিরে আসতে হবে। নিজে ভিক্ষু হিসেবে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃতি পাবে না।

উত্তরাধিকার আইন :

উত্তরাধিকার সূত্রে পৈত্রিক সম্পত্তির উপর পুত্র/কন্যাদের সমান অধিকার। এই মর্মে সকল প্রকারের উত্তরাধিকারীগণকে একই বংশধররূপে উদ্ভূত হতে হয় অর্থাৎ যে-সকল সন্তান নাতি-নাতনীগণ এক পুরুষের ব্যবধানবিশিষ্ট পিতা-পুত্র-কন্যা তারাই কেবলমাত্র উত্তরাধিকারী হতে পারবে।

আইনত : পিতা-মাতা জীবিতকালে তার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি সন্তানদের মাকে যত অংশ দিয়ে যায় পিতা মাতার মৃত্যুর পর সেই অংশ সন্তানগণ লাভ করে। তাছাড়া যার নামে উইল করে যায় সেই উইল অনুযায়ী সে-ই সম্পত্তি লাভের অধিকারী হয়।

১। মায়ের মৃত্যুতে তার সমস্ত সম্পত্তি পিতা ও পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বিভাজন :

পিতা, জ্যেষ্ঠ পুত্র $\frac{1}{8}$ অংশ। বাকি অংশ পিতা—পুত্র—কন্যারা পায় (যদি পিতা পুনঃ বিবাহ না করেন)। আবার যদি পিতা পুনঃবিবাহ করেন তাহলে জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘরসহ, সম্পত্তির $\frac{1}{8}$ অংশ প্রাপ্ত হয়।

২। পিতার মৃত্যুতে তার সম্পত্তি মা ও পুত্র/কন্যাদের মধ্যে বন্টন :

ক) জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যা স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির $\frac{1}{8}$ অংশ প্রাপ্য এবং মা ও অন্যান্য কনিষ্ঠ পুত্র/কন্যারা পাবে $\frac{1}{8}$ অংশ (যদি মা পুনঃবিবাহ না করেন)।

খ) জ্যেষ্ঠ কন্যা /পুত্র পিতার ব্যবহৃত জিনিষগুলির $\frac{1}{8}$ অংশ ও অন্যান্য সম্পত্তি ও (ঘববাদে) পেয়ে থাকে।

মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের রক্ষণাবেক্ষণকৃত সমস্ত সম্পত্তি সংপিতা $\frac{1}{8}$ অংশ, বাকি

অংশ জ্যেষ্ঠ পুত্র/বা কন্যা ও তার কনিষ্ঠ ভাইবোনেরা পায়।

দত্তক আইন :

দত্তকপুত্র ও দত্তক পিতা-মাতার নিজস্ব সন্তানগণ ও আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন আইন—

১। দত্তক পিতা-মাতা নিঃসন্তান হলে আত্মীয়গণের ও দত্তক পুত্রের মধ্যে সমবণ্টন হয়।

২। দত্তক পিতা-মাতার মৃত্যুকাল পর্যন্ত দত্তক পুত্রটি একাম্ববতী থাকলে তাদের মৃত্যুর পর নিজস্ব অর্জিত সম্পত্তি দত্তক পুত্রের মধ্যে সম বণ্টন করা হয়।

৩। দত্তক পুত্রটি এ পিতা-মাতার জীবিতাবস্থায় নিজ জন্মদাতা পিতাগৃহে স্থায়ীভাবে বাস করলে তাদের মৃত্যুর পর সম্পত্তির উপর অধিকার থাকবে না।

তিনপ্রকার সন্তানদের সম্পত্তি বণ্টন —

- ১ম প্রকার — স্বামীর পূর্ব বিবাহের সন্তান।

- ২য় প্রকার — স্ত্রীর পূর্ব বিবাহের সন্তান।

৩য় প্রকার — উভয়ের একই সন্তান।

ক) পিতা-মাতা উভয়ের মৃত্যুর পর পিতৃগৃহ থেকে আনা মায়ের সমস্ত সম্পত্তি পূর্ববিবাহের স্ত্রীর সন্তান পাবে।

খ) বিবাহকালীন পিতার সম্পত্তি পূর্ববিবাহের স্বামীর সন্তান পাবে।

গ) ঐ সম্পত্তির উত্তরকালীন অর্জিত সম্পত্তি শেষ বিবাহের সন্তান ৩/৫ অংশ ও বাকিরা ১/৫ অংশ করে প্রত্যেকে পাবে।

এই আইনের পদ্ধতি :

১। পিতার সকল মৌল সম্পত্তি প্রথমা স্ত্রীর সন্তানই অধিকার লাভ করে। আর দ্বিতীয় স্ত্রীর বিবাহকালীন পিতৃগৃহ থেকে আনীত সমস্ত সম্পত্তি দ্বিতীয় বিবাহের ঘরের সন্তানই অধিকার লাভ করে।

২। দ্বিতীয় স্ত্রীর সহিত যৌথ অর্জিত সম্পত্তি দ্বিতীয় বিবাহের ঘরের সন্তান ২/৩ অংশ, প্রথমা স্ত্রীর সন্তান ১/৩ অংশ পাবে।

৩। যদি পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীর কোন সম্পত্তি না থাকে তাহলে পিতার মৌল সম্পত্তির ১মা স্ত্রীর সন্তান ৩/৪ অংশ, দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান ১/৪ অংশ পাবে। অনুরূপ দ্বিতীয় স্ত্রীর সব সম্পত্তি ঐ ঘরের সন্তান ১/৩ অংশ ও প্রথমার ঘরের সন্তান ১/৩ অংশ পাবে।

যদিও মগ জনগোষ্ঠীদের সামাজিক শাসনব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। তবে, বর্তমানে এই প্রাচীনকালের প্রথাগত সামাজিক নিয়ম—নীতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতে গেলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধা বা বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই বর্তমান প্রজন্মের মগ জনগোষ্ঠীরা এই সামাজিক শাসনব্যবস্থা ও নীতিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন ও সংযোজন করার প্রয়াস চালাচ্ছেন।

উপসংহার

গতিশীল সমাজ ও সংস্কৃতি জলের ধারার মত অবিরাম গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে ভিন্ন ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির মহামিলনক্ষেত্রের দিকে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচিত মগ জনগোষ্ঠীদের বিভিন্ন সংস্কার, সামাজিক রীতিনীতি ও জীবনধারার বিভিন্ন দিক বর্তমানে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সান্নিধ্যে এসে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন ঘটে চলেছে। দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরী, চাকমা, রিয়াং, উচই ইত্যাদি বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর পাশাপাশি বসবাসের ফলে পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃতির আদান প্রদান হয়েছে এবং হচ্ছে। বৃহত্তর সমতল জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাবও তাদের জীবনস্রোতকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মগ জন-জাতিদের জীবনযাত্রা পরিবর্তনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই পরিবর্তিত বিষয়গুলিকে মূলত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন - (ক) অর্থনৈতিক, (খ) সামাজিক, (গ) রাজনৈতিক।

(ক) অর্থনৈতিক :

মগ জনজাতিরা অন্যান্য উপজাতিদের মতই অর্থনীতি ছিল জুম চাষভিত্তিক ও কৃষিনির্ভর। আদিমযুগে তারা স্থান পরিবর্তন প্রথা অবলম্বন করতো। অর্থাৎ এক পাহাড়ের জুমচাষ শেষ হয়ে গেলে অন্য পাহাড়ে চাষের জন্য সপরিবারে চলে যেত। তবে বর্তমানে বিভিন্ন অসুবিধা, আবার সরকারের সুযোগ-সুবিধার কারণে মগ জনজাতিরা স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। অধিকাংশ মানুষ জুমচাষ ছেড়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমতল ভূমিতে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেছেন। এছাড়াও রাজ্যের কৃষিদপ্তর ব্যাপক উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে উন্নয়নের পথে অগ্রসর করে নিয়ে চলেছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল —

শ্রীপদ্ধতি, উন্নতমানের বীজ সরবরাহ প্রকল্প, ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা, জৈবসার ব্যবহার, কৃষিযন্ত্র ব্যবহারে উৎসাহিত করা, উন্নয়নের নূতন উদ্যোগ, গবেষণামূলক কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদেরকে উৎপাদন বাড়ানোর কাজে সাহায্য করা হচ্ছে।

ওচ্ছদ প্রকল্পের মাধ্যমে উপজাতি জুমিয়াদের আর্থিক উন্নয়ন :

বনভিত্তিক কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের জুমিয়া পরিবারের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সকল জুমিয়াদের নিয়ে যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতি গাছের ব্যাপক বনায়ন। খুব পরিচিত প্রজাতির মধ্যে রয়েছে সেগুন, শাল, গর্জন, জাম, গামাই, চামল, জারুল, আগর, কাঁঠাল, বাঁশ, বেত, কফি, জেট্রোফা, মিউকানা, রাবার ও কফি, আম, আনারস অর্থকরী ফসল হিসাবে অন্যান্য উপজাতিদের মতো মগ উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসনের লক্ষ্য নিয়ে বাগান করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য দপ্তর থেকেও বিভিন্নভাবে

সাহায্য সহযোগিতা করে চলেছে যাতে জুমিয়াদের অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি হয়।

বাঁশ-বেত শিল্প :

কুটিরশিল্প জীবনে মগ জাতিদের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষণীয়। বিশেষ করে বাঁশ ও বেতের জিনিস তৈরি করার অভ্যাস প্রায় উঠে গেছে বললেও চলে। মুষ্টিমেয় বয়স্কদের মধ্যে শুধু এই কাজগুলি সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। আজকাল বিভিন্ন ডিজাইনের আকর্ষণীয় আলমারি, ট্রাস্ক, সিন্দুক ইত্যাদি সহজে পাওয়া যায়। তাই তাদের মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার জন্য ঐগুলি বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পরইং, খরাং ইত্যাদি বাঁশ-বেতের তৈরি জিনিস তেমন ব্যবহার করে না। পূর্বে মগ মহিলা পরইং (বাঁশের বুড়ি), পুরুষেরা তং (লাই) সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে যেতো। আজকাল আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যাগ, স্যুটকেস ইত্যাদি ব্যবহার করছেন। বাঁশ, বেত, কাঠ ইত্যাদি দ্বারা কুটিরশিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি লাভের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিশেষ করে রাজ্য সরকারের প্রামোদন দপ্তর স্ব-রোজগার এবং স্ব-সহায়ক দলগুলিকে পরিকাঠামোর সুযোগ সম্প্রসারণ করা ও লাভজনক করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন।

বয়ন শিল্প :

প্রাচীনকালে মগ জনজাতিরা নিজেদের উৎপাদিত কার্পাস থেকে সূতা তুলে নিয়ে বনজ ওষধী দ্বারা পছন্দ মতো রং করে নিতো, তারপর নকসা করে কাপড় বোনা হতো। বর্তমানে সহজলভ্য বাজার থেকে রং-বেরং-এর সূতা কিনে নিয়ে নিজেদের পছন্দ মতো কাপড় বুনছে। আবার বাজারপ্রাপ্ত রেডিমেট জিনিস পাওয়ার ফলে মগ জনগোষ্ঠীদের মধ্যে বয়নশিল্প প্রায় লুপ্ত হওয়ার পথে। বর্তমানে সরকার থেকে বিভিন্নভাবে সুতো, তাঁত বা আধুনিক বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতি দিয়ে তাদের সেই বয়ন শিল্পকে আবার জাগিয়ে তুলবার জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। সরকারের এই প্রচেষ্টা গ্রহণ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য বলা যায়।

মৎস্য চাষ :

বর্তমান যুগে মগ জনগোষ্ঠীদের মধ্যে মৎস্যচাষের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। স্ব-উদ্যোগে অথবা সরকারী আর্থিক সহায়তা নিয়ে অনেকেই মৎস্যচাষে মনোযোগ দিয়েছেন। মৎস্য দপ্তর রাজ্যের মৎস্য চাষী স্ব-সহায়ক দল, স্ব-উদ্যোগী বেকার যুবক যুবতীদের মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে রাজ্যের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা - ২০১০-১১ইং সনের মধ্যে মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্যে, ২০০৪-০৫ইং সন থেকে একটি সময়োপযোগী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর রূপায়ণ করে চলেছে।

পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য :

বর্তমানে মগ জনগোষ্ঠীরা পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমতলভূমিতে বসবাস করতে থাকে এবং তার সাথে সাথে গৃহ-পশুপাখি পালনের দিকেও আগ্রহ প্রবল দেখা যায়। গৃহপালিত পশুপাখিদের মধ্যে গরু, ছাগল, মোরগ, হাঁস, কবুতর, শূকর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিজস্ব উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করা ছাড়া প্রত্যক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মগ জাতিরা অনেক

পিছিয়ে আছে। শুধু দক্ষিণ ত্রিপুরায়, সাক্রম মহকুমার অন্তর্গত মনু বনকুল বাজারে মগজাতির পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট দেখতে পাওয়া যায়। এই এলাকায় অর্থ উপার্জনের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। গ্রামীণ অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ভূমিকা গুরুত্ব পূর্ণভাবে পালন করে চলেছেন। গ্রামীণ গরিব পরিবারগুলিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। এর জন্য সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে স্ব-সহায়কদল গঠন এবং স্ব-উদ্যোগী তৈরির উপর। সমাজে কিছু কিছু মগ জনজাতিরা আজকাল এই প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছে।

খ) সামাজিক :

সমতলভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস ও কৃষি পদ্ধতি পরিবর্তনের সাথে সাথে মগদের সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো তাদের দেবদেবী, ভূতপ্রেত-এর প্রতি সাধারণ বিশ্বাস থেকে পূজা পার্বণ অভ্যন্তরীণ গ্রাম-প্রশাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন। পরিবারে প্রথাগত অনুসারে সমাজের কিছু অংশ দেবদেবীর পূজা করলেও অধিকাংশ শ্রেণী তেমন ধুমধাম করে পূজা করে না। শুধু কোন একটি বিশেষ দিনে ফুল, খই, মিষ্টি দিয়ে সংক্ষেপে দেবদেবীদের পূজা দিয়ে থাকে। তবে এখানে উল্লেখ্য ব্যাপার হলো, মগ জনজাতিরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। স্থান পরিবর্তনে নানা বাধাবিপত্তি দুর্যোগের মধ্যে কাটালেও যেখানে তারা বসতি স্থাপন করে সেইখানে সাধ্যমত বুদ্ধ মন্দির নির্মাণ, পুকুর খনন, বোধিবৃক্ষরোপণ, স্তূপ বা চৈত্য, বিশ্রামাগার/পাছশালা নির্মাণ ইত্যাদি তারা করে থাকে। অধিকাংশ মগেরা প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে পঞ্চশীল গ্রহণ ও ধর্মালোচনায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। কেউ কেউ আবার অষ্টমশীল গ্রহণ করে মন্দিরে দু-এক রাত থেকে ব্রত উপবাস করে।

ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ধর্মীয় ভাবধারার উর্ধ্বে থেকে মগদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন লক্ষ্যে মগ সোসিও কালচারেল অরগানাইজেশান এবং ‘মগ ওমেন সোসিয়েল এন্ড কালচারেল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশান’ নামে দুটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। মগ জনগোষ্ঠীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য এম.এস.সি. ও মগ সোসিও কালচারেল অরগানাইজেশান সংস্থাটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এছাড়াও মগ ওমেন সোসিয়েল এন্ড কালচারেল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশান নামক সংস্থাটিও সাহিত্য ও সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংস্থার মাধ্যমে মগ জাতিদের সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও রাজ্যে বহিঃরাজ্যে ও বিদেশে মগ সংস্কৃতির পরিচিতি লাভ করেছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ :

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মগদের পোশাক-পরিচ্ছদেও অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিক যুগের মগ মেয়েরা পুরানো ডিজাইনের থাবিং বা পাছড়া ও পুরানো ডিজাইনের গয়না ব্যবহার করে না। আজকাল তারা নিজের পছন্দমতো বাজারে প্রাপ্ত নকশা করা

ও ছাপানো লুঙ্গি কিনে পরিধান করে। কোমরে উপরে ব্লাউজ টপ (রেডিমেন্ট) বিঃদেঃ আঙ্গি (বামদিকে লাগানো ব্লাউজ) বানিয়ে পরিধান করে। কিছু কিছু বুনে পরিধান করে। শিক্ষিত মহলে শাড়ির ব্যবহার নজরে পড়ে। অল্প বয়সের শিক্ষিত মেয়েরা সালোয়ার বা চুস কামিজ ও সার্ট বা গেঞ্জি পেন্ট পরিধান করতে দেখা যায়। অলংকার হিসাবে আদিমকালের ভারি গয়নার পরিবর্তে বাজারে প্রাপ্ত হালকা সুন্দর গয়না ব্যবহার করতে দেখা যায়। শিক্ষিত মগ পুরুষেরা আদিকালের মত লুঙ্গি বা ধুতি ব্যবহার করে না। তারা আজকাল বেশিরভাগ সার্ট-পেন্ট পরতে ভালবাসে।

রাজনৈতিকঃ

মগ জাতিদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তনের আলোকে সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক উভয় রাজনৈতিক দলের চিন্তাধারার সঙ্গেই তাঁরা পরিচিত।

প্রথম মগ জনজাতিদের মধ্য থেকে বিধানসভার সদস্য ছিলেন শান্তির বাজার নিবাসী লুরাং মগ। তারপর শ্রী অঞ্জু মগ, শ্রী আচাইসি মগ, শ্রী মং সাজাই মগ, শ্রী ব্রজেন্দ্র মগ চৌধুরী প্রমুখ।

বর্তমানে স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হচ্ছেন শ্রী মং সাজাই মগ। এ ছাড়াও মগ অধ্যুষিত অঞ্চলে মগদের মধ্যে কেউ কেউ প্রধান, কেউ চেয়ারম্যান ও কেউ মেম্বর পদে নিযুক্ত হয়ে গ্রামে পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজের ভূমিকা পালন করছেন।

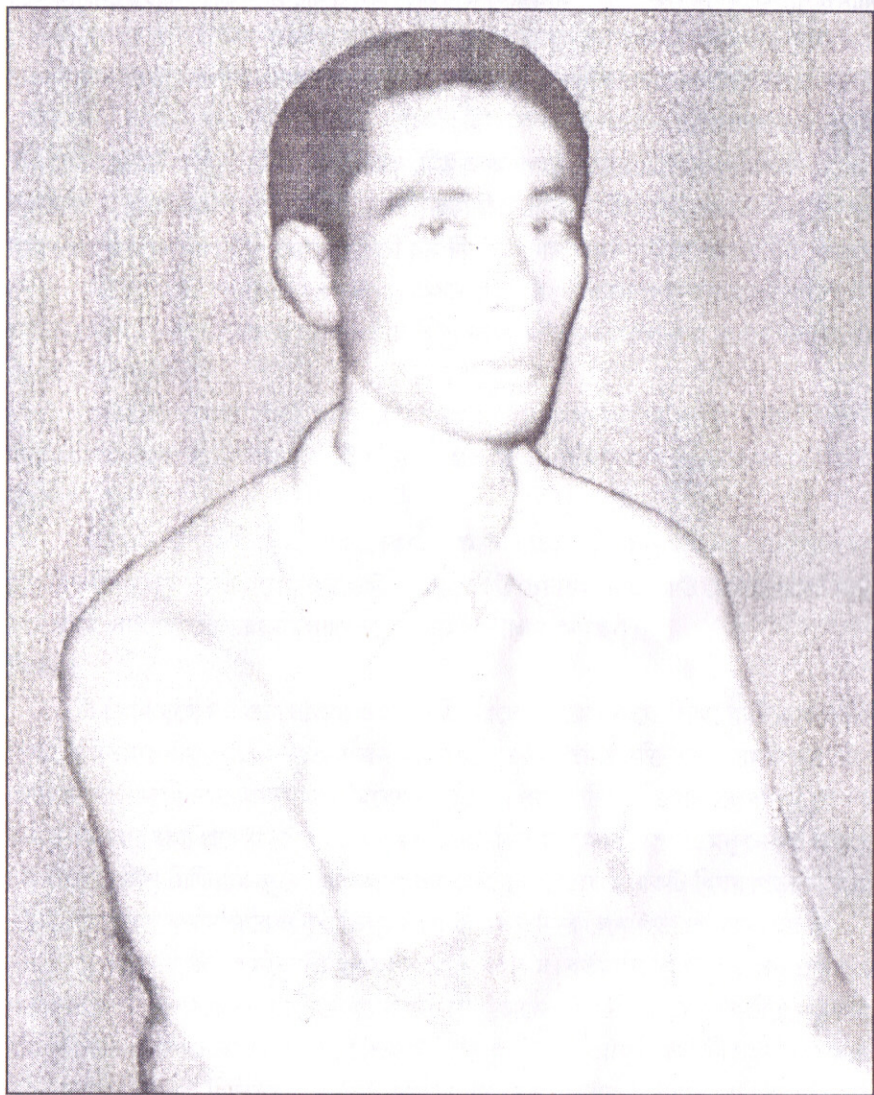
শিক্ষাঃ

বর্তমান যুগে মগ জনজাতিরা ও উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শিক্ষা ব্যতীত আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক যুগে স্বনির্ভরতা অর্জন করা যায় না। তাই তারা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে বংশধরদের শিক্ষা দেবার বিষয়ে মনোনিবেশ করেছেন। পাশাপাশি মগ ভাষায় লেখাপড়া শিক্ষার আগ্রহ বাড়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বর্তমানে সার্বক্ষম মহকুমার অন্তর্গত মনুবনকুল অঞ্চলে ধর্ম দীপা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ও নালন্দা শ্রমণস্কুলে মগ ভাষায় একটি বিষয় পড়ানো হয়। এছাড়া কিছু কিছু বুদ্ধ মন্দিরে ও বুদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা মগ ভাষায় লেখাপড়া শেখানো হয়।

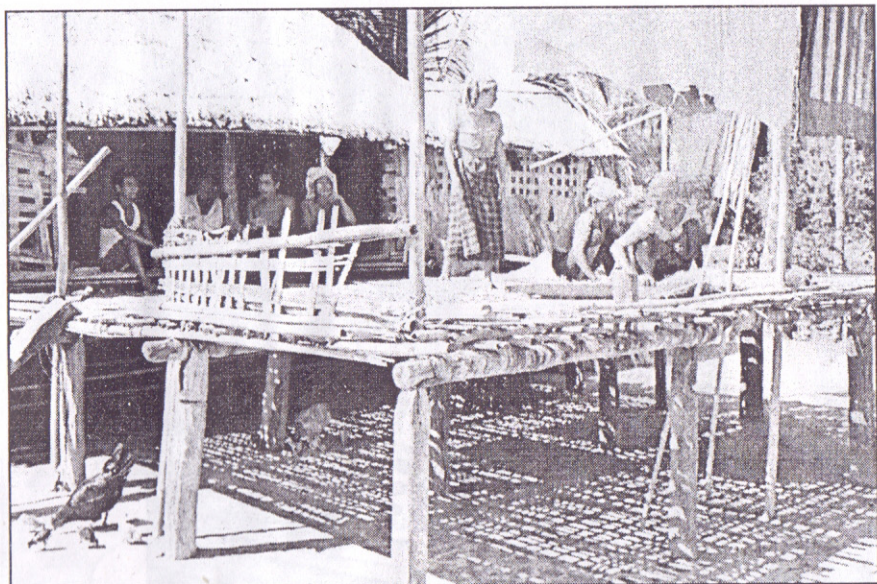
মগ আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম। বর্তমানে শিক্ষিতের হার প্রায় ৩.৫ শতাংশ। প্রায় ২.৫ শতাংশ বিভিন্ন দপ্তরে সরকারি কাজে নিযুক্ত আছেন। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর শিক্ষা বিকাশের জন্য বিভিন্নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। রাজ্য সরকারের এই বিভিন্নমুখী কর্মসূচীর মধ্যে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ, আর্থিক সহায়তা, বোর্ডিংহাউস-স্টাইপেন্ড, ড্রপ আউট উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে কোচিং দেওয়া, বৃত্তি প্রদান, মেধাপুরস্কার ইত্যাদি। অন্যান্য উপজাতিদের মত সরকারের আর্থিক সহায়তায় আজকাল অধিকাংশ মগ ছেলেমেয়েরা স্কুলে লেখাপড়া করছে। বিভিন্ন জাতি-উপজাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মগজাতিদের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মগদের সমাজে অনেকটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শহরের কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করার ফলে ও আধুনিক সভ্যতার প্রভাবও তাদের মধ্যে

যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। আজকাল অধিকাংশ মগরা বাঁশের অভাবে মাটির গোদাম ঘরে বাস করে। মগদের দু-একটা পাকা বাড়িও লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক ঘড়ি, সাইকেল, গাড়ি, টিভি, কম্পিউটার ইত্যাদি দ্রব্যাদিরও ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। মদ্যপান, জুয়াখেলা কিছুটা কমে গেছে বলা যায়।

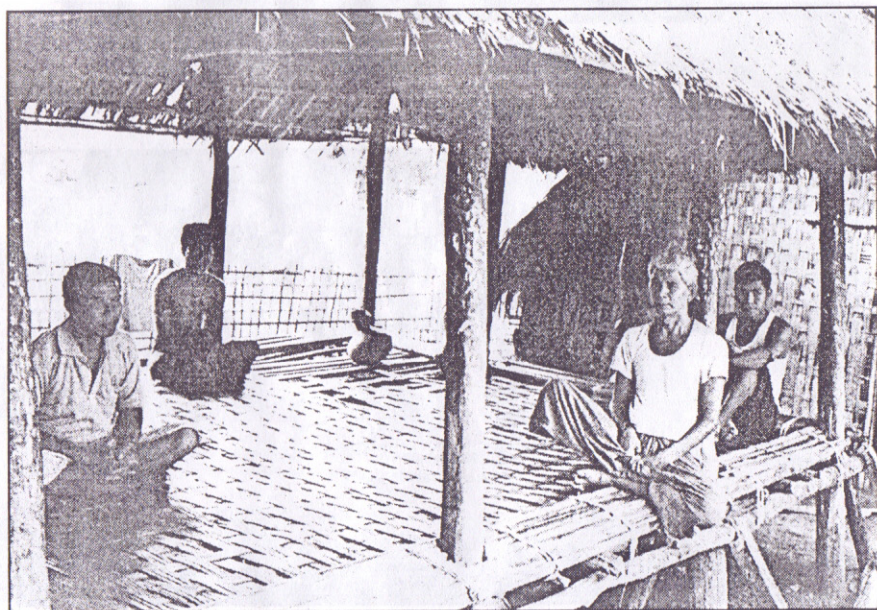
বিশেষ করে প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী, কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই চারদিন মদ্যপান ও জুয়াখেলা মগ সমাজে নিষিদ্ধ। তাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র, রান্না করার পদ্ধতি, ঘর-দরজা তৈরীর নমুনা, খাদ্য ইত্যাদি সব বিষয়ে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে।



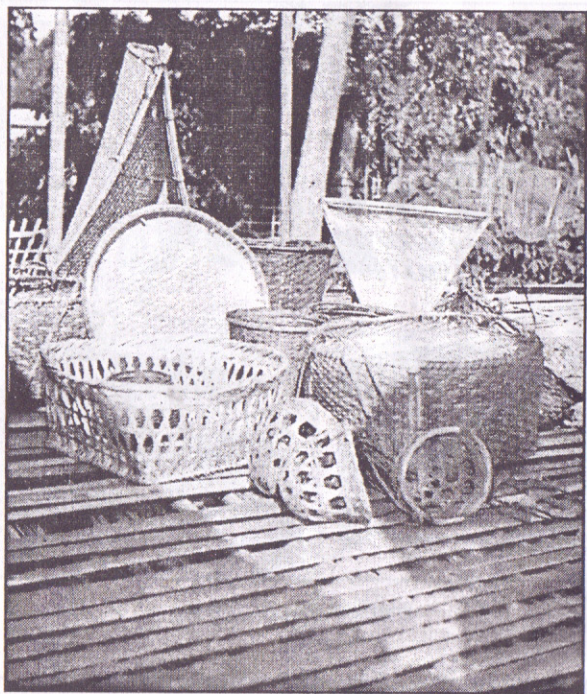
বিলোনিয়া মহকুমার কলসী এলাকার জমিদার শ্রীযুক্ত সুজাও চৌধুরি
যিনি সমাজ ও দেশের উন্নতির জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করে দুই বার
দুটি বন্ধুক ভারত সরকার থেকে পুরস্কার পেয়েছিলেন।



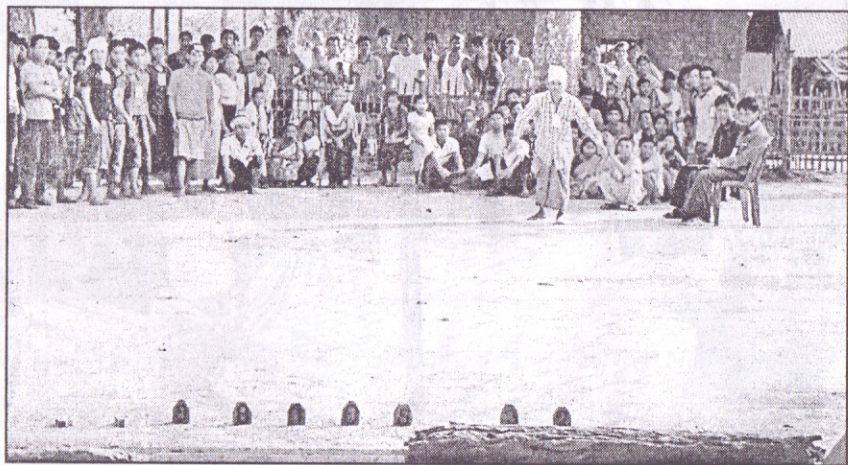
মগদের ঐতিহ্যবাহী ঘর।



মগ অধ্যুষিত এলাকায় পান্থশালা।



মগদের ব্যবহৃত বাঁশবেতের তৈরি জিনিস।



ঐতিহ্যবাহী দঃ খুঃ খেলা।



বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে অন্নদান করছেন।



সাংগ্রাইং উৎসবের ছাতা নৃত্য।



আবংমা বা ধানদেবীর পূজা।



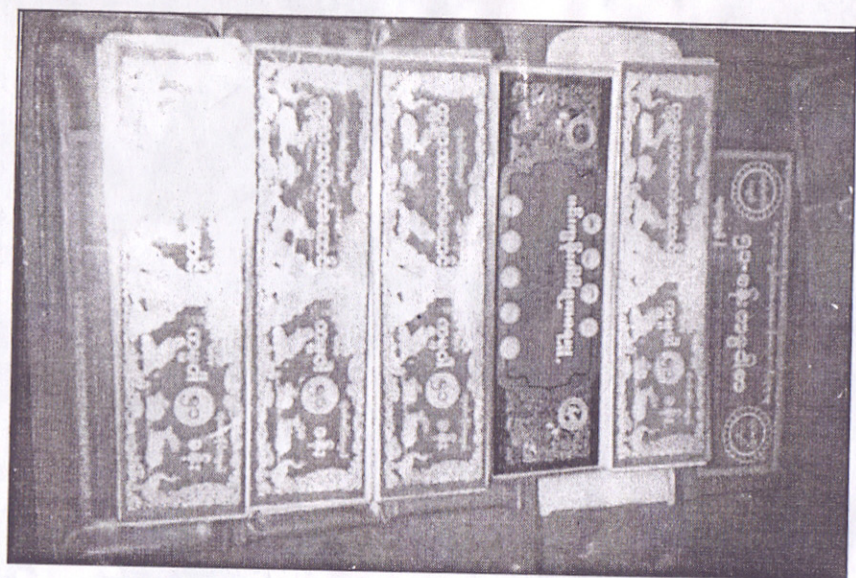
কল্লতরু উৎসব।



মগ যুবতি।



ঐতিহ্যবাহী অলংকার।



মগদের ধর্মীয় গ্রন্থশালা।



বিবাহ অনুষ্ঠান।



শশানে দাহ করবার জন্য বাস্তবন্ধী শবদেহকে
সাজানো লাকড়ীর উপর তুলে দেওয়া হয়েছে।



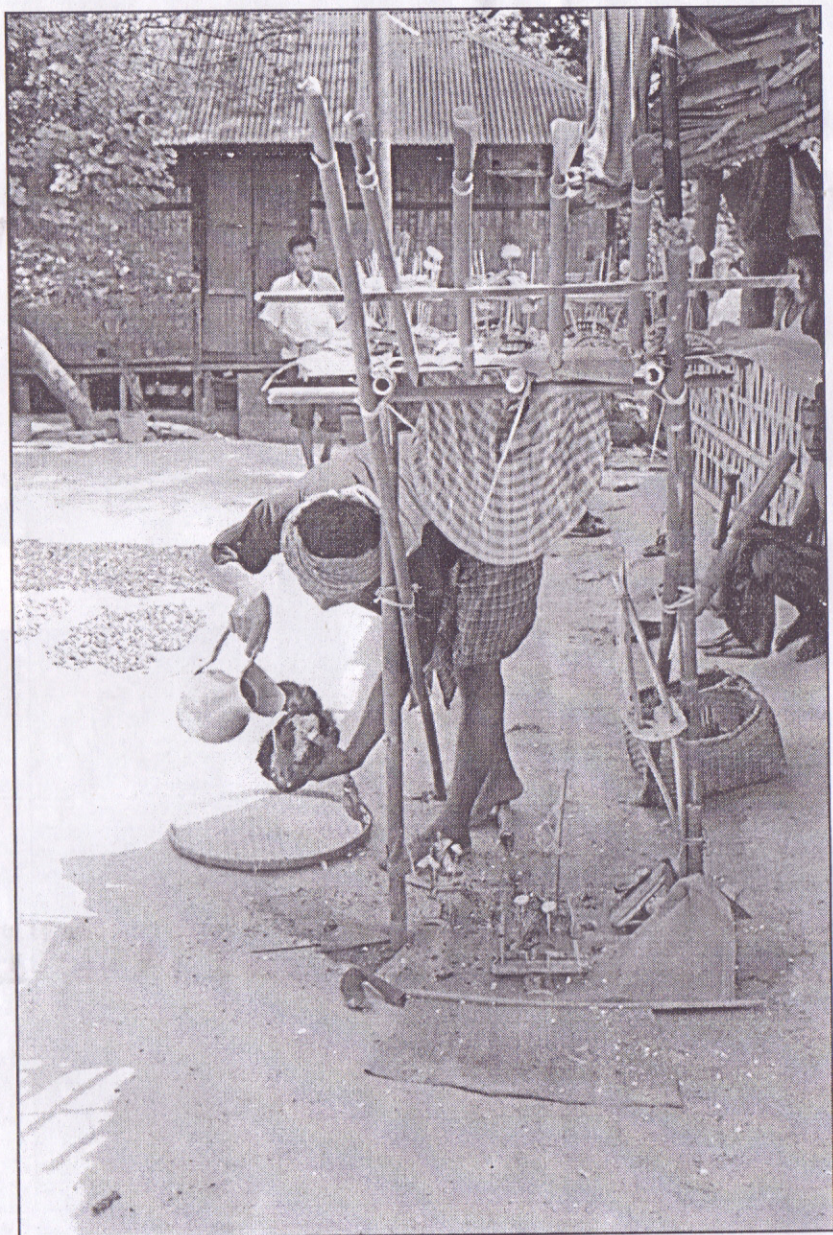
শ্রমণ গ্রহণ অনুষ্ঠান।



‘দুঙ তঃ পোয়ে’ বা মগ বুদ্ধ ভিক্ষুর অন্তেষ্ঠি ক্রিয়া অনুষ্ঠানে নৃত্য।



বাদনরত লোক সংগীত যন্ত্র।



গৃহ পূজা করা হচ্ছে।



গুরু মা'র সঙ্গে মগ শিল্পীবৃন্দ।



জুম চাষের প্রস্তুতিতে মগ জনজাতি।



অন্নপ্রাশন।



ধান রোপণে ব্যস্ত মগ মহিলারা।



মগ মহিলাদের মধ্যে প্রথম শিক্ষিত নারী।

তথ্যসূত্র

- ১। জেম্‌স্‌ দ্বীপা ইন্দিয়া নিংপোং ক্যাইন্ (মগ ভাষায় - লেখা গ্রন্থ) - চাইন্দামালা মহাথেরো।
- ২। মগ জাতির উদ্ভব ও তার ইতিহাস - ডঃ ওকে সা।
- ৩। মারমা সমাজও সংস্কৃতিঃ মংক্য শোয়েনু নেভী - (বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম)।
- ৪। History of Burma - Arakan - G.E. Horvey.
- ৫। History of Burma - P. Phayre.
- ৬। Linguistic Survey of India - Dr. G. Grierson.
- ৭। মারমাগোষ্ঠীর সংগীত ও নৃত্য - ক্যশৈশ্রু মারমা - (বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম)
- ৮। রাজমালা - কৈলাস চন্দ্র সিংহ।
- ৯। রাজমালা - পুরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্তী।
- ১০। রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম - ডঃ রঞ্জিত দে।
- ১১। কিংবদন্তীর আরকান - সুগত চাকমা (বাংলাদেশ)।
- ১২। মারমা ইতিহাসের একটি অনুপুঙ্খ আলোচনা - অংসুই মারমা (বাংলাদেশ)।
- ১৩। লোক সংস্কৃতি ভাবনাঃ প্রেক্ষিত ত্রিপুরা - ডঃ নির্মল দাশ।
- ১৪। কিরাট দেশের প্রত্নভূমি পিলাক - দীপক ভট্টাচার্য।
- ১৫। মগ জাতি ওদক্ষিণ ত্রিপুরার জনসংস্কৃতিতে - তার প্রভাব - অশোকানন্দ রায় বর্ধন।
- ১৬। কাইংফাঃ নাদাইং রাজওয়ং (মগ ভাষায় লেখা - গ্রন্থ)
- ১৭। হাদীথোং পাড়া জং (মগ ভাষার গ্রন্থ)।
- ১৮। পাদম্মা দেওয়ী - মগ ভাষায় লেখা গ্রন্থ।
- ১৯। লগাহীতা গাইংবীরা ক্যাইন্ - মগ ভাষায় লেখা গ্রন্থ।
- ২০। রাজমালা - প্রথম লহর, দ্বিতীয় লহর, তৃতীয় লহর - শ্রী কালী প্রসন্ন সেন।
- ২১। আনেন্দা চাইন্ ক্যউচা - (আনন্দ চন্দ্র শিলালিপি)।
- ২২। সাধারণ সমীক্ষার আলোকে উচই - শ্যামলাল দেববর্মা।
- ২৩। রূপিনী সমাজের রূপরেখা - উপেন্দ্র রূপিনী।



ক্রাইরী মগ চৌধুরী

জন্ম : ৪ নভেম্বর ১৯৫৭ সালে শান্তিরবাজার অন্তর্গত কলসি গ্রামে।
বর্তমানে নিউ মডেল ভিলেজ গার্লস্ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। একজন
বিশিষ্ট লেখিকা, কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, গীতিকার, গবেষিকা
অনুবাদিকা, গান ও লোকনৃত্য শিক্ষিকা। তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিও ও
দূরদর্শন-আগরতলা কর্তৃক স্বীকৃত মগশিল্পীদের প্রথম শিল্পী। মগ মহিলা
সামাজিক ও সংস্কৃতি উন্নয়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা।

সম্পাদিত অনুবাদ গ্রন্থ : 'আমিং চগালা রবীন্দ্রনাথ'।

প্রকাশিত : মগভাষার অভিধান The Mralma's-Flock Song, Poem and
Story ইত্যাদি।